ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

দশম বর্ষ • শারদ যুগ্ম সংখ্যা • আশ্বিন ১৪২৭ • অক্টোবর ২০২০

করোনা অতিমারী

- আমপান বিপর্যয়ে সুন্দরবন
- নাগরিকত্ব প্রমাণে বিপর্যস্ত দেশ
- কীটনাশক আগাছানাশক সঙ্কটনাশক
- ডেঙ্গু নিয়ে আরও লেখা
- অঙ্কের সেতু ধরে কালিনিনগ্রাদে
- চেনা চীন, অচেনা চীন

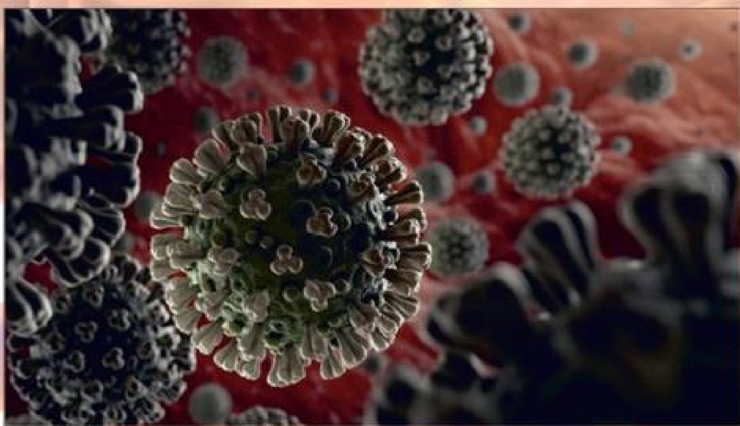

- দেশবন্ধুর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী
- যোগেন্দ্রনাথ : নায়ক থেকে বিস্মরণ
- ধলভূমগড়, ভালোপাহাড়, বৃক্ষনাথ
- বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমারের শিক্ষাভাবনা
- আব্রাহামের আরব সন্তান
- বস্তারের আদিবাসী অধিবাস
- মুহূর্তরা : হেয়র্হে লুসি বোরহেস

আমপান বিধ্বস্ত সুন্দরবন

কৃশানু মিত্রের লেন্সে

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

দশম বর্ষ ● শারদ যুগ্ম সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪২৭ ● অক্টোবর ২০২০

পৃষ্ঠপোষক : সনৎ রায়চৌধুরী, জ্ঞানব্রত শীল, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, রূপক ঘোষ, অনিতা মজুমদার, ষড়ানন পাণ্ডা, অরুণ সেন, বিজন ভট্টাচার্য্য, ফণিগোপাল ভট্টাচার্য্য, নির্মলেন্দু নাথ, সমর বাগচী, দীপক দাঁ, হীরালাল কোনার, পুণ্যব্রত গুন, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর পাল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, বরুণ সাহা, সন্দীপ ঘোষ, সৈয়দ শাজাহান সিরাজ ও অলকানন্দা রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : শুভেন্দু দাশগুপ্ত, জয়া মিত্র, তৃপ্তি সান্ত্রা, কমল চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ সাহু, জাতিশ্বর ভারতী, কৌশিক সেন, সোমনাথ গুহ, সোমা সেনগুপ্ত, অর্ণব সেনগুপ্ত, অমিতাভ চক্রবর্তী, সোমেন চক্রবর্তী, শুভম ভট্টাচার্য্য, সুদেব সাহা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শমিত কর, অমিত পান ও দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ চৌধুরি, শুভময় দত্ত ও অরণি সেন

সম্পাদকীয় সহযোগিতা: অভিজিৎ দাস, অনন্ত কর্মকার, রাজা রাউথ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম শর্মা, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায় ও অরুণাভ বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, অর্ঘ্য মিত্র, সুমন্ত বিশ্বাস ও নয়নতারা বিশ্বাস

যোগাযোগ : রামজীবন ভৌমিক (কোচবিহার), সুমন গোস্বামী (আলিপুরদুয়ার), গার্গী সিংহ (জলপাইগুড়ি), ধীরাজ লাখোটিয়া (শিলিগুড়ি), রূপক পাল (রায়গঞ্জ), সুরজ দাস (বালুরঘাট), মৃদুল কান্তি সরকার (মালদা), সুমনা সেনগুপ্ত (বহরমপুর), রঞ্জন আচার্য (পুরুলিয়া), সুনীল সোরেন (সিউড়ি), তুষার গলুই (দুর্গাপুর), মৃণাল বাগচী (চাকদা), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), নীলকণ্ঠ আচার্য (বারাসাত), আনোয়ার হোসেন (দঃ বারাসাত), দীপা রায়, সুজাতা হালদার (কলকাতা), লক্ষ্মী ভট্টাচার্য (বজবজ), সুশান্ত রায় (হাওড়া)

পরিবেশনা : অয়ন ঘোষ, প্রদীপন গাঙ্গুলী, অভিজিৎ সেন, সুজয় পাল ও স্বপন সামন্ত

আলোকচিত্র কৃতজ্ঞতা : কৃশানু মিত্র, অর্জুন দাসগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অর্ক মিত্র; **বর্ণসংস্থাপন** : রাজু রায়

ই-মেল : ssunnayan@gmail.com || **ওয়েবসাইট** : www.ssu2011.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট-গণিতজ্ঞা ক্যাথরিন জনসন; বিজ্ঞানী সুজিত বসু, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর রায়, আনন্দমোহন চক্রবর্তী; কবি আর্নেস্টো কার্ডিনাল, বিজয়া মুখোপাধ্যায়; শিক্ষাবিদ হরি বাসুদেবন; ক্যানসার বিশেষজ্ঞ আশিস মুখোপাধ্যায়; দ্রোণাচার্য কোচ যোগিন্দার সিং সাইনি; ফুটবলার জ্যাকি চার্লটন, হ্যারি গ্রেগ, অশোক চট্টোপাধ্যায়; ক্রিকেটার বব উইলিশ, বাপু নাদকার্নি, চেতন চৌহান; সঙ্গীত পরিচালক এনিও মোরিকোন; সংগীত শিল্পী বাণী ঠাকুর, রামকান্ত গুণ্ডেচা, জেসি নর্মান; সুরকার ওয়াজিদ খাঁন; চিত্রকর আকবর পদমসে; চলচ্চিত্র পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায়; চলচ্চিত্র শিল্পী আনা কারেনা, শ্রীরাম লাগু, ইরফান খাঁন, ঋষি কাপুর, সন্তু মুখোপাধ্যায়, তাপস পাল, সুশান্ত সিং রাজপুত; নৃত্য পরিচালক সরোজ খাঁন; রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিষেণলাল চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস দাসগুপ্ত, ক্ষিতি গোস্বামী, পতিতপাবন হালদার, শ্যামল চক্রবর্তী, কাশীকান্ত মৈত্র, নটবর বাগদি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়; সাংবাদিক-লেখক নিমাই ভট্টাচার্য; নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাদিয়া দলভি; ধ্রুপদ সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত যশরাজ; সাহিত্যিক ও অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে : চেনা চীন, অচেনা চীন ৩

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৭

● দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ● আচার্য যদুনাথ সরকার ● শিশির কুমার বসু ● সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ● সন্তোষ কুমার ঘোষ ● জহর রায়...

স্মরণিকা ১১

● প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ● তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার শেষণ ● নবনীতা দেব সেন ● তুষার কাঞ্জিলাল ● কৃষ্ণা বসু ● মিস শেফালি ● নিমাই ঘোষ ● উষা গঙ্গোপাধ্যায় ● চুনী গোস্বামী ● জলি মোহন কল ● আবু তৈয়ব আনিসুজ্জমান ● দেবেশ রায় ● থমাস ফেলিপে কার্লোভিচ ● অমলাশংকর

বিশেষ স্মরণিকা ১৬

● স্তব্ধ হও নিঃশব্দ মৃত্যু!!!—বিজয়প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
● মৈনাক মুখোপাধ্যায়—শ্যামল চক্রবর্তী

প্রধান রচনা ১৯

● Coronavirus Pandemic–Snigdha Bandopadhyay

বিশেষ রচনা ২৪

● নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়ে বিপর্যস্ত দেশ—সোমনাথ গুহ
● লুইতের দেশে খিলঞ্জীরা নিজভূমে পরবাসী—অমিতাভ সেনগুপ্ত
● কেউ অবৈধ নয়, নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার—এ.পি.ডি.আর

ব্যক্তিত্ব ৩৫

● যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল : বাংলা রাজনীতির নায়ক থেকে বিস্মরণ —বাপ্পাদিত্য রায়

জনস্বাস্থ্য ৪৬

● কীটনাশক, আগাছানাশক, সঙ্কটনাশক—অরিজিৎ সিংহ
● ডেঙ্গু নিয়ে দু-চার কথা—সব্যসাচী রায়
● ডেঙ্গু জ্বরের পাঁচালী—মহেশচন্দ্র দাস
● স্বাস্থ্য নীতি—কে. শ্রীনাথ রেড্ডি
● Dengue Management Protocal –Comp. Snigdha Bandopadhyay & Gautam Mridha

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৫৫

● অঙ্কের সেতু ধরে কালিনিনগ্রাদে—অঙ্কিতা সেনগুপ্ত
● সাইক্লোট্রনের শহর—বিকাশ সিংহ
● দেহের আবশ্যিক উপাদান ভিটামিন সি—অমিতাভ চক্রবর্তী
● ওষুধের আন্তঃক্রিয়া—তপন দাস

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৬৪

● ধলভুম, ভালোপাহাড় এবং বৃক্ষনাথ—দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
● জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর রয়েছে এই উত্তরবঙ্গ—রাজা রাউথ
● ভবিষ্যতের চিঠি—জয়দেব গুপ্ত
● সবুজ গ্রহটাকে বাঁচতে দাও—অমিতাভ সেনগুপ্ত
● শেষ হয়ে যাচ্ছে বীরভূমের নদী আর জঙ্গল—বিবর্তন ভট্টাচার্য্য

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৭৬

● বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা : তিনটি ঐতিহাসিক বিতর্ক—সুরেশ কুণ্ডু
● বাঙালির এক বিস্তৃত ব্যক্তিত্ব অক্ষয়কুমার—দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
● স্বাধীনতার চুয়াত্তর বছর পরেও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি হল না—বরুণ দাস
● সদস্য সংকটে ওয়েবকুটা—সনাতন মুর্মু
● দলীয় আনুগত্য ছেড়ে এগিয়ে আসছে ছাত্রসমাজ —অনুপম কাঞ্জিলাল
● শিক্ষাঙ্গনে ভূতের কীর্ত্তন—সোমা সেনগুপ্ত

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৮৭

● দারিদ্র সীমা—জয়দেব গুপ্ত
● আব্রাহামের আরব সন্তান—নাসির আমেদ
● বদলে যাওয়া কাজের ভুবন—অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য
● নতুন রাজনীতি, কাজের রাজনীতি—অরণি সেন
● এক প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি থেকে—বাবুয়া চৌধুরি
● কাল মার্কস : শ্রম ও বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের হিসাব নিকাশ—প্রদীপ বকশি

অর্থনীতি ১০৬

● বাজেট অথবা না বাজেটের গল্প—অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য
● অর্থনীতির হালহকিকৎ—সংকলন : বুনো রামনাথ

অর্ধেক আকাশ ১১২

● আলোকবর্তিকা হেলেন কিলার–সুপর্ণা চৌধুরি

শিল্প-সংস্কৃতি ১১৪

● জাতীয় উৎসবের উৎস সন্ধানে–ষড়ানন পণ্ডা

ভ্রমণ ১১৮

● বস্তারের আদিবাসী অধিবাস–অন্তরা ঘোষ
● ছেলেবেলায় শিমুলতলায়, মধুপুর ও দেওঘরে–পার্থময় চট্টোপাধ্যায়

কবিতা ১২৫

● মুহূর্তরা—হেয়র্হে লুসি বোরহেস, অনুবাদ : সৌম্যশঙ্কর মিত্র
● কাজি নীলের দুটি মিঞা কবিতা, অনুবাদ : সুমনা চৌধুরি

চিঠিপত্র, রিপোর্ট ১২৭

● সবাইকে পাশে চাই—সপ্তর্ষি বৈশ্য
● সকল চলার মাঝে—কৃশানু মিত্র
● চিকিৎসকদের যুক্তমঞ্চের প্রেস বিজ্ঞপ্তি
● চিকিৎসকদের বদলির পরিপ্রেক্ষিতে 'হেলথ সার্ভিসেস এসোসিয়েশন'

খবরাখবর ১৩০

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

চেনা চীন, অচেনা চীন

প্রায় ১.৪২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের কাশ্মীর এক পর্বতবেষ্টিত নিসর্গ সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসাবে ভারতভূমির উত্তরপ্রান্তে বিরাজ করত। মধ্যযুগের চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামের প্রবেশ ঘটলেও উদারতাবাদী সুফি মতবাদের আবাহাওয়ায় 'কাশ্মীরিয়াত' ও 'ইনসানিয়াত'-র উজ্জ্বল সংস্কৃতিতে সংখ্যাগুরু সুন্নি মুসলমান কাশ্মীরীদের সাথে সংখ্যালঘু শিয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ ও শিখরা মিলেমিশে শান্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করত। আফগান ও মুঘল শাসকরা এবং রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর জয় করলেও

এবং ব্রিটিশরা উত্তর-উত্তরপশ্চিমে কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান অবধি সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও কাশ্মীর কার্যত স্বাধীন ছিল। ১৯৪৭-র ১৫ ও ১৬ আগস্ট ভারত যখন ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশে বিভক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথাক্রমে নেহরু ও জিন্নার নেতৃত্বাধীন স্থানীয় শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন প্রবল চাপ সত্ত্বেও মুসলমান প্রধান কাশ্মীরের হিন্দু নৃপতি কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থেকে যান।

কাশ্মীরী পণ্ডিত নেহরু ও পাকিস্তানের উদগাতা জিন্না উভয়েই ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন ও মধ্য এশিয়ার মাঝে অবস্থিত এই ভূ-সামরিক রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ রাজ্যটিকে চাইছিলেন তাদের অংশের মধ্যে অন্তর্ভূক্তি এবং তার জন্য প্রবল চাপও দিচ্ছিলেন। তখনও গভর্নর জেনারেল হিসাবে ভারতে উপস্থিত ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের শেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটন কূটনৈতিক ধূর্ততায় দুই দেশের শাসকদের উসকানোর পাশাপাশি দুই দেশের ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষদের মাধ্যমে জটিলতা তৈরি করছিলেন। এমতাবস্থায় পাক সেনার মদতে সশস্ত্র উপজাতি মিলিশিয়ারা কাশ্মীর আক্রমণ করে ব্যাপক ধ্বংস, লুঠ, ধর্ষণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ চালাতে থাকে। তারা যখন বারামুলা পর্যন্ত অধিকার করে নেয় তখন ভারতীয় শাসকদের চাপে রাজা হরি সিং ভারতভূক্তিতে সই করেন এবং কাশ্মীর উপত্যকা ত্যাগ করেন। পাক মিলিশিয়ারা যখন শ্রীনগর বিমানবন্দর দখলের মুখে সেইসময় ভারতীয় সেনারা গিয়ে তাদের নিবৃত্ত করে। **সেই থেকে উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমের কারাকোরাম, গিলগিট-বাল্টিস্তান, আজাদ-কাশ্মীর নিয়ে অবিভক্ত কাশ্মীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের এবং কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাখ ও জম্মু নিয়ে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত।**

আর সেই থেকে কাশ্মীরী জনতার মত উপেক্ষা করে কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের নিরন্তর দ্বন্দ্ব এবং ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯তে

তিনটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ সহ প্রতিনিয়ত সীমান্ত ও ছায়া যুদ্ধ। সেই থেকেই পারস্পরিক দখলদারির ঐ সীমান্ত 'লাইন অফ কন্ট্রোল (**এলওসি**)' অর্থাৎ 'কার্যত সীমান্ত (**এলওএসি**)' হিসাবে স্বীকৃত যদিও উত্তর-পূর্ব কাশ্মীরের হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রায় অবস্থিত **সিয়াচেন হিমবাহে** এখনও 'এলওসি' নির্ণয় হয়নি এবং দুই দেশের সংঘর্ষ চলমান। **১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের পর চীন উত্তরপূর্ব কাশ্মীরের আকসাই চীন ও পূর্ব লাদাখের একটা অংশ মিলিয়ে অবিভক্ত কাশ্মীরের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দখল করে নেয়**। এরপর চীনের সেনা যাদের চীনে 'পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)' বলা হয় দুই দেশের সীমান্ত লঙ্ঘন করে বারবার লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও অরুণাচল প্রদেশে ঢুকে পড়েছে, অস্থায়ী নির্মাণ করেছে, জমি জরিপ করেছে, ফোটো তুলছে, আবার নিজেদের শিবিরে ফিরে গেছে। চীন কূটনৈতিকভাবে এই অঞ্চলগুলি ও সমগ্র অরুণাচল নিজেদের দাবি করেছে, নিজেদের অংশে সব ঋতুর রাস্তা, অত্যাধুনিক সামরিক ঘাঁটি, হেলিপ্যাড, রানওয়ে নির্মাণ করছে, কিন্তু সীমান্তের ভারতীয় অংশে গত পঞ্চাশ বছর রাস্তাঘাট সহ কোন নির্মাণ করতে দেয়নি। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে করাচির পাশে গদর বন্দর নির্মাণ এবং সিনকিয়াং (জিন জিয়াং) থেকে গদর অবধি এক্সপ্রেস-ওয়ে নির্মাণ করে মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপে বাণিজ্যের সহজপথ বের করেছে। এই বিতর্কিত সড়ক পাক অধিকৃত কারাকোরাম এবং গিলগিট-বাল্টিস্তানের মধ্যে দিয়ে গেছে। পরবর্তিতে কারাকোরামের ঐ ভূভাগ পাকিস্তান চীনকে দিয়েছে যা তাদের কারাকোরাম-আকসাই চীন-জিজ্যাং (তিব্বত) যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করে তুলেছে। অধিকৃত আকসাই চীনের ও গালওয়ান উপত্যকার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের জিন জিয়াং-জিজ্যাং জি ২১৯ হাইওয়ে।

পূর্বতন এন.পি.এ. সরকারের সময় থেকেই ভারত সরকার এই অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত বলীয়ান আগ্রাসী চীনকে মোকাবিলার জন্য তাদের চোখ রাঙানি ও বাধাদানের মধ্যেও লাদাখ ও অরুণাচলের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তিতে প্রস্তুত রানওয়ে, সড়ক এবং বিমান ও স্থল সেনা ঘাঁটি গুলি ধীরেধীরে সংস্কার করতে থাকে যার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্ব কাশ্মীরে চীন সীমান্তে এবং তাদের কারাকোরাম সড়কের নিকটবর্তী দৌলত বেগ ওল্ডি বিমান ঘাঁটি। মোদি সরকারও চীনের সাথে সখ্যতা বৃদ্ধি করে, নিজে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চারবার ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পাঁচবার মোট ন'বার চীনে গিয়ে, বর্তমান চীনের একমেদ্বিতীয়ম্ নেতা সি জিনফিংকে ভারতের আমদাবাদ ও মামাল্লাপুরমে দুবার এনে, ভারতীয় বাজারকে চীনা পুঁজি ও সংস্থাগুলির কাছে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েও ঐ সামরিক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা জারি রাখে। বারবার চীনের বাধাদানের মধ্যেও দৌলত বেগ ওল্ডি বিমান ঘাঁটি চালু হয়, সেখান থেকে লেহ্ অবধি সব ঋতুর সড়ক সংস্কার সম্পূর্ণ হয়। এছাড়াও পূর্ব লাদাখের প্যাংগং হ্রদের তিন পঞ্চমাংশ সহ যে এলাকাগুলি চীন দখল করে রেখেছে সেখানে হ্রদের উত্তরে গালওয়ান উপত্যকায় চারটে পাহাড়ি খাঁজ অবধি ভারতের নিয়ন্ত্রণে। এই দুর্গম খচ্চরের পিঠে চলার সময় সাপেক্ষ পথকে সংক্ষিপ্ত করতে ভারত সিয়ক নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করে এবং গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় পোষ্ট অবধি সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। চীন এটি কিছুতেই সহ্য করে না। বারংবার চীনা সেনা ভারতীয় সেনাদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং গালওয়ানের ভারতীয় অংশে ঢুকে পড়ে নির্মাণ শুরু করে থাকতে শুরু করে। তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়েই চীনা বাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনীর সংঘর্ষ যাতে ১৫ জুন ১৯২০ রাতে বিহার রেজিমেন্টের একজন কর্নেল সহ ২০ জন ভারতীয় সেনার মৃতদেহ নীচের হিমশীতল গালওয়ান নদীর খাতে পাওয়া যায়। দুপক্ষে কজন মৃত, আহত ও বন্দী হন তা কোন সরকারই জানায় নি। উপগ্রহ চিত্র দেখাচ্ছে ভূটানের ডোকলামের মত গালওয়ানের ভারতীয় অংশ থেকে চীন এই লেখা অবধি সরে নি। আগস্টের শেষ থেকে প্যাংগং হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণে এলাকা দখল নিয়ে দুপক্ষের আবার সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়।

অন্যদিকে **১২.৩ লক্ষ বর্গ কি.মি. বিশাল আয়তনের ১৬ হাজার ফুট গড় উচ্চতার শীতল মালভূমি তিব্বত ছিল অল্প জনসংখ্যার (এখনও মাত্র ৩০ লক্ষ) স্বাধীন শান্তিপূর্ণ এক বিচ্ছিন্ন দেশ।** প্রাচীন যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতের সামন্ত রাজারা এত শক্তিশালী হন যে চীন, মঙ্গোলিয়া, খাসগড় (সিনকিয়াং) ও নেপাল দখল করে নেন। পরে অন্তর্দ্বন্দ্বে তাদের পতন হলে চীনা সম্রাট ও মোঙ্গল দলপতিরা তিব্বত দখল করে নেয়। কিন্তু ভৌগোলিক কারণেই তিব্বতকে দখলে রাখা সম্ভব হয় না, ওখানকার রাজা ও লামারা এবং সামন্ত জমিদাররা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে যান। ১৮ শতকের শেষ দিকে আবার চীনের ছিং সম্রাট মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং ও তিব্বতকে দখল করেন এবং নৃগোষ্ঠীভিত্তিক চীনা হান জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেন। ইতিমধ্যে দুটি আফিং যুদ্ধের মাধ্যমে **ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি** চীনের বৃহৎ বাজার ও জনঘন চীনা সমাজের সস্তা শ্রমকে দখল করে রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার আধিপত্য রুখতে **১৯০৪এ তিব্বত দখল করে।** পশ্চিমী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদী নিস্পেষণে সংখ্যাগরিষ্ট হান জাতীয়তাবাদী উত্থান হয়। উঠে আসেন সান ইয়াত সেনের মত নেতা, কুয়োমিনটাং এর

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ডাঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত, ডাঃ শিশির মণ্ডল, ডাঃ ভাস্কর মণ্ডল, দেবদত্তা রায়, ডাঃ তপন সিংহ, ডাঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য, ডাঃ বিশ্বজিৎ মণ্ডল, ডাঃ পি. সি. দে, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বেরা প্রমুখ কোভিড শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

মত জাতীয়তাবাদী দল। ১৯১১তে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতন হয়। ১৯১২তে জাতীয়তাবাদী চীন প্রজাতন্ত্র বিস্তার লাভ করে। **১৯১২-'১৩তে স্বাধীনতার জন্য তিব্বতে হয় জনহাই বিপ্লব।** ১৯৪৯এ গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসে। তারা ব্রিটিশ রচিত ভারত-তিব্বত সীমান্তের কাল্পনিক **'ম্যাকমোহন লাইন'** মানতে অস্বীকার করে। **১৯৫০এ প্রথমে চেমদোর যুদ্ধে ও পরে ১৯৫১ তে চীন পুনরায় তিব্বতকে দখল করে নেয়। ১৯৫৯ তে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যর্থ হয়ে দলাই লামা লাসা ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন।** অন্যান্য তিব্বতীরাও অনেকে ভারতে চলে আসেন।

নেহরু চীনকে ঠিক বুঝতে পারেন নি। তার চীন ভ্রমণ, চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এর ভারতে আগমন, 'হিন্দী-চিনী ভাই ভাই', 'নবপঞ্চশীলের' ঢক্কানিনাদের মধ্যেই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। মার্কিন প্ররোচনায় ১৯৬২তে চীন-ভারত যুদ্ধ হয়। বাগাড়ম্বর প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন প্রমুখের অদক্ষ পরিচালনায় ভারতের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। চীনা সেনা অসমের তেজপুর অবধি চলে এসেও ফিরে যায়। কিন্তু আকসাই চীন সহ সীমান্তের বেশ কিছু জায়গা দখল করে রাখে। এরপর দুই দেশের সম্পর্কের দীর্ঘ অন্ধকার যুগ। **১৯৬৭, '৭১, '৭৫, '৮৭ ও ২০১৩ তে সীমান্তে সংঘর্ষ হয়। ২০১৭তে উত্তেজনা অত বাড়ে যে ডোকলামে ঐ ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দুদেশের সেনাবাহিনী ৭২ দিন মুখোমুখি অবস্থান করে।** ভারতের সবচাইতে শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সফল পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে ও আশ্রিত রাজ্য সিকিমকে দখল করে চীনকে কড়া বার্তা দেন। কিন্তু সেই সময় তার সাথে পৃথিবীর সবচাইতে এগিয়ে থাকা সামরিক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে চীন বা মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্র ভারতকে ঘাটাতে সাহস পায়নি। **১৯৬২ তে হারলেও ১৯৬৭-র সিকিমে সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতীয় সেনা বিজয়ী হয়।** এরপর থেকে চীন সীমান্তে অশান্তি বাড়ালেও আগ্রাসনে যায় নি। চীনে উদারতাবাদী দেঙ শিয়াও পিং-এর উত্থানে এবং ১৯৭৭এ ভারতে জনতা সরকারের আগমনে দুদেশের মধ্যে পুনসম্পর্ক ঘটে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাজপেয়ী চীন যান। এরপর থেকে দুদেশের বাহ্যিক সম্পর্ক ও সীমান্তের স্থিতাবস্থা অটুট থাকলেও, বাণিজ্য সম্পর্ক (একপেশে) বৃদ্ধি পেলেও, পারস্পরিক সন্দেহের অবসান দূর হয়নি এবং চীনের দিক থেকে সীমান্ত অভিযানগুলি, পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদীদের মদত ও অরুণাচল সহ বিস্তৃত ভুখণ্ডের দাবী কখনই বন্ধ হয় নি।

কোভিড পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ এবং দেশের অর্থনীতিকে কোভিডের আগেই শয্যাশায়ী করে ফেলা মোদি সরকার, যে কিনা সমস্ত প্রতিবেশীর কাছে এক ঘরে, এই সুযোগে পাকিস্তানের পর চীন বিরোধী উচ্চবর্ণীয় হিন্দুত্ববাদের উগ্র জাতীয়তাবাদী সুর চড়ালেও কার্যত পিছু হটেছে এবং রাশিয়ার দৌত্যে আপোষে চীনের সাথে সমস্যা মেটাতে চাইছে। কারণ বাহ্যিকভাবে তার প্রধান মিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে শুধু খামখেয়ালি, বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অপদার্থই নন নিজের দেশেই তিনি সমস্যা সামলাতে ব্যর্থ। গণবিক্ষোভ ঠেকাতে তাকে হোয়াইট হাউসের বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কাজেই তিনি কোন কাজে আসবেন না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারতকে নিয়ে সামরিক **কোয়াড** তৈরির পরিকল্পনা খাতা কলমেই রয়ে গেছে। ভারতীয় শাসকরা জানে সামরিক দিক থেকে চীন অনেক শক্তিধর। তার অর্থনীতি কোভিডে ধাক্কা খেলেও অনেক সবল। ভারতীয় অর্থনীতি চীনের সাথে কেন পাকিস্তানের সাথেও বেশীদিন যুদ্ধ চালাতে অক্ষম। **বিমুদ্রাকরণের ভুলে** ভারতে বেকারত্ব পৌঁছেছিল ৯.২১%এ। কোভিডের প্রথম তিন মাসে তা পৌঁছয় ২৩.৫%এ। ভারতের বাজার চীনা পণ্যের দখলে, ভারতীয় সংস্থা ও নাগরিকরা চীনা পণ্যের উপর নির্ভরশীল। **বহু ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা চীনা পুঁজির নিয়ন্ত্রণে।** চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বিপুল। ২০১৭-'১৮এ ৬৩ বিলিয়ন ডলার। ভারতের ওষুধের মূল উপাদান (এপিআই) ও টীকার ৭০%-র বেশি চীন থেকে আসে।

ভারত চীন যুদ্ধ

কম্পিউটার, মোবাইল, লি-আয়ন ব্যাটারি, চিপস, সৌর বিদ্যুতের সরঞ্জাম, পরিকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতির প্রায় পুরোটাই চীনের দখলে। **চীনের অতি উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর প্রধান বাজার ভারত।** অন্যদিকে সর্বত্র তার আগ্রাসী দখলদারি মনোভাব এবং তাদের দেশ থেকে বিশ্বের সর্বত্র করোনা অতিমারী ছড়িয়ে পড়ার ফলে **চীন আজ এক ঘরে। এছাড়াও চীন জানে যে ভারতের সামরিক শক্তি আজ ১৯৬২-র স্তরে নেই।** ভারতীয় স্থল বাহিনী বহুযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষিত। ভারতের বিমান ও নৌ বাহিনীও এখন শক্তিশালী, এছাড়াও ভারতের আছে দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্র। তাই চোখ রাঙালেও এবং গায়ের জোরে সীমান্তের ভূখণ্ডগুলি দখল রাখলেও চীন পারতপক্ষে ভারতের সাথে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে যেতে চাইবে না। বরং পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার এবং পরেশ বড়ুয়ার উলফা স্বাধীন গোষ্ঠী এবং উত্তর-পূর্বের অন্যান্য জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করবে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিগত ৫০-৬০ বছরে দুনিয়া ও পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্য কেরল ছাড়া

বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় বামদের চিন্তার অচলায়তনের পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৬এ মাও এর মৃত্যুর পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে উদারতাবাদী দেঙ গোষ্ঠীর পুনরুত্থান হয়। আভ্যন্তরীণ রেজিমেন্টেড কাঠামো অটুট রেখে, ১৯৮৯-র ছাত্র অভ্যুত্থানকে দমন করে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদার নীতি ও পুঁজি ধরার কৌশল কাজে লাগিয়ে চীনে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। একদা দরিদ্র চীন গত ৪০ বছরে বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনীতি জাপানকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে প্রথম অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বের প্রধান ধনী দেশ হয়ে উঠেছে। তার সাথে সামরিক, প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যের দিক থেকে বিশ্বের প্রায় প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে। চীনে পুঁজির হয়েছে অভূতপূর্ব বিকাশ। এই ধনশ্লাঘায় চীনা হান জাতীয়তা ও সম্প্রসারণবাদ আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার সহায়ক হয়েছে অতিশক্তিশালী রেজিমেন্টেড পার্টি ও সামরিক বাহিনী। শি জিন পিং-এর মত

ভারত চীন যুদ্ধ

উচ্চকাঙ্ক্ষী একনায়ক সামনে উঠে এসেছেন। দেশ, সমাজ ও পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র ও বিরোধিতাকে নির্মূল করে বর্তমান চীন সারা পৃথিবীর কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে। 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্পের মাধ্যমে তার কর্তৃত্বে বিশ্বকে এক সূত্রে বাঁধতে চলেছে। প্রথমে দান খয়রাত ও পরিকাঠামো গঠন, তারপর বিপুল ঋণ, তারপর দেউলিয়া করে একে একে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে কব্জা করে নিচ্ছে। ইউরোপের অনেক নামী সংস্থা ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি চীনা পুঁজির নিয়ন্ত্রণে। টলমলে মার্কিন অর্থনীতিও অনেকাংশে চীন নির্ভর। ভারতের প্রতিবেশী মায়নমার, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ কার্যত চীনের নয়া উপনিবেশ হয়ে গেছে। চীন ক্রমশ প্রভাব ও আধিপত্য বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ, ভুটান, আফগানিস্তান ও ইরাণের উপর। দক্ষিণ চীন সাগরে একার কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। ম্যাকাও ও হংকংকে আগেই অধিগ্রহণ করেছিল, এখন সমগ্র মঙ্গোলিয়া ও তাইওয়ানকে দাবী করছে। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামের সাথে সীমান্ত সংঘর্ষে ও যুদ্ধে ধাক্কা খেয়ে রাশিয়া ও ভিয়েতনামকে আপাতত কিছু না বললেও জাপান, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভারতের ভূখণ্ড দাবী করছে। ইসলামি সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে বৃহত্তম সিনকিয়াং প্রদেশের উইঘুর সংখ্যালঘুদের উপর অমানুষিক নিপীড়ন চালাচ্ছে। আগেই বৌদ্ধ তিব্বতীদের তিব্বতকে গ্রাস ও দমন করেছে। মায়নমারের কোকো দ্বীপ, শ্রীলঙ্কার হাম্বারতোতা ও পাকিস্তানের গদর এবং লোহিত সাগরের মুখে আফ্রিকার জিবুতিতে নৌসামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে, বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগর-আরব সাগরে রণতরী মোতায়েন করে এবং তিব্বতে একের এক সামরিক ও বিমানঘাঁটি নির্মাণ করে ও ক্ষেপনাস্ত্র বসিয়ে ভারতকে ঘিরে ধরেছে।

এই ড্রাগনের বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে বাঁচতে ভারতীয় শাসকদের বাগাড়ম্বর এবং গোমূত্র-রামমন্দির কোন কাজে আসবে না। **অবিলম্বে যেটা চাই সুপরিকল্পনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় কাজগুলি নিঃশব্দে করে যাওয়া স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী সময়সীমায় মধ্যে :**

(১) সীমান্তে চূড়ান্ত প্রস্তুতি রেখেই পারস্পরিক ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় চীনের আগ্রাসনকে নিবৃত্ত করা এবং পূর্ব লাদাখ, নির্দিষ্টভাবে গালওয়ান উপত্যকায় এল.ও.সিতে চীনকে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

(২) প্রতিরক্ষা, পরিকাঠামো, টেলি যোগাযোগ, ওষুধ, টীকা, মাইক্রোচিপস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরাসরি নিষিদ্ধ না করে চীনা সংস্থা ও পণ্যগুলো এড়িয়ে দেশজ সংস্থা ও পণ্যের উপর জোর দেওয়া।

(৩) এর জন্য উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ জোর, উৎসাহ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া।

(৪) নষ্ট করে ফেলা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা, বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র, কারখানা প্রভৃতিগুলোর পুনর্সঞ্জীবন ও আধুনিকিকরণ ঘটানো।

(৫) এর আগে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করা।

(৬) প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি করা এবং ভেঙ্গে ফেলা 'সার্কে'র পুনর্সঞ্জীবন ঘটানো।

(৭) দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে বাড়ানো এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও ক্রমশ স্বাবলম্বী হওয়া। এর ফলে সবচাইতে বেশী অর্থের সাশ্রয় হবে যা দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজগুলোও করা যাবে।

(৮) চীনকে মোকাবিলা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর পুতুল হলে চলবে না। দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে মার্কিন অক্ষ-রাশিয়া-চীন-জাপান বৃহৎ শক্তিগুলির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রেখে স্বাধীন ও সংযতভাবে চলতে হবে।

অন্যদিকে দেশের সমস্যাকে ঘুরিয়ে দিতে মোদির পাকিস্তান বিরোধী যুদ্ধজিগির যখন দেশজুড়ে নাগরিক আন্দোলনে ম্লান হয়ে গেল তখন প্রবল গণবিক্ষোভ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে মোদিকে বাঁচিয়ে দিল কোভিড অতিমারী। এবার কোভিড অতিমারী কমে আসায় মোদির চীন বিরোধী যুদ্ধজিগিরের চালকেও গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বানচাল করে দিতে হবে।

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে গিয়ে গালওয়ান সীমান্তে নিহত বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

(১৮৭০-১৯২৫)

জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের স্বরূপ নিয়ে যখন গোটা দেশের মানুষ বিভ্রান্ত, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল এই দোটানায় তারা দ্বিধাগ্রস্থ তখন তাদের চিন্তাকে সত্য দেশপ্রেমের মঙ্গলালোকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন। ৫ নভেম্বর ১৮৭০ কলিকাতায় জন্ম, ১৮৯০তে স্নাতক, ও বিলাত যাত্রা। ১৮৯৩তে ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ছাত্রজীবনেই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান, উত্তোরত্তর তা আরও বৃদ্ধি পায়। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি গুপ্ত সমিতির সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসার পর তিনি এতটাই যশস্বী হয়ে ওঠেন যে দেশের অভিজাত মহল তো বটেই বাংলার ছা-পোষা সাধারণ মানুষও তাঁকে একডাকে চিনত। বেশীরভাগ রাজনৈতিক মামলায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এইসময় 'মুরারিপুকুর বোমার মামলায়' তাঁর সওয়াল-জবাব, সাক্ষ্যগ্রহণ ও ভাষার ব্যবহার ভারতীয় ন্যায়ালয়ের দলিল হয়ে আছে। এই পর্বে তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টাররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিস্নশ বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে একজন সাহেব এ্যাডভোকেট জেনারেলের থেকে বেশী পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলি নিযুক্ত করেছিলেন। আইন ব্যবসায় তাঁর অর্থোপার্জনের কোনও সীমা ছিল না। এতদসত্ত্বেও ১৯০৬তে এক পিতৃবন্ধুর ঋণের দায়ভার গ্রহণ করে তিনি দেউলিয়া প্রতিপন্ন হন। যদিও অনতিবিলম্বে সেই ঋণ শোধ করে পুনরায় স্বমহিমায় ফিরে আসেন।

সিস্টার নিবেদিতার সংস্পর্শে তিনি আগেই এসেছিলেন এবং ক্রমশঃ দেশপ্রেমিকরূপে নিজেকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলছিলেন। ক্রমশঃ গান্ধিজীর সান্নিধ্যে এসে তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন। ১৯২০তে মহাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সে সময় মাসিক সহস্র টাকা রোজগারের আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বিলাস-বৈভবের চূড়ান্ত পর্যায় থেকে একেবারে মাটিতে নেমে সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ান তিনি। দেশের মানুষ তাঁর এই ত্যাগ উপলব্ধি করে তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। আইন অমান্য আন্দোলনে বাংলার প্রধান নেতারূপে তিনি প্রথমেই নিজ পত্নী বাসন্তি দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবীকে কারাবরণ করতে নির্দেশ দেন। সেটাই ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহিলাদের প্রথম যোগদান ও কারাবরণ। ১৯২১-এ নিজেও আইন অমান্য করে কারারুদ্ধ হন। পরের বছর কারামুক্ত হয়ে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তিকালে কংগ্রেস্রের আন্দোলনের গতিপথ কেমন হবে এই নিয়ে গান্ধিজীর সাথে তাঁর মতবিরোধ হলে তিনি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। মোতিলাল নেহেরু, রাম মনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন। আর তার আগেই তিনি পাশে পেয়ে যান ছাত্র ও শিষ্যরূপে সুভাষচন্দ্র বসুকে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দল অত্যন্ত ভাল ফল করলে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। প্রিয় সুভাষকে তিনি করেন চিফ এক্সিকিউটিভ। স্বরাজ্য দল সে সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে ভাল ফল করেছিল।

কেবল রাজনীতি বা আইনচর্চাই নয়, তিনি রীতিমত সাহিত্যচর্চাও করেছিলেন। কবি ও লেখকরূপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যা পরিস্ফুটিত হয়েছিল 'মালঞ্চ', 'সাগরসঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থে এবং 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনায়। মেয়র থাকাকালে তিনি বাংলায় জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দানবীর কর্ণের ন্যায় তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি দেশের কল্যাণে দান করে দিয়েছিলেন। এমন কি নিজের বসতবাটিটিও। যা আজ 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে দেশের সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় সরকারি সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যে কথা দিয়ে এই প্রতিবেদন শুরু হয়েছিল জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সংজ্ঞা হতে পারে দেশবন্ধুর জীবন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন—''জাতীয়তা একটা উপায়, যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এইজন্য প্রয়োজন যে ইহার মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু জাতীয়তাই শেষ কথা নয়। আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা মিলনের শর্তগুলিকে বিবেচনা করিবার সময় জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্মের, আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্টে নবযুগের উপযোগীভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশই সমগ্র ভারতের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মত, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।... জাতিতে-জাতিতে মিলন পৃথিবীপৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে। বন্দেমাতরম্।''

রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষার বিপুল কর্মকাণ্ডে প্রবল পরিশ্রমে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যদ্ধারের জন্য দার্জিলিং গেলে ১৬ জুন ১৯২৫-এ তিনি ইহজগৎ ছেড়ে চলে যান। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক জগতে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কলিকাতায় তাঁর শেষযাত্রায় অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয়েছিল।

দানবীর, দেশবন্ধুর প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর বিখ্যাত সেই দুটি পংক্তি—"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষে তাঁর প্রতি রইল আমাদের বিনম্র প্রণাম।

আচার্য যদুনাথ সরকার

আচার্য যদুনাথ সরকার

(১৮৭০-১৯৫৮)

ভারতবর্ষে আধুনিক ইতিহাসচর্চার ভগীরথ ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। বিদেশি শাসনকালে এক স্বদেশি আত্মঅভিমানী ঐতিহাসিক ছিলেন তিনি। যদিও তাঁর জন্য তিনি সত্যকে অস্বীকার করতেন না। ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানে তাঁর মূলমন্ত্র ছিল : 'মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুজিব সত্যধন।' ১৮৯৮তে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যপনা শুরু করেন। কেবল ইতিহাসের সত্য সন্ধান নয়, সে সত্যকে জন-সাধারণের মাঝে এমন কি বিদ্যালয়ের কিশোর পাঠকের কাছেও তা পৌঁছে দিতে উৎসুক ছিলেন তিনি। কিন্তু সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। এ সময়ে ভগিনী নিবেদিতার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। মূলতঃ নিবেদিতার উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চায় নিমগ্ন হন। ১৯০০ ও ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয় 'Economics of British India' ও 'The India of Aurangzib'। এরপর ১৯২৪এ তাঁর কালজয়ী গবেষণা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য 'History of Aurangzib' তারপর আবার বিশদ গবেষণায় তার সেরা কীর্তি চার খণ্ডে সমাপ্য 'The Fall of the Mughal Empire'। এছাড়াও তাঁর 'Shibaji and His Time; 'Chronology of Indian History' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যা আজও ভারতীয় মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়।

ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়াও তিনি সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই তিনি কবির বেশ কিছু রচনার ইংরাজী অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যুক্ত থাকার পর ১৯২৬এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন।

ব্রিটিশ সরকার তাঁর কৃতিত্বের জন্য তাঁকে প্রথমে CIE উপাধিতে এবং পরে ১৯২৯ নাইটহুড সম্মানে ভূষিত করে। দেশবাসীর কাছে তিনি তাদের প্রিয় আচার্যরূপে অভিষিক্ত ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর, ১৮৭০ রাজসাহীর এক রাজপরিবারে তাঁর জন্ম আর প্রয়াত হন ১৯মে, ১৯৫৮। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শিশিরকুমার বসু

শিশিরকুমার বসু

(১৯২০-২০০০)

১৭ জানুয়ারি, ১৯৪১ রাত একটা বেজে পঁচিশ, কুয়াশার চাদরে মোড়া রাতের নিকষ অন্ধকার ফুঁড়ে BLA 7169 নাম্বার দেওয়া একটি ওয়ান্ডারার গাড়ি এলগিন রোডে গোটা বাড়ি ঘিরে থাকা ঘুমে ঢুলু ঢুলু পুলিশ প্রহরা পেড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। গাড়িতে সওয়ার এক মুসলমান মৌলভি সাহেব আর গাড়ি চালাচ্ছে বছর কুড়ির এক যুবক। কেউ কিচ্ছু বোঝার আগেই গাড়ি কলিকাতা শহর পার করে দুদিন টানা যাত্রা করে পৌঁছেছিল বিহার প্রদেশের গোমো স্টেশনে। গাড়ি থেকে নেমে সে মৌলভি ট্রেনে চড়ে রওনা দিল পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে। ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে দৃষ্টির সীমানা পার হয়ে গেল সে রেলশকট। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বাঁক নিল এক নতুন এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায় রচনা করবে বলে। এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অন্যতম এক দুঃসাহসিক ঘটনা।

একথা বলাই বাহুল্য যে, সেই যুবক ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও নেতা শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র ডাক্তারি পাঠরত শিশির কুমার বসু আর মৌলবী বেশে সেই সওয়ারি ছিলেন তাঁর প্রিয় রাঙাকাকা সুভাষ চন্দ্র বসু।

কেবলমাত্র ঐ একটি ঘটনা নয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ নিয়ে বারবার ব্রিটিশ সরকারের রোষের মুখে পড়েছিলেন শিশিরকুমার বসু। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের লাঠিতে প্রবল আঘাত পেয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হন। ব্রিটিশের এক নম্বর শত্রু সুভাষ চন্দ্রের অন্তর্ধানে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকার জন্য সরকারপক্ষ বার বার কোনও না কোনও কারণে তাঁকে কখনো লালকেল্লায়, কখনো লাহোর দুর্গে আবার কখনো বা লায়ালপুর জেলের সলিটারি কুঠুরিতে বন্দী করে রাখে। ব্যাহত হয় তাঁর মেধাবী ছাত্রজীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে এ্যাডভান্স স্টাডির জন্য লন্ডন, শেফিল্ড ও ভিয়েনায় যান। দেশে ফিরে অত্যন্ত প্রথিতযশা শিশুচিকিৎসকরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন।

ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি স্বাধিনোত্তর ভারতে নেতাজীকে নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক বাড়িটিকে তিনি নেতাজী ভবন নামে একটি চমৎকার মিউজিয়াম রূপে গড়ে তোলেন। যেখানে নেতাজীর জীবন ও তাঁর বিভিন্ন কর্মকান্ডকে মানুষ কিছুটা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে চৌরঙ্গী কেন্দ্রের বিধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর পিতা শরৎচন্দ্র বসু ও পিতৃব্য সুভাষ চন্দ্র বসু তথা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নানা বই ও প্রবন্ধ

লেখেন। তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'মহানিষ্ক্রমণ', 'বসুবাড়ি' প্রভৃতি। এরই পাশাপাশি নিজে যেমন নেতাজীকে নিয়ে একাধিক গবেষণা করেছেন, তেমনি অন্যদেরও গবেষণায় সহায়তা করেছেন। জন্ম শতবর্ষে তাঁর প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

(১৯২০-২০১০)

পশ্চিমবঙ্গের শেষ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (১৯৭২-১৯৭৭)। একই সাথে যেমন ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ রাজনীতিবিদ ঠিক তেমনি বহু বিতর্কে বিতর্কিত একটি বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। মাতামহ স্বনামধন্য ব্যরিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন প্রথিতযশা ব্যারিস্টার। ১৯৫৭তে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রূপে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। দায়িত্ব পান আদিবাসি কল্যাণ ও আইনমন্ত্রকের। ১৯৬২তে নির্দল সদস্যরূপে পুনরায় জয়লাভ করেন। এরপর ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে সংসদে শিক্ষা মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। পাশাপাশি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১৯৭০এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধির ফলে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার হস্তক্ষেপ করে। এই সময় একদিকে শুরু হয় সশস্ত্র নকশাল আন্দোলন, অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধ। তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ালেও নকশাল আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেন। বিতর্কিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ এই পর্যায়ে তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বহু বিতর্ক এই সময় তৈরি হয় তাঁর শাসনকার্য নিয়ে। ক্ষমতার ব্যবহারে তিনি খানিকটা স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে পড়েন। আবার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন। কথিত আছে তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে 'জরুরি অবস্থা' জারির পরামর্শ দিয়েছিলেন।

১৯৭৭এ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ও কংগ্রেসের ভাঙ্গন (জনতা দল ও অন্যান্য গোষ্ঠী) তাঁকে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করে তুললেও তাঁর রাজনৈতিক ও কূটনীতিক প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করা যায়নি। যার পরিণতিতে ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ তিনি ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের রাজ্যপাল এবং ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর সময়েই পাঞ্জাবের সশস্ত্র খালিস্তানী আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করেন। অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্টের মুসলমানদের অধিকার রক্ষা নিয়ে আইনি লড়াই চালান। তিনি অত্যন্ত ক্রীড়ামোদি ছিলেন ও ভালো খেলোয়ার ছিলেন। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম তারই শাসনকালে তৈরি হয়। এছাড়া কলিকাতার বুক চিরে মেট্রোরেলের গতির ডানা মেলায় তাঁর অনন্য অবদান ছিল।

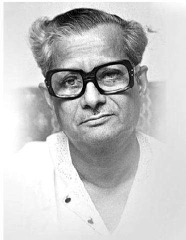

সন্তোষকুমার ঘোষ

সন্তোষকুমার ঘোষ

(১৯২০-১৯৮৫)

বাংলা সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনের শৈলী বদলে দিয়েছিলেন যিনি তিনি সন্তোষ কুমার ঘোষ। বাংলা সংবাদপত্রের প্রারম্ভকাল থেকে সম্পাদক প্রধান সংবাদ বিতরণের ধারা ছিল প্রচলিত। মানুষ সে সময় সম্পাদকের পরিচিতিতেই সেই সংবাদপত্রটির পাঠক হত। সম্পাদকের পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গিই সংবাদপত্রটিতে প্রতিফলিত হত মাত্র। ১৯৫৮ সালে সন্তোষকুমার ঘোষ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদকের পদে যোগ দেবার পর কেবলমাত্র ঐ পত্রিকাতেই নয় অন্য সংবাদ পত্রেও সাংবাদিকতার ধরণ বদলে যায়। সম্পাদক প্রধান সংবাদপত্র গুলি ক্রমশঃ সংবাদপ্রধান সংবাদপত্র হয়ে উঠতে থাকে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই রীতি শুরু হলে অন্যান্য সংবাদপত্র সেই রীতিকে অনুসরণ করতে থাকে। কেবলমাত্র এটুকুতেই থেমে থাকেননি সন্তোষকুমার। সাংবাদিকতার সাথে সাহিত্যের যুগলবন্দীতে তিনি সংবাদ পরিবেশনকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তোলেন। খবরের কাগজের সংবাদ তখন এতটাই সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে যে তা বাঙালির বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘরের হেঁসেলেও পেল অনায়াস গতি। কেবলমাত্র শহরের বাবুদের কোঠাবাড়িই নয় গ্রামের চন্ডিতলাতেও সংবাদপত্র পেল সমান জনপ্রিয়তা।

শুধু সাংবাদিকতা নয় সন্তোষকুমার ঘোষের মননশীলতায় প্রবাহিত ছিল সাহিত্যের স্রোতস্বিনী। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তাঁর প্রথম গল্প 'বিলিতি ডাক' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নানা রঙের দিন' থেকেই তিনি এক নূতন রচনাশৈলী নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করলেন। এরপর ১৯৪৯ থেকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবারিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি'। আরও অনেক লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শেষ নমস্কার; শ্রী চরণেষু মাকে' ১৯৭৩ সালে তাঁকে এনে দেয় সাহিত্য একাদেমি সম্মান। তিনি গাড়ি চালাতে খুব ভালবাসতেন। গোটা দেশের ভূগোল ছিল তাঁর নখদর্পণে। এই গাড়ি চালনা কালে তাঁর কণ্ঠে ভর করতো রবীন্দ্রনাথ। একের পর এক গান ও কবিতা তিনি শুনিয়ে যেতে পারতেন।

সন্তোষকুমারের ছিল জহুরীর চোখ। তিনিই প্রথম বয়সে তরুণ, নবীন সাহিত্যিকদের সংবাদপত্রের সাংবাদিকরূপে যুক্ত করলেন। যাদের মধ্যে অন্যতম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। অন্যদিকে বরুণ সেনগুপ্তের মত সাংবাদিককে করে তুললেন সাহিত্যিক। জনপ্রিয়তায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সেই সময়ে যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা নিদর্শন ছিল।

যদিও ফরিদপুরের এক রাজপরিবারের ছেলে ছিলেন তিনি।

তবুও শিক্ষালাভের আশায় কলকাতায় এসে অর্থাভাবে তিনি স্নাতকোত্তর পড়া শেষ করতে পারেন নি। রোজগারের আশায় খবরের কাগজের চাকরিতে যোগ দেন। প্রথমে ইংরাজী পত্রিকা 'নেশান' এরপর ছোট ছোট বাংলা পত্রিকা, 'জয়হিন্দ', 'প্রত্যহ'র পর ফের ইংরেজি কাগজ 'দ্য স্টেটসম্যান', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' হয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বার্তা সম্পাদকের কাজে যোগদান করেন।

১৯৭১-এ আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭২-এ বিশেষ আনন্দ পুরস্কার, ঐ বছরেই সাহিত্য এ্যাকাডেমি সম্মান এবং ১৯৭৪এ তাইওয়ানে তিনি সাম্মানিক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত। সন্তোষ কুমার ঘোষের জন্ম শতবর্ষে তাঁর প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

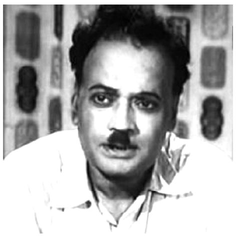

জহর রায়

জহর রায়

(১৯১৯-১৯৭৭)

জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশালে। 'পূর্বরাগ', 'অঞ্জনগড়' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ। দক্ষ চরিত্রাভিনেতা এবং শক্তিশালী কৌতুকাভিনেতা হিসাবে বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর অভিনীত 'ধন্যি মেয়ে', 'ছদ্মবেশী', 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'বসু পরিবার', 'জতুগৃহ', 'থানা থেকে আসছি', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'কাল তুমি আলেয়া', 'নিশিপদ্ম', 'মণিহার', 'ঠগিনী' প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' ও 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন', ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ও 'যুক্তি তক্কো গপ্পো', তপন সিংহের 'উপহার', তরুণ মজুমদারের 'পলাতক', 'আশিতে আসিওনা', 'মিস প্রিয়ংবদা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

(১৭৭০-১৮৫০)

ভিক্টোরিয়ান যুগের এই রোমান্টিক ও পরিবেশ প্রেমী কবি আধুনিক ইংরেজি কবিতার স্রষ্টা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যিক সৃষ্টি শেক্সপীয়র ও মিলটনের পর এলিজাবেথীয় যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। যে ফরাসী বিপ্লবের আকর্ষণে তরুণ কবি ফ্রান্সে চলে গিয়েছিলেন, তার সন্ত্রাসময় ধ্বংসাত্মক পরিণতি বিষাদময় কবিকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে আনে। সহ কবি কোলরিজের সাথে তাঁর সাহিত্যচর্চা প্রগাঢ় হয়েছিল। তাঁর আড়াইশোতম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ।

ফ্রিডরিখ হেগেল

ফ্রিডরিখ হেগেল

(১৭৭০-১৮৩১)

বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক। প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র, সমকালীন দর্শন, গণিত, দাবা, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির উপর প্রবল পাণ্ডিত্য ছিল। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দর্শনের অধ্যাপকের মৌলিক দার্শিনিক চিন্তাভাবনা সমকালীন ও পরবর্তী ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। হেগেলিয়ান দর্শনের অন্যতম মৌলিকতা ডায়ালেকটিকস্ বা দ্বান্দ্বিকতা এবং অবজেকটিভ আইডিয়ালিশম বা বিষয়গত ভাববাদ। তাঁর আড়াইশোতম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধা।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

(১৮২০-১৮৯৫)

মানব ইতিহাসে শোষিত ও শ্রমজীবী মানুষের পরম হিতার্থী, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম দার্শনিক, সমাজকর্মী, শ্রমিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা। পারিবারিকসূত্রে ও কৃতকর্মে অর্জিত সমস্ত শিল্প ও সম্পদ মানব কল্যাণে ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে বিক্রি করে দেন। এই জার্মান মানবতাবাদী ছিলেন মার্কসের সহযোদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষক, মার্কসবাদের ভাষ্যকার, 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' ও 'পুঁজি'-র পরবর্তী খণ্ডগুলির সহরচয়িতা। দর্শন নিয়ে তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'অ্যান্টি-ডুরিং' এবং সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে 'দ্য অরিজিন অফ দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট'। তাঁর দ্বিশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধা।

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

(১৯২০-১৯৯২)

বিশিষ্ট রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানী-লেখক এবং জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা আইজাক অ্যাসিমভের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধা।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২০-১৯৮৩)

বাংলা চলচ্চিত্র, নাটক ও বেতার জগতের বিশিষ্ট কৌতুক শিল্পী। ৩০০ এর বেশী চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সময়ময় (ভানু) বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতি, আর.এস.পি. এবং ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সাথে যুক্ত ছিলেন। গানও করেছেন।

প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পি. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯৩৬-২০২০)

বাংলা তথা ভারতের ক্রীড়া জগৎ তাঁকে একডাকে চিনতো পি. কে. নামে। সমগ্র ভারতের ফুটবল দুনিয়ায় তিনি অবিসংবাদী সম্রাটের মত বিচরণ করতেন। অথচ একবার সামান্য সময়ের জন্য লোনে মোহনবাগান ক্লাবে খেলা ছাড়া তিনি কলকাতার তিন বড় ক্লাবে খেলেন নি। এতদসত্ত্বেও ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৬ তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের নিয়মিত সদস্য। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিহারের হয়ে সন্তোষ ট্রফি খেলতে নেমেই দুঁদে কোচেদের চোখে পড়ে যান। পরের বছর কলকাতার এরিয়ান ক্লাবে যোগ দেন। তারপর ইস্টান রেলে চাকরির সুবাদে সেই দলের হয়েই বাকি সময়টা খেলে যান। তারই মাঝে ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিক (ভারত চতুর্থ স্থান) ও ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে (অধিনায়ক) তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৯৫৮তে টোকিও ১৯৬২তে জাকার্তা ও ১৯৬৬তে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে তারই গোলে ভারত এশিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়। সে সময় ভারতীয় ফুটবলে চুনি, বলরাম, পি. কে. এই থ্রি মাসকেটিয়ার্সের রাজ ছিল। তিনজন তিন ক্লাবে খেললেও প্রথম দিন থেকেই তারা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কিন্তু বাকি দুই বন্ধুর থেকে তিনি তাঁর মুকুটে আরো অনেকগুলি পালক গুঁজেছিলেন কোচ পি. কে. রূপে। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলে কোনদিন না খেললেও কোচ হিসাবে এই দুই ক্লাবকেই তিনি প্রচুর সাফল্য দিয়েছেন। ক্লাব ফুটবলে তিনি ছিলেন কিংবদন্তী কোচ। তাঁর 'ভোকাল টনিক'-এ অনুপ্রাণিত হয়নি এমন ফুটবলার বাংলা বা ভারতে ছিল না। তবে শুধুমাত্র ভোকাল টনিকের কথা বললে তাঁকে ছোট করা হয়। খেলার স্ট্র্যাটেজি নির্মাণেও তিনি ছিলেন ধুরন্ধর। সে সময় একটা কথা প্রচলিত ছিল পি. কে. যেখানে ট্রফি সেখানে। যদিও শুধুমাত্র ক্লাব কোচিং এই তিনি থেমে থাকেন নি। বাংলা, রেল ও ভারতের জাতীয় দলের কোচ হয়েও তিনি যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিলেন ভারতীয় ফুটবলে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৬ ভারতের সিনিয়ার ফুটবল দলের কোচ ছিলেন। এরপর ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ টাটা ফুটবল এ্যাকাডেমির টেকনিকাল ডিরেক্টর ছিলেন এবং অনেক জুনিয়র ফুটবলারকে জাতীয় দলের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন।

কেবল খেলার জগৎ নয়, তিনি চমৎকার গান গাইতে পারতেন। ভাল রান্না করতে পারতেন, দারুণ গল্প করতে পারতেন আর যেটা সবচেয়ে ভাল পারতেন সেটা হল পুত্র প্রতীম অগণিত ছাত্র-ফুটবলারদের আদর্শ অভিভাবক হতে। কে নেই সে দলে? সুধীর, গৌতম, শ্যাম, হাবিব, সুভাষ, সুব্রত, মনোরঞ্জন, সুরজিৎ, ভাস্কর থেকে শুরু করে প্রসুন, অলোক, শ্যামল, প্রশান্ত, সমরেশ, সত্যজিৎ, শিবাজী, বাইচুং, মিহির, পায়াস, সাব্বির, প্রদীপ চৌধুরী নাম লিখে শেষ করা যাবে না।

খেলোয়ার জীবনে তিনি পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার—অর্জুন, ফিফা অর্ডার অফ মেরিট, অলিম্পিক ফেয়ার প্লে ব্যক্তিগত পুরস্কার, ভারত নির্মাণ এ্যাওয়ার্ড, ইন্ডিয়ান ফুটবলার অফ্ টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি, এবং ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পদ্মশ্রী।

তিরুনেল্লাই নারায়ণ আইয়ার শেষণ

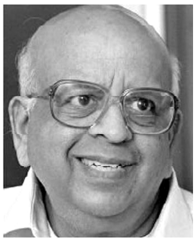
টি. এন. শেষণ

(১৯৩২-২০১৯)

টি. এন. শেষণ নামেই তিনি ছিলেন সবিশেষ পরিচিত। তিনি ছিলেন ভারতের দশম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কেবলমাত্র চাকুরি পরীক্ষায় সাফল্যকামি সিরিয়াস প্রার্থীরা ছাড়া সামান্য কয়েকজনই তাঁর আগে ও পরে এই পদে অধিষ্ঠিত কমিশনারদের নাম বলতে পারবে। ১৯৯০ সালে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৬ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা ছ বছর তিনি এ পদে ছিলেন। এই সময়কালে তিনি নির্বাচন কমিশনকে যে মর্যাদা ও ক্ষমতায় প্রতিস্থাপিত করতে পেরেছিলেন একটা উদাহরণ হয়ে রয়েছে এবং ভারতে মত একটা গণতান্ত্রিক দেশের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে যথেষ্ট মজবুত করেছে। শাসক ও বিরোধী নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতাদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন তাতে অনেকটাই সফল হতে পেরেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল দেশের কোটি কোটি ভারতীয় ভোটারদের হাতে সচিত্র ভোটার কার্ড তুলে দেওয়া। এই ভোটার পরিচয় পত্র তৈরিতে তিনি সবচেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিলেন এই রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছ থেকে। অথচ এ রাজ্যের সেই মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই শেষণ সর্বপ্রথম ভোটার পরিচয়পত্র বা এপিক তুলে দেন। সংবিধান মতে এ দেশে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও পরিধি কতটা তা রুলবুক খুলে তার প্রয়োগ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য ১৯৯৩ সালে সরকারের তরফে নতুন আইন করে তিনজন সমমর্যাদার নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করা হয়।

বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এদেশ তার গণতান্ত্রিক মহিমার জন্য যে কটি মানুষের কাছে ঋণী থাকবে টি.এন. শেষণ তাদের অন্যতম।

নবনীতা দেব সেন

নবনীতা দেব সেন

(১৯৩৮-২০১৯)

হিন্দুস্তান পার্কের 'ভালোবাসা'য় বাসা বাঁধা বাংলা সাহিত্য প্রেমীদের বড় ভালবাসার লেখিকা-শিক্ষিকা নবনীতা দেব সেন ৭ নভেম্বর, ২০১৯ এ জগতের সকল বাসার বাঁধন ছিন্ন করে চলে গেলেন। বিখ্যাত কবি দম্পতি পিতা নরেন্দ্র দেব ও মাতা রাধারানী দেবীর উজ্জ্বল উত্তরাধিকার ও নোবেল জয়ী প্রাক্তন স্বামী অমর্ত্য সেনের বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের জটাবৃত্ত ও নিজ সৌকর্যে সমুজ্জ্বল নবনীতা দেব সেন পঠন-পাঠন ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে এক নতুন রীতির সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। অনেক সহজ-সরল রম্য ভঙ্গিতে অনেক গভীর তত্ত্বের উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায় এ ক্ষমতা ছিল তাঁর করায়ত্ত্ব। নারীবাদ কি অনায়াস ভঙ্গিতে তাঁর লেখনিতে প্রকাশ পেত। 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে', 'বামাবোধনী', 'কুম্ভমেলা' প্রমুখ উপন্যাস ছাড়াও অসংখ্য রম্যরচনা, কবিতা, গল্প ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কলামে তিনি সদা নিজেকে সৃষ্টিশীল রেখেছিলেন। তাঁর অন্য দৃষ্টিতে লেখা রামায়ণের প্রতিচ্ছবি 'সীতায়ন' ভারতে বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা। পদ্মশ্রী, সাহিত্য একাডেমি ও আরও অনেক পুরস্কারে সম্মানিতা নবনীতা দেব সেন।

তুষার কাঞ্জিলাল

তুষার কাঞ্জিলাল

(১৯৩৫-২০২০)

অধুনা বাংলাদেশের এবং ১৯৪৫-র দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি থেকে এ দেশে দেশভাগের আগেই দেশে চলে আসেন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, রাজনীতিক তুষার কাঞ্জিলাল। হুগলীর জাঙ্গীপাড়ায় থাকতে থাকতেই তিনি ছাত্রাবস্থাতেই মার্কসবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন। যার পরিণতিতে লেখাপড়ার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে মাঝে মাঝেই। কারান্তরালেও যেতে হয়েছে মাঝে-মাঝেই। এরই মাঝে আশির উত্তাল দশকে তিনি শিক্ষকতার চাকুরি নিয়ে চলে যান সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়ায়। পরবর্তীকালে সেখানেই প্রধান শিক্ষকের কাজ সামলিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন এক আদর্শ সমাজকর্মী। তৈরি করেন 'ট্যাগোর সোসাইটি অফ রুরাল ডেভলেপমেন্ট'। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত জন-জীবনকে খুব কাছ থেকে মনন ও অধ্যয়ন করে হয়ে ওঠেন সুন্দরবনের রক্ষাকর্তা। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন বহু পুরস্কার। যার মধ্যে আছে পদ্মশ্রী ও যমুনালাল বাজার এ্যাওয়ার্ড। আক্ষরিক অর্থেই সুন্দরবনের অভিভাবক মাস্টারমশাই তুষার কাঞ্জিলাল এ বছর বাগদেবীর আরাধনার দিনই ১৯ জানুয়ারি, ২০২০তে প্রয়াত হলেন।

কৃষ্ণা বসু

কৃষ্ণা বসু

(১৯৩০-২০২০)

ডঃ শিশির কুমার বসুর সহধর্মিনী কৃষ্ণা বসুর ছিল নানাবিধ পরিচিতি। শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, রাজনীতিক, সঙ্গিতজ্ঞা, লেখিকা, গবেষক প্রভৃতি। এর প্রতিটিতেই তিনি ছিলেন যথেষ্ট সপ্রতিভ। সিটি কলেজে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ সাংসদ রূপে তিনি কাজ করেছেন। বাজপেয়ির নেতৃত্বে একাদশ লোকসভায় তিনি ছিলেন বিদেশ সংক্রান্ত সংসদীয় সমিতির অধ্যক্ষ। শিশুকল্যাণ ও অবহেলিত মহিলাদের জন্য নির্মিত বেশ কয়েকটি সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভাতখণ্ডে সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গীত স্নাতক ছিলেন তিনি। দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত কলামনিস্ট। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি গবেষক ছিলেন তিনি। তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তাঁর 'চরণ রেখা তব' গ্রন্থটি।

মিস শেফালি

মিস শেফালি

(১৯৪৪-২০২০)

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু অভাবী পরিবারের সন্তান আরতি দাসকে জীবনধারণের জন্য বেছে নিতে হয় হোটেল ও বার নৃত্য। পেশাগত জীবনে পরিচিত ছিলেন মিস শেফালি নামে। ক্যাবারে কুইন বলতে একটা বড় সময় নাট্যমোদি অভিনয়প্রেমী মানুষ তাকেই বুঝতো। একই সঙ্গে বাংলা, হিন্দী রূপালী পর্দার জগৎ ও নাট্যমঞ্চ তিনি তাঁর দেহের হিল্লোলে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনীত নাটকের টিকিট ব্ল্যাক বা কালোবাজারেও বিক্রি হত। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সীমাবদ্ধ' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' চলচ্চিত্রেও যেমন তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত 'চৌরঙ্গী'তেও ছিলেন সমান সাবলীল। আবার বলিউডের 'মনোরঞ্জন', 'শোর', 'ব্ল্যাকমেল' 'মেরে হুজুর' প্রভৃতি হিট, সুপারহিট ছবিতে তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। মঞ্চাভিনয়ে অনবদ্য ছিলেন তিনি 'আসামী হাজির', 'চৌরঙ্গী' প্রভৃতি নাটকে। একইসাথে যৌনতা ও শিল্পীসত্তার অনুপম মেলবন্ধন ঘটেছিল তাঁর অভিনয়ে। শিল্পী জীবনে তাঁর আয় থেকে বহু দুঃস্থ মানুষকে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছেন।

নিমাই ঘোষ

নিমাই ঘোষ

(১৯৩৪-২০২০)

লেন্সের কারিকুরির পিছনের মানুষটি সর্বদাই থেকে যান আলোর বৃত্তের বাইরে। এমনই একজন মানুষ ছিলেন নিমাই ঘোষ? সত্যজিৎ রায় একদিন তার সুটিং-এর মধ্যে লক্ষ্য করলেন কেউ একজন তাঁর স্টিল ফটো নিয়ে চলেছে। ব্যাপারটা তার কতটা মনোঃপুত হয়েছিল সে সময় বোঝা না গেলেও পরে তাঁর টিমের পার্মানেন্ট মেম্বার হয়ে যান নিমাই ঘোষ। তার লেন্সে ছবি দেখা-শোনার বাইরেও অনেক কথা বলতো। শুধু সত্যজিৎ রায় নয় বহু ফিল্মে এবং নাটকের স্টিল ফটোগ্রাফার ছিলেন তিনি। পেয়েছেন ন্যাশানাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড (২০১০)। লিখেছেন ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত বহু বই।

ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়

ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯৪৫-২০২০)

একনিষ্ঠ রঙ্গকর্মী ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় গত ২৩ এপ্রিল ২০২০ সরকারের আরোপিত লকডাউনের সকল বাধা ভেঙ্গে সারা দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন। বাংলাভাষা প্রধান নাট্যচর্চার তীর্থক্ষেত্র কলকাতার নাট্যমোদিদের তিনি তাঁর সাহসী প্রযোজনায় উপহার দিয়েছিলেন একের পর এক হিন্দি বলিষ্ঠ নাটক। জন্মসূত্রে বাঙালি না হয়েও তিনি ভালবেসেছিলেন বাংলার সংস্কৃতিকে, বিশেষতঃ নাট্যপ্রেমকে। নাট্যকর্মীরূপে তিনি নিজের আদর্শ মানতেন নটি বিনোদিনী ও কেয়া চক্রবর্তীকে। জন্মেছিলেন রাজস্থানের যোধপুরে, পারিবারিক সূত্রে তাঁর গৃহ ছিল উত্তরপ্রদেশ। উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন শ্রীশিক্ষায়তনে। পড়াশোনার ফাঁকেই চলতে থাকে নাট্যচর্চা। সত্তরের দশকের শুরুতেই শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' অবলম্বনে তৈরি হিন্দি নাটক 'মিট্টি কী গাড়ি' নাটকের একেবারে কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বসন্তসেনা্া'র ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। এরপর ১৯৭৬-এ তৈরি করেন নিজস্ব থিয়েটার গ্রুপ 'রঙ্গকর্মী'। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় ইবসেনের 'আ ডলস হাউস' অবলম্বনে তৈরি নাটক 'গুড়িয়া ঘর'-এ অভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ নাট্য অভিনেত্রীর সম্মান পান। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি নিজেই তাঁর দলের নাটকগুলির পরিচালনার ভার নিয়ে একের পর এক উপহার দিতে থাকেন—'মহাভোজ', 'রুদালি', 'কোর্ট মার্শাল', 'হিম্মত মাই', 'মানসী' (বাংলা), 'অন্তর্যাত্রা'র মত সময় ও সমাজ সচেতন সব নাটক। 'রঙ্গকর্মী'র জন্য একটা স্বতন্ত্র আগ্রহী দর্শকমন্ডলী তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন তিনি। নব প্রজন্মের কুশিলবদের একেবারে কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। আবার দল পরিচালনায় বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। এবছর তাঁর নাট্যজীবনের ৫০ বছর পূর্তি হতে চলেছিল। পুরোদমে মহলা চলছিল রঙ্গকর্মীর নতুন নাটক 'সরথদে'-র। তাঁর ছাত্র-ছাত্রী, অনুরাগীরা একই সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাঁর ৭৫তম জন্ম বার্ষিকীর। কিন্তু হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যবনিকা ফেলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তাদের সকলের প্রিয় অভিভাবক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়।

চুনী গোস্বামী

চুনী গোস্বামী

(১৯৩৮-২০২০)

ঝড়ে পড়ল আরও এক এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় ক্রীড়া জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সুবিমল 'চুনী' গোস্বামী। একই সাথে ফুটবলে দেশকে এবং ক্রিকেটে রাজ্যকে সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার মত এমন বিরল প্রতিভা ভারতের সর্বকালের ক্রীড়া জগতে আর নেই। শুধু কি তাই, হকি ও টেনিসের মত খেলাতেও তিনি ছিলেন বেশ পটু। 'ঢাকার পোলা' (১৫ই জানুয়ারি ১৯৩৮, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশে জন্ম) হয়েও তিনি ছিলেন চিরকালীন মোহনবাগানী। যদিও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর সেরা সময়ে ইংলন্ডের অন্যতম সেরা ক্লাব টটেনহমে খেলার প্রস্তাব তিনি এককথায় ফিরিয়ে দেন তাঁর প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানে খেলবেন বলে। কিন্তু ক্লাবেরও আগে তিনি দেশকে ভালবাসতেন। তাঁর অধিনায়কত্বে ১৯৬২-তে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ভারত ফুটবল চ্যাম্পিয়ান হয়। এছাড়া ১৯৬৪তে তেল আভিভে এশিয়ান কাপ ও মালয়েশিয়ায় মারডেকা কাপে ভারত রানার্স-আপ হয়। এশিয়ার ফুটবলে সে সময় ভারত ছিল অন্যতম সেরা শক্তিধর দেশ। ৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের ১৬টিতে তিনি ছিলেন দেশের অধিনায়ক, করেছিলেন সর্বমোট ১৩টি গোল যার মধ্যে অলিম্পিকও আছে। তাঁর অধিনায়কত্বে বাংলা ১৯৫৫-১৯৬০ পর্বে তিনবার ফুটবলে দেশের সেরা সন্তোষ ট্রফি জেতে। তাঁর করা গোলের সংখ্যা ছিল ২৫ আর প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের হয়ে (১৯৫৪-১৯৬৮) তিনি করেছিলেন ২০০টি গোল। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ টানা পাঁচ বছর তিনি ছিলেন অধিনায়ক। তাঁর ড্রিবলিং-এর যাদুতে ছিটকে যেত বিপক্ষের বাঘা বাঘা ডিফেন্ডাররাও।

ফুটবল খেলতে খেলতেই খেলেছিলেন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটও। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৩ এই পর্বে তিনি দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। এ সময়ের মধ্যে বারবার রাজ্য দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার দুটি খেলা থেকেই ডাক পেয়েছিলেন। তিনি ভারতের একমাত্র খেলোয়ার যিনি একটি রাজ্যকে (বাংলা) দুটি খেলাতেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে ১৯৬৪ এবং ১৯৭২-এ বাংলা রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল খেলেছিল। ১৯৬৬তে সে সময়ে দুর্ধর্ষ অপরাজেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভারতে খেলতে এসে তাদের সম্মুখিন হয় সে সময়ের ভারতের

সবচেয়ে দুর্বল পূর্ব-মধ্য সংযুক্তাঞ্চল ক্রিকেট দল। চুনী গোস্বামীর ব্যাট-বল এমন কি ফিল্ডিং-এর তেজে তারা হেরে যায়। হেরে গিয়ে তারা এতটাই রেগে গিয়েছিল যে টেস্টে ভারতকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল। ভারতের টেস্ট দলে চুনীকে না দেখতে পেয়ে গ্যারি সোর্বাস তাঁর খোঁজ করে জানতে পারেন যে চুনী গোস্বামী ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ফুটবল ও ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর কলকাতার সাউথ ক্লাবের হয়ে চুটিয়ে টেনিস খেলেন তিনি। তাঁর এবং নরেশ কুমারের জুটি সে সময় দেশের একের পর এক টেনিস টুর্নামেন্টে সাড়া ফেলেছিল। মোহনবাগানের হয়ে হকিও খেলেছেন তিনি। আর এ সব কিছুর পর ১৯৮৬-৯০ পাঁচ বছর টাটা ফুটবল এ্যাকাডেমির তিনি ছিলেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। সে সময়ের বহু শিক্ষার্থী পরবর্তীকালে দেশের প্রথম সারির ফুটবল ক্লাব, রাজ্য ও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। অবশ্য সে সময় তাঁর আর একটি অভিধা ছিল 'ফুটবলের উত্তমকুমার'। তাঁর দাদা মানিক গোস্বামীও ভালো খেলোয়াড় ছিলেন।

এ সব কিছুর বাইরে তাঁর ছিল সদা হাস্যময় অসামান্য এক ব্যক্তিত্ব। যে কারণে শুধু নিজের দলের নয় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের কাছেও তাঁর আকর্ষণ ছিল অমোঘ। নিরহঙ্কারি এই মানুষটি ছিলেন জুনিয়ারদের আদর্শ অভিভাবক। সারা দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে একবার এক অনুরাগী তাকে ডাকে চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। ঠিকানা না জানা থাকায় সেখানে তিনি খবরের কাগজ থেকে চুনী গোস্বামীর একটা ছবি খালি লাগিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি ঠিক সময়েই তাঁর হাতে এসেছিল।

১৯৬২তে এশিয়ার বেস্ট স্ট্রাইকার, ১৯৬৩তে অর্জুন পুরস্কার। ১৯৮৩তে পদ্মশ্রী সম্মান, ২০০5-এ মোহনবাগান রত্ন ও কলিকাতার শেরিফ প্রভৃতি অজস্র সম্মানে তিনি ভূষিত হন।

জলি মোহন কল

জলি মোহন কল

(১৯২১-২০২০)

আদতে কাশ্মীরের মানুষ হলেও বাংলায় বেড়ে ওঠা। তরুণ বয়সে এই আদর্শবাদী নেতা কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি 'ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্স' কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা ছিলেন এবং বন্দর শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ৮৭ দিন ধর্মঘটের সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৫এ মুসলিম লীগ নেতা জিন্নার 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' প্রসূত এবং ব্রিটিশ ও সুরাবর্দি সৃষ্ট দাঙ্গার বিরোধিতা করে তিনি শ্রমিক মিছিলের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। দাঙ্গার মধ্যেও শ্রমিক ঐক্য ধরে রাখতে এবং দাঙ্গার বলি সাধারণের রিলিফের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৬২তে চীন-ভারত যুদ্ধে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্টদের অন্ধভাবে চীনকে সমর্থনের বিরোধিতা করেন। ১৯৬৩তে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি কোনপক্ষেই যোগ দেন না এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দেন। তখন তিনি ছিলেন পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন। পরে তিনি সাংবাদিকতা ও সমাজসেবার কাজে যুক্ত ছিলেন।

আবু তৈয়ব আনিসুজ্জমান

আবু তৈয়ব আনিসুজ্জমান

(১৯৩৭-২০২০)

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান নির্মাতা, ভাষা আন্দোলনের কান্ডারী, মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ, মৌলবাদ এবং 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র সেনাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জমান সাহিত সংস্কৃতি-সম্প্রীতির জগতে বিরাট শূন্যতা রেখে চলে গেলেন। জন্ম অবিভক্ত বাংলার বসিরহাটে। বাল্য কাটে কলকাতার পার্কসার্কাসে। দেশভাগের পর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের খুলনায় চলে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও গবেষক অনিসুজ্জমান পরে ঢাকা, ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-র পাকিস্তান বিরোধী গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ পরিকল্পনা সেল এবং পরে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,' 'বাঙালী নারী : সাহিত্য ও সমাজে', 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি', 'পুরোনো বাংলা গদ্য', 'আমার একাত্তর', 'মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর'। বাংলাদেশের একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার এবং ভারতের পদ্মভূষণ সহ অজস্র সম্মাননা পেয়েছেন।

দেবেশ রায়

দেবেশ রায়

(১৯৩৬-২০২০)

ডুয়ার্সের তিস্তার স্রোত বেয়ে অনন্ত সাগরে বিলীন হলেন 'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' নামক অমর মানবজমিনের আখ্যানের স্রষ্টা বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেবেশ রায়। পাবনায় জন্ম জলপাইগুড়িতে থিতু হওয়া এই বামপন্থী অন্য ঘরানার লেখকের সৃষ্টিতে বারবার উঠে আসে 'প্রান্তিক', 'প্রত্যাখ্যাত', 'প্রতিস্পর্ধী' মানুষজনের বৃত্তান্ত। তাই অবিভক্ত বাংলায় বৃহত্তর দুটি কৃষিজীবী দলিত সম্প্রদায়ের নেতা বা প্রতীক হিসাবে জ্বলজ্বল করে নমঃশূদ্র

যোগেন মণ্ডল এবং রাজবংশী বাঘারু বর্মণ। তাঁর প্রভাবশালী লেখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'যযাতি', 'সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত', বরিশালের যোগেন মণ্ডল'। সমাজকর্মী হিসাবেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

থমাস ফেলিপে কার্লোভিচ

থমাস ফেলিপে কার্লোভিচ

(১৯৫৬-২০২০)

ডি'স্টিফানো, জর্জ বেস্ট, জর্জ উইয়া, লাজল কুবালা, এরিক ক্যন্টোনা, রায়ান গিগস প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ফুটবলাররা নামী ক্লাব ও জাতীয় দলে খেললেও তাঁদের খেলোয়াড় জীবনে দেশ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠতে না পারায় বিশ্বকাপ খেলতে পারেন নি। বিশ্বকাপ বা জাতীয় দল তো দূরস্থান প্রথম ডিভিশনে না খেলেও আর্জেন্টিনার মত দুবার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল অভিজাত দেশে অ্যাঞ্জেল লাবরুনা, দানিয়েল পাসারেল্লা, ইবালদো ফিল্লোল, মারিও কেম্পেস, হারনান ক্রেসপো, জেভিয়ার মাসচেরানো, লিওনেল মেসি প্রমুখের মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ভিড়ে দিয়েগো মারাদোনা কিংবা স্বনামধন্য কোচ পোকারম্যান, বিলার্দো, মেনোত্তি, বিয়েলসা প্রমুখেরা যাকে সেরা বলেছেন তিনি হলেন থমাস কার্লোভিচ। দর্শকদের প্রিয় এল ট্রিঞ্চে। উদ্বাস্তু ক্রোয়েশিয়ান পরিবারের সন্তান কার্লোভিচ কোনদিন রোজারিও শহর ছেড়ে বেরোননি। খেলেছেন তৃতীয় বা চতুর্থ ডিভিশনে। খেলার জন্য, আনন্দের জন্য, ফুটবলকে ভালোবেসে খেলতেন। টাকা বা নামের কোন মোহ ছিল না। বল নিয়ে বা খুশি করতে পারতেন। খেলার মধ্যে তার জাগলিং ও ড্রিবলিং দর্শকদের সুখানুভূতি দিত। মেনোত্তি জাতীয় দলে যখন তাঁকে ডাকেন তখন তিনি মাছ ধরছিলেন বলে আসেননি। জাতীয় দল রোজারিওতে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে এসেছিল। এই অসম্ভব প্রতিভাবান মিডফিল্ডার একাই জাতীয় দলকে নাস্তানাবুদ করে দেন। বিরতির আগেই জাতীয় দল ৩-০ গোলে হারতে থাকায় কর্তৃপক্ষের চাপে তাঁকে বসিয়ে দিতে হয়। দারিদ্রের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা এই অনন্য প্রতিভা এক ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হন।

অমলাশঙ্কর

অমলাশঙ্কর

(১৯১৯-২০২০)

বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, নৃত্য পরিচালক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। আদতে অবিভক্ত বাংলার যশোরের কন্যা। পিতা বিশিষ্ট অলঙ্কার বিশেষজ্ঞ অক্ষয় কুমার নন্দী। মাত্র ১১ বছর বয়সে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেন। সেখানে সেইসময় ইউরোপে সাড়া ফেলে দেওয়া বিশ্ববরেণ্য নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্য দলের সাথে পরিচয়। উদয়শঙ্কর ও তাঁর মাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর আহ্বানে কিশোরী অমলার নৃত্য দলে যোগ দান। প্রথম দিকে আন্না পাভলোভা এবং পরবর্তিতে সিমকি, জোহরা প্রমুখ বিশিষ্ট নর্তকী বৃত্তকে ছাপিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা। আলমোড়ায় 'উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টার'এ যোগদান। ১৯৪২এ উদয়শঙ্করের সাথে বিবাহ। পুত্র আনন্দ ও কন্যা মমতার জন্ম। প্রয়াত আনন্দশঙ্কর ছিলেন বিশিষ্ট বাদক ও সুর স্রষ্টা। পুত্রবধূ তনুশ্রীশঙ্কর ও কন্যা মমতাশঙ্কর বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী। উদয়শঙ্করের সাথে মিলে সেইসময়কার বিস্ময় 'কল্পনা' ছবিটি তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যক্তিগত কারণে উদয়শঙ্করের সাথে সম্পর্কের অবনতি হলেও নৃত্য, নৃত্যপরিচালনা, নৃত্যশিক্ষা, চিত্রাঙ্গন, চলচ্চিত্র শিল্প ও সংস্কৃতি জগতে তিনি স্বকীয় ও সক্রিয় ছিলেন। শতায়ু এই শিল্পীর প্রয়াণে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

ধিক্কার

- উন্নাও, হায়দারাবাদ, মালদা, বামনগাছি, কুমারগঞ্জ, খেরি লখিমপুর—একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রশাসনের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তায়
- দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিংসার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যর্থতায়
- দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলিতদের উপর নির্যাতনের ঘটনার প্রশাসনের নির্লিপ্ততায়

অভিনন্দন

- বিলিয়ার্ড ও স্নুকারে বিশ্ব চাম্পিয়ন পঙ্কজ আডবানীকে বাইশতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার জন্য
- বিশ্ব র‍্যাপিড দাবায় মহিলাদের মধ্যে বিশ্বজয়ী কনেরু হাম্পিকে
- মার্কিন যুক্তরাষ্টে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থনীতিতে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পাবার জন্য।

বিশেষ স্মরণিকা

স্তব্ধ হও নিঃশব্দ মৃত্যু!!!

['স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' এর পৃষ্ঠপোষক ও লেখক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কমলেন্দু চক্রবর্তীর স্মরণে]

বিজয় প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সালটা ১৯৯২ এর কোন এক সময়। কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কলকাতার কোন একটি বড় হাসপাতালে যোগ দিয়েছি সবে মাত্র। তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যন্ত গৌরবজনক একটি সংস্থায় বেশ কয়েকবছর কাজ করার সুবাদে পুষ্টি, পাতলা পায়খানা, বস্তি বা ওই ধরনের নিম্নবিত্ত অনুষঙ্গের অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে সম্যক ধারণার একটু পুষ্টি নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। আমার এক বন্ধুর পরামর্শে ওই হাসপাতালের তখনকার ব্যস্ততম ওয়ার্ড, শিশুবিভাগে যোগ দিয়েছিলাম। ওই বিভাগে দুজন বিশেষজ্ঞ বলিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন; তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাঃ কমলেন্দু চক্রবর্তী; যিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। যাঁকে আমি আজও আমার একমাত্র 'শিক্ষাগুরু' মনে করে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে রাখি, এবং সশ্রদ্ধ, বিনম্র ভাবে আরও একটি নিবেদন করি যে, এখনও পর্যন্ত যে কজন দুর্লভ ব্যক্তিত্বর (বিশেষ করে চিকিৎসক সমাজের মধ্যে) সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, উনি তাঁদের সর্বোচ্চ সারিতে আছেন। স্যারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় একটু ঋণাত্মক দিক দিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যন্ত গৌরবজনক সংস্থার উচ্চপদ হতে এসেছিলাম শুনেই স্যার একটু হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, আমি বোধহয় ভুল জায়গায় এসেছিলাম, বা ওই কাজের জায়গায় মানিয়ে নিতে পারবোনা। স্যারের বলার সম্পূর্ণ যুক্তি ছিল। আমি ছোট্ট একটা পরিত্যক্ত হাসপাতাল কেবিনে আশ্রয় পেয়েছিলাম; মাকড়সার জাল পরিপূর্ণ ঘরের ততোধিক ধুলিধূসরিত ঘরে 'টাই', ড্রেসিং গাউন নিতান্তই বেমানান ছিল। তার চেয়েও বেশী বেমানান ছিল হাসপাতালের শিশুবিভাগে জরুরি ভাবে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার জন্য আসা অসহায়, গুরুতর অসুস্থ শিশুগুলি। রইলো পড়ে ড্রেসিং গাউন, রইলো কোথায় টাই! একটাই জামা, প্যান্ট পড়ে হাসপাতালের ডিউটি কক্ষের দ্বারে বাসা নিলাম, কেননা অসহায় শিশুদের অসহায় পরিবারগুলি এমন অবস্থায় আসেন যে, 'কলবুক'এর মাধ্যমে দেখতে আসাটাও খুব মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে জীবনহানির আশংকা যুক্ত হয়ে থাকতো। স্বভাবতঃই কয়েকদিনের মধ্যেই স্যারের স্নেহের ছায়ায় একটা জায়গা পেয়ে গেলাম। 'শিক্ষাগুরু' একটি অদ্ভুত মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, ''যমরাজকে কখনো এমনি ছেড়ে দেবে না, লড়াই করবে; দেখবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমারই জয় হবে।'' কথাটি এখনো আমি নিজে পালন করার চেষ্টা করি। অন্যদের বিনম্র ভাবে জানাই, যাঁদের আগে জানিয়েছি, তাঁদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিই। আজ একটি জেলার দায়িত্ব নিয়ে সেই শিক্ষাগুরুকে মনে মনে বলি, 'গুরুদেব, যমরাজের সাথে লড়াই করার ক্ষেত্রে এখনো রয়েছি, সঙ্গে যোগ হয়েছে অন্য একটু দায়িত্বও। অসহায় মানুষদের সঠিক সময়ে তাঁদের জায়গা হতে হাসপাতালে ডাক্তারবাবুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুরা লড়াই করার অবস্থায় লড়াই করার সময়টা পান। সারাজীবন যেন এই গুরুদক্ষিণাটুকু আপনাকে দিতে পারি স্যার।

কমলেন্দু স্যারের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তবুও কিছু অসাধারণ ঘটনার কথা স্যারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবেই নিবেদন করবো।

এক অসাধারণ চিকিৎসক ছিলেন কমলেন্দু স্যার! 'ক্লিনিকস' বলতে যা বোঝায়, তার এক স্বর্ণশিখরে উনি ছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই সকলে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করবেন। একদিন একটি ছোট্ট বাচ্চাকে 'বৃক্ক' সংক্রান্ত অসুখে প্রেসার বেড়ে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের চাপ সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডটিও ব্যর্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। স্যার আমায় একটি তরল পদার্থ দেওয়ার তখনকার ব্যবহৃত নালী (তাকে SCALP VEIN SET বলা হত) আনতে বললেন, সেটিকে অদ্ভুতভাবে শিশুটির একটি বিশেষ শিরায় প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দিলেন হৃৎপিণ্ড চাপে পড়লে, কি ভাবে সেটি নিজের হাতে পরীক্ষা করতে হয়। এইরকমভাবেই 'গ্রান্টিং', বিভিন্ন শ্বাসকষ্টের ধরন, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরীক্ষাগুলিও দেখিয়ে নিতেন। একটি শিশুর পায়ে ব্যথায় হাঁটতে পারছিল না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিশু বিশেষজ্ঞরা নানা চিকিৎসা কারও ফলপ্রসূ হচ্ছিলেন না। স্যার তখন কলকাতাতেই ছিলেন না, টেলিফোনে প্রায় পনের মিনিট সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে (তখনকার দিনে দূরে এমনি সহজে কথা বলা যেত না, অনেক খরচ করে গুটি কয় কেন্দ্রে লাইন দিয়ে STD Call করতে হত) বলেছিলেন, হাঁটুর পিছন দিকের মাংসপেশীগুলোতে বোধহয় ছোট ছোট সংক্রমণ ধরেছে। অত্যন্ত সাধারণ একটি ওষুধ দিয়ে সেই অসুখটির উপশম হয়ে যায়।, এইরকম ভাবে 'আউটডোরে' বা 'ইনডোরে' অসংখ্য শিশুর জীবন রক্ষা করেছেন।

তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা স্বর্ণাকার মনের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকবে। একদিন আমরা হাসপাতালে কাজ করছি, সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে একটি ডাক এল : একটি বাচ্চা ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে, কোন কাটাকাটি না করে যদি কোন ভাবে কোন শিরা খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে আমরা গেলাম, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোন সে বলল, 'এটা আমাদের দিয়ে হবে না, 'স্যার' কে ডাকতে হবে।'' সুতরাং ''স্যার''কে ডাকা হল। 'স্যার' হেসে বললেন, ''কি বলেন? কাটাকাটি করবেন না বলছেন? আচ্ছা, ওকে দেখি, তবে যা অবস্থা তাতে চোখ বুঁজেই চালানো সুবিধা হবে। এবং আমরা অবাক হয়ে দেখলাম কমলেন্দু স্যার হাত দিয়ে উপরে অনুভব করে করে একটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে চোখ

বুঁজে ঠিক জায়গায় প্রবেশ করালেন এবং তরল পদার্থটি খুব সুন্দরভাবে যেতে শুরু করলো। পরে সেই পুরোন ছাত্রটি বললো, ''স্যারের স্যালাইনে, কোন প্লাস্টার দেওয়া লাগেনা, মাস্‌লে এঁটে থাকে।'' এও শুনলাম, এই রকম পরিত্রাতার ভূমিকায় স্যারের অবতীর্ণ হওয়াটা তখনকার অন্যান্য চিকিৎসকদের কাছে খুবই পরিচিত ব্যাপার এবং তাঁরাও খুব খুশী মনে, উদারভাবে নির্বিশেষে ওই সাহায্যটি নিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়টি ডায়মন্ডহারবার থেকে নাম করা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ 'দিদিমণি'র কাছ থেকে আসা 'সাপে কাটা' সাত বছরের বাচ্চা। দু'দিন ধরে সাপের বিষের প্রতিষেধক দেওয়া সত্ত্বেও কোন উন্নতি নেই, বরং দিনে দিনে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আমি নানা রকম ভাবে জিজ্ঞাসা করেও সাপে কাটার সুনির্দ্দিষ্ট কোন ইতিহাস বা লক্ষণ পাইনি। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকাকালীন এই ব্যাপারে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু সেগুলি দিয়ে কিছু মেলাতে পারছিলাম না। স্যারের অধীনে ওই রোগী ভর্তি না থাকা সত্ত্বেও আমরা স্যারকে অনুরোধ করলাম, একবার দেখে দিতে (খুব জটিল অসুখ বুঝলেই আমরা এই 'আপাত অসাধু' কাজটি করতাম, কিছুটা অন্যদের অগোচরেই)। স্যার দেখেই খুব চিন্তিত হয়ে বললেন, ''এটি বোধহয় সাপে কামড়ের রোগী নয়, OVER DIAGNOSIS হয়ে 'MENINGISM' 'DEVELOP' করেছে, AVS এর REACTION এ। তোমরা একটু AVS বন্ধ করে একটু বেশী পেচ্ছাপ করিয়ে AVS টা শরীর হতে বের করে দেখতে পারো। কিন্তু খুব সাবধান, রোগীর মাথার গোঁড়ায় বসে থেকে MONITORING করতে হবে, আর কিছু অসুবিধা বুঝলেই EMERGENCY MANAGEMENT শুরু করে দিতে হবে। আমরা সেইমত ঠিক করলাম, রাত্রি দুটোর সময়, যখন সকলে ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন ওই 'পবিত্র কাজ'টি করবো। তাই হ'ল, রাত্রির মধ্যে 'অচেতন ওয়ার্ডে' আমরা দুই চিকিৎসক পবিত্র কর্মটি সারলাম, প্রায় চার ঘন্টা ধরে। সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাচ্চাটিও সুন্দরভাবে চোখ মেলল। আমরা চুপ থাকলেও বাচ্চার দিদিমা, 'বোমা' ফাটালো। 'কাল রাত্রির্তে এই দুই ডাক্তারবাবুরা চুপচুপি এসে কি স্যালাইন পাল্টে দিল, আর আমার নাতি ভালো হয়ে গেল'' বলাই বাহুল্য, আমরা বাচ্চার আসল ডাক্তারবাবুর কাছে প্রশংসার বদলে তিরস্কারই লাভ করেছিলাম। তবুও মনে মনে আজও কমলেন্দু স্যারকে স্মরণ করে প্রণাম করি, সেই চিকিৎসার জন্য।

অনেক হল চিকিৎসক গুরুর চিকিৎসা নৈপুন্যের কথা। গুরুদেব শিষ্যের উন্নতিতেও খুব আনন্দ পেতেন। ১৯৯৫ সালে আমি তখন অবিভক্ত মেদিনীপুরের এক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক হয়ে এক লরি মালপত্র এবং বই নিয়ে জাঁকিয়ে বসে দেশসেবার, জনগণের স্বাস্থ্য উদ্ধারের বন্যা হইয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে হাজির হয়েছি। বেশ সুনাম হয়ে যাওয়ায় দূর-দুরান্তের রোগী দেখতে দেখতে হঠাৎ কমলেন্দু স্যারের কথা মনে হল। একটি অদ্ভুত দর্শন শিশুকে দেখে। খর্বাকৃতি মোটাসোটা চেহারা, জিভটা মোটা, একটু বেড়িয়ে থাকা, চোখটা নীলাভ। স্যারকে মনে হল, স্যার বলতেন, কিছু বুঝতে না পারলে, আগে ওই অসুখের কোন রোগীর কোন ছবি কোন বইয়ে আছে কিনা দেখবে, ঠিক কিছু না কিছু সূত্র পেয়ে যাবে। পেয়েও গেলাম। শিশু বিষয়ের গীতা, বাইবেল, কোরান নেলসনের বইয়ে। MUCOPOLY SACCARIDOSIS অথবা HURERS' DIEASE। পাঠালাম কলকাতায় স্যারের কাছে। স্যার খুব যত্ন করে দেখে, সবাইকে পড়িয়ে ওঁদেরকে অসুখ সম্পর্কে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমার উচ্চ প্রশংসা করে একটা নিজের হাতে চিঠি লিখে পাঠালেন, ''তোমার জন্যে আমি খুব গর্বিত''; আর ও ভালো লাগছে, ওখানকার লোকজনের কাছে তোমার প্রশংসা শুনে''।

চিকিৎসার বাইরেও এক অসাধারণ মানুষ ছিলেন। স্পষ্ট বক্তা, নির্ভীক, অথচ বিনয়ী। তাঁর এই সমস্ত দুর্লভ গুনের জন্যে তাঁকে বহুবার অন্যায় অবিচার পেতে হয়েছিল। তাতে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। হাসি মুখে কর্তব্য পালন করতেন। এমনকি আউটডোরে সিনিয়র বিশেষজ্ঞের চেয়ারে না বসে রোগীদের পরিজনের সাধারণ চেয়ারগুলিতে বসে চিকিৎসা করতেন ফলে লোকে তাকে 'গুরুত্বহীন ব্যক্তি' বলে ভুল করতো। তিনি বেশ উপভোগ করতেন সেটা। ছিলেন নাট্যকার, সু অভিনেতা, প্রাবন্ধিক, ঔপনাসিক, আরও কি নয়? একটি বিশেষ অসুখের সচেতনা বোঝাতে গিয়ে একটি উপন্যাসই লিখে ফেলেছিলেন, 'স্তব্ধ হও, নিঃশব্দ মৃত্যু!' আমি ছঁবি আঁকি জেনে, একটি প্রচ্ছদ আঁকতে বলেছিলেন, আমি এঁকে দিয়েওছিলাম। স্যারের খুব পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু কলেজ স্ট্রিট পাড়ার 'আভ্যন্তরীণ রাজনীতি'র আবর্তে আমার প্রচ্ছদটি গৃহীত হয়নি। স্যার তাতে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু বইয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আমার নামটি খোদাই করে দিয়েছিলেন। আজ তাঁর প্রয়াণ স্মরণ করে, আমার শ্রদ্ধার্ঘ এই ভাবেই উচ্চারিত হয়। শেষ বয়সে স্যার অভিমানে সকলের আড়ালে গিয়ে, সেই কথাই যেন বলতে চেয়েছিলেন, বলে গিয়েছেনও—''স্তব্ধ হও, নিঃশব্দ মৃত্যু''!!!

ছত্তিশগড়ের দাল্লি রাজাহারায় অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের দাবী আদায়ে নিবেদিতপ্রাণ, 'রূপান্তর' সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ছটি অমূল্য গ্রন্থে ছত্তিশগড়ের কাহিনীকার, ওয়ার্ধা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, বিশিষ্ট মানবাধিকার আন্দোলনের যোদ্ধা এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক ডঃ **ইলিনা সেনের** প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ।

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

['স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' এর পৃষ্ঠপোষক এবং বিশিষ্ট মনরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মৈনাক মুখোপাধ্যায় স্মরণে]

শ্যামল চক্রবর্তী

মৈনাক মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন বর্ধমানে, ১৯৬০ সালে। বাবা শ্রী চিত্ত ভট্টাচার্য, মা শ্রীমতী মৃন্ময়ী ভট্টাচার্য। মা ও বাবা দুজনেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার পরিবেশে বড় করে তুলেছিলেন মৈনাককে। মেধাবী ছাত্র মৈনাক। বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল থেকে একাদশ শ্রেণির শেষ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়তে চলে আসেন কলকাতায়।

কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে পড়তে মৈনাকের বহুমুখী প্রতিভা প্রকাশ পেতে থাকে। ব্যতিক্রমী বাংলা কবিতা লিখতেন। জনপ্রিয় পত্রপত্রিকায় লিখতেন ছোটগল্প ও নানা বিষয়ে নিবন্ধ। আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও আজকাল পত্রিকায় লেখেন ডাক্তারি পড়তে পড়তেই। জড়িয়ে ছিলেন নাটকেও। প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকারের প্রেরণায় ও সহযোগিতায় 'থার্ড থিয়েটার' এর ঘরানায় গড়ে ওঠা 'ন্যাশনাল মেডিক্যালে কলেজ ড্রামা ক্লাব' এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন মৈনাক। কৃষণ চন্দরের 'জামগাছ' অবলম্বনে লেখা গৌতম সেনগুপ্তের 'চাপা পড়া মানুষ' ও নাট্যকার বাদল সরকারের 'মিছিল' নাটকের অভিনয়ে নজর কেড়েছিলেন মৈনাক।

ডাক্তারি পাশ করতে না করতেই জড়িয়ে পড়েন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উৎস মানুষ' পত্রিকায়। এই ব্যতিক্রমী প্রভাবশালী পত্রিকার সঙ্গে মৈনাকের পরিচয় ঘটে ডাক্তার স্মরজিত জানার মাধ্যমে। 'উৎস মানুষ' পত্রিকার গুণগত উৎকর্ষ, প্রচার ও প্রসার বাড়িয়ে তুলতে সম্পাদকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা সময় অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন মৈনাক। পত্রিকায় খুলেছেন নতুন কিছু বিভাগ, যা 'উৎস মানুষ'কে জনপ্রিয় করেছে আরও। খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যের প্রশ্নোত্তর বিভাগ দুটি পত্রিকার মান বাড়িয়েছে।

আশ্চর্য উদ্যম ছিল মৈনাকের চরিত্রে। খিদে লুকিয়ে শুধু চা খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেসে পড়ে থাকা, প্রুফ দেখা, ছাপাখানা থেকে কাঁধে করে পত্রিকা নিয়ে নানা রেলস্টেশনের বইয়ের কাউন্টারে পৌঁছে দেওয়া—'উৎস মানুষ' পত্রিকাকে ঘিরে দীর্ঘকাল মৈনাক ছিলেন এক নিরলস সংস্কৃতিকর্মী ও লেখক। এই পত্রিকাটিকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন মৈনাক, স্বপ্ন দেখাতে জানতেন পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর মৈনাক পেশাগতভাবে প্রবল ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও 'উৎস মানুষ' সম্পাদকের আকস্মিক মৃত্যুর পরে পত্রিকাটিকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। কিছু মানুষের অসহযোগিতায় পারেননি এগোতে। এ নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনেক দুঃখ বয়ে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে।

চরিত্রগতভাবে একদিকে প্রবল উদ্যমী অন্যদিকে চরম বোহেমিয়ান; একদিকে তীব্র শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা অন্যদিকে চরম বিশৃঙ্খলা; গভীর রাত পর্যন্ত জাগা, নিয়ম ভাঙার বেহিসেবি খেলা, মৈনাক অন্য কারো মতো নয়, ছিলেন একান্তই নিজের মত। নিজের সম্পর্কে বলতেন, "Though this be madness there is some method in it!" ঝড়ের পাখি মৈনাকের এই অন্তর্লীন শৃঙ্খলাই ছিল তাঁর বেহিসেবি অথচ কর্মবহুল জীবনের মূল শক্তি। শেষদিকে বর্ধমানে একটি ছোট্ট প্রকাশনা সংস্থা খুলে উদ্যোগী হয়েছিলেন সস্তায় সাধারণ পাঠকের জন্য নানা বিষয়ে বই ছাপতে। প্রকাশিত হয়েছিল মৈনাকের দুটি কবিতার বইও।

জীবন মৈনাককে অনেক দিলেও জীবনকে সেভাবে নিয়ম মানাতে জানতেন না এই চিকিৎসক-লেখক। অনিয়মে মধুমেহ লাগামছাড়া, শরীরে সুতীব্র সাইরেন, তবু একটানা পরিশ্রম করে গেছেন শেষ দিনগুলোতে। জীবন দায় উশুল করে নিতে ছাড়ে নি।

হৃদরোগের আক্রমণ চুপিসারে। সেই রাতেই বর্ধমানের এক হাসপাতালে মৃত্যুর দেশে পা বাড়িয়েছেন মৈনাক মুখোপাধ্যায়। মৈনাকের মৃত্যুতে আজগুবি তাল বেঠিক বেতাল বর্ণময় এক মেধাবী জীবন মিশে গেল অনন্তের বুকে।

ফ্যাসিবাদী লক্ষণ স্পষ্ট

ভারত সহ পৃথিবী জুড়েই অতি দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ইতিহাস যেমন দায়ী, তেমনই অর্থনীতির অসাম্য একটা কারণ। যত বেশি করে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে অল্প কয়েকজনের হাতে, জনসংখ্যার বিরাট বঞ্চিত অংশের মধ্যে জমছে রাগ ও হতাশা। আমেরিকায় ট্রাম্প, ব্রাজিলে বলসোনারো, ভারতের মোদির মত নেতারা তা কাজে লাগাচ্ছেন। শরণার্থী, সংখ্যালঘুদের শত্রু বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। ফ্যাসিবাদী লক্ষণ স্পষ্ট। ফ্যাসিবাদী লক্ষণ আর ফ্যাসিবাদ কিন্তু এক নয়। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র মহাশক্তিধর হয়ে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণও তার হাতে থাকে। ভারতে মোদির কিন্তু সে ক্ষমতা নেই। আমেরিকায় ট্রাম্পেরও নেই।—নোয়াম চামস্কি

প্রধান রচনা

Coronavirus Pandemic

Snigdha Bandopadhyay

The 2019-20 coronavirus pandemic is an ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS CoV 2). The outbreak was identified in Wuhan, China, on November 17, 2019. The World Health Organization declared the outbreak a Public Health Emergency of International Concern on 30 January, and a pandemic on 11 March 2020. As of 22 August 2020, there have been 22,812,491 confirmed cases of COVID-19, including 795,132 deaths worldwide and 29,75701 confirmed cases, including 55,794 deaths in India

Cause

Virology

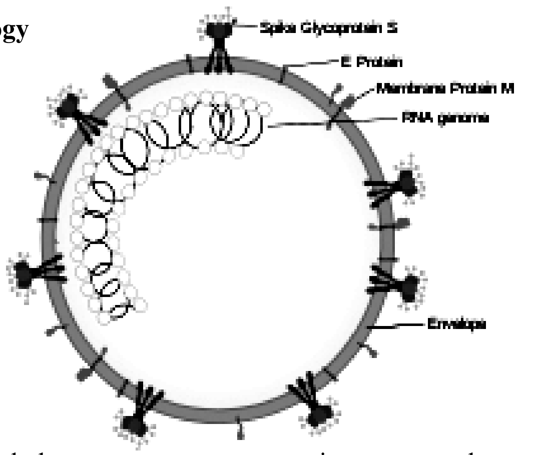

Caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS CoV 2). It is a novel virus.

It is thought to have a zoonotic origin. The genetic makeup of the virus is 96 per cent identical to other bat coronavirus samples and 92 per cent identical to pangolin coronavirus.

Transmission

Respiratory droplets, produced during a sneeze.

As COVID-19 is a new disease, many aspects of how it is spread are under investigation.

The disease is spread during close contact, often by small droplets produced during coughing, sneezing or talking. The droplets cause infection by being inhaled by other people when in close contact (1 to 2 metres, 3 to 6 feet). The droplets are produced during breathing out, however as they are relatively heavy, they usually fall to the ground or surfaces.

After the small droplets fall to floors or surfaces, they can still infect other people who touch the contaminated surface and then touch their eyes, nose or mouth. On surfaces the amount of active virus decreases over time until it can no longer cause infection.

Sputum and saliva carry large amounts of viruses. Some medical procedures may result in the virus being transmitted easier than normal for such small droplets, known as airborne transmission. viz. nebulization in a closed room.

The patient is most contagious during the first three days after onset of symptoms, although spread is known to occur up to two days before symptoms appear (presymptomatic transmission) and in later stages of the disease.

Some people have been infected and recovered without showing symptoms, but uncertainties remain in terms of asymptomatic transmission.

According to European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) one person generally infects two to three others.

Although COVID-19 is not a sexually transmitted infection, kissing and saliva, and faecal oral routes are known to transmit the virus.

Signs and symptoms

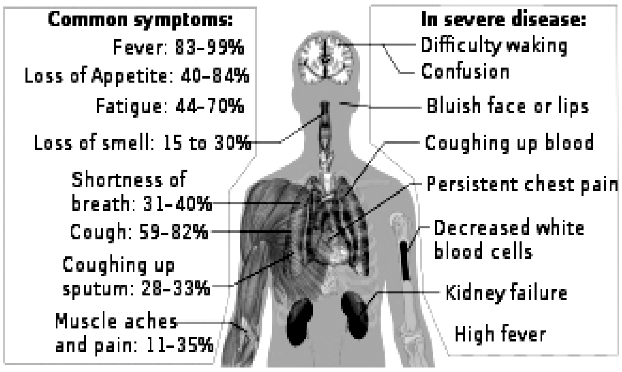

The two most common symptoms are fever (88 per cent) and dry cough (68 per cent). Tiredeness is also a common symptom.

Less common symptoms include fatigue, respiratory sputum production, loss of the sense of smell , shortness of breath, muscle and joint pain, sore throat, headache, chills, vomiting, hemoptysis, diarrhea and a rash on skin, or discolouration of fingers or toes.

The WHO says approximately one person in five becomes seriously ill and has difficulty breathing.

Further development of the disease can lead to potentially fatal complications including pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, septic shock, and kidney failure.

The usual incubation period (the time between infection and symptom onset) ranges from one to 14 days; it is most commonly five days.

Diagnosis

Viral testing

1. The standard test for current infection with SARS-CoV-2 uses RNA testing of respiratory secretions collected using a nasopharyngeal swab. This test uses real-time rRT-PCR which detects presence of viral RNA fragments. Other tests for it are TrueNat, CBNAAT.
2. Rapid Point-of-Care (PoC) Antigen Detection Test.
3. IgG antibody detection test.

Imaging

Characteristic imaging features on chest radiographs and computed tomography (CT) of people who are symptomatic include asymmetric peripheral ground-glass opacities without pleural effusions.

Prevention

Strategies for preventing transmission of the disease include maintaining overall good personal hygiene, washing hands, avoiding touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hands, and coughing or sneezing into a tissue and putting the tissue directly into a waste container.

Use of masks and Physical distancing measures are also recommended to prevent transmission.

Health care providers taking care of someone who may be infected are recommended to use standard precautions, contact precautions, and eye protection.

Many governments have restricted or advised against all non-essential travel to and from countries and areas affected by the outbreak.

A COVID-19 vaccine, is a product which can provide immunity against corona virus infection. As of August 2020, there are 231 vaccine candidates in development phase.

Hand washing

CDC recommends that people should wash hands often with soap and water for at least twenty seconds, or using a hand sanitiser with at least 60 per cent

alcohol when soap and water are not readily available.The WHO advises people to avoid touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hands.

Surface cleaning

Surfaces may be decontaminated with a number of solutions like 62-71% ethanol, 50-100% isopropanol, 0.1 % sodium hypochlorite, 0.5 % hydrogen peroxide, and 0.2-7.5 % povidone-iodine.

The CDC recommends that if a COVID case is suspected or confirmed at a facility such as an office or day care, all areas such as offices, bathrooms, common areas, shared electronic equipment like tablets, touch screens, keyboards, remote controls, and ATM machines used by the ill persons, should be disinfected.

Face masks and respiratory hygiene

Health organisations recommended that people cover the mouth and nose with a bent elbow or a tissue when coughing or sneezing, and disposing of any tissue immediately.

Medical masks are recommended for Corona virus cases and those taking care of those cases. N95 mask, PPE, Gloves, Shoe covers etc. are recommended for frontline health workers.

Use of fabric mask or a medical mask is recommended for public to limit the spread of the virus.

Social distancing

Social distancing (also known as physical distancing) includes infection control actions intended to slow the spread of disease by minimising close contact between individuals.

Methods include quarantines; travel restrictions; and the closing of schools, workplaces, stadiums, theatres, or shopping centres. Individuals may apply social distancing methods by staying at home, limiting travel, avoiding crowded areas, using no-contact greetings, and physically distancing themselves from others. Video conferencing is an alternative method.

Older adults and those with underlying medical conditions are at increased risk of serious illness and complications and have been advised by the CDC to stay home as much as possible in areas of community outbreak.

Since the droplets cause infection by being inhaled by other people when in close contact (1 to 2 metres, 3 to 6 feet) , a distance of 2m or 6ft need to be maintained between people when outside home.

Self-isolation

Self-isolation at home has been recommended for those diagnosed with COVID-19 and those who suspect they have been infected.

Those who may have been exposed to someone with COVID-19 and those who have recently travelled to a country or region with widespread transmission have been advised to self-quarantine for 14 days from the time of last possible exposure. Home isolation/ Staying in Self Homes are recommended for mild to moderate symtomatic cases and admision in COVID Hospitals are recommended for seriously symptomatic cases.

Management

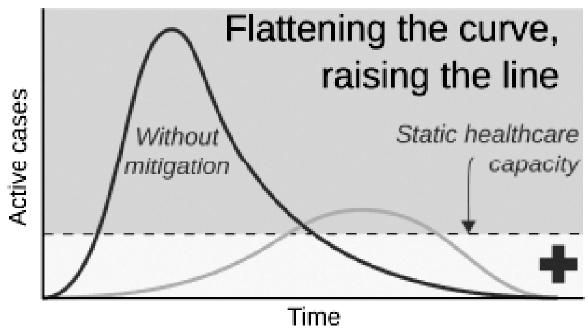

Strategies in the control of an outbreak are containment and mitigation.

Containment is undertaken in the early stages of the outbreak and aims to trace and isolate those infected as well as introduce other measures of infection control and vaccinations to stop the disease from spreading to the rest of the population.

When it is no longer possible to contain the spread of the disease, efforts then move to the **mitigation** stage: measures are taken to slow the spread and mitigate its effects on the healthcare system and society.

A combination of both containment and mitigation measures may be undertaken at the same time.

Suppression requires more extreme measures so

as to reverse the pandemic by reducing the basic reproduction number to less than 1.

Part of managing an infectious disease outbreak is trying to delay and decrease the epidemic peak, known as flattening the epidemic curve. This decreases the risk of health services being overwhelmed and provides more time for vaccines and treatments to be developed.

Non-pharmaceutical interventions - personal preventive measures, such as hand hygiene, wearing face masks, self-quarantine; community measures aimed at physical distancing such as closing schools and cancelling mass gathering events; community engagement to encourage acceptance and participation in such interventions; as well as environmental measures such surface cleaning.

More drastic actions aimed at containing the outbreak quarantining entire cities (lock down) and imposing strict travel bans, mass screening and localised quarantines, and issuing alerts on the movements of infected individuals, providing financial support for those infected who quarantined themselves and imposing large fines for those who failed to do so. Increasing face mask production and penalising for hoarding of medical supplies to be done.

Long-term intervention to suppress the pandemic has considerable social and economic costs.

Contact tracing

Contact tracing is to determine the source of an infection and to prevent further transmission. The use of location data from mobile phones by governments for this purpose has however prompted privacy concerns.

Various mobile apps have been implemented or proposed for voluntary use.

Health care

Increasing capacity and adapting healthcare for the needs of COVID-19 patients is described by the WHO as a fundamental outbreak response measure. The ECDC and the European regional office of the WHO have issued guidelines for hospitals and primary healthcare services for shifting of resources at multiple levels, including focusing laboratory services towards COVID-19 testing, cancelling elective procedures whenever possible, separating and isolating COVID-19 positive patients, and increasing intensive care capabilities by training personnel and increasing the number of available ventilators and beds.

Treatment

There are no specific antiviral medications approved for COVID-19, but developmental efforts are underway. Symptomatic and supportive treatment to be done. Depending on the severity, oxygen therapy, intravenous fluids, and breathing support may be required. Several compounds which were previously approved for treatment of other microbial diseases are being investigated for use in treating COVID-19.

Social impact of COVID19 pandemic

The pandemic has caused severe global socioeconomic disruption, including the largest global recession since the Great Depression. It has led to the postponement or cancellation of sporting, religious, political and cultural events, widespread supply shortages exacerbated by panic buying, and decreased emissions of pollutants and greenhouse gases. Schools, universities and colleges have closed either on a nationwide or local basis. Misinformation about the virus has spread online, and there have been incidents of xenophobia and discrimination against Chinese people and against those perceived as being Chinese, or as being from areas with high infection rates. Moreover doctors and health care workers are also ostracised as they are in contact with corona virus infected patients.

Countries who controlled COVID19 pandemic successfully

South Korea

South Korea declared the highest level of alert on 23 February 2020. All South Korean military bases were quarantined. Airline schedules were also changed.
South Korea introduced what was considered the largest and best-organised programme in the world to screen large number of population for the virus, isolate any infected people, and trace and quarantine those who contacted them. Screening methods included mandatory self-reporting of symptoms by new international arrivals through mobile application drive - through testing for the virus with the results available the next day. South Korea's programme is considered a success in controlling the outbreak without quarantining entire cities.

Vietnam

Vietnam's success story is related to its 3 pronged approach of (1) Temperature screening and testing, (2) targeted lockdown and quarantine and (3) constant communication with the citizens.

Australia
Gradual shutdowns and enforcing numerous social distancing measures, finding the travellers and controlling their spread of the virus were some of the measures taken to contain the epidemic. Gatherings were limited to two people unless it is a close family matter. Communication through Coronavirus Health Information Hotline and other digital ways of communication also played an important role

New Zealand.
Strict long period of lockdown.

Singapore
Government of Singapore has implemented the so called circuit breaker measures which was a stay-at-home order in response to the COVID-19 pandemic in the country.

Taiwan
Since the SARS pandemic in 2003 Taiwan had a strong plan of containing pandemic and that worked for COVID pandemic as well. Quarantines, contact tracing, wide availability of masks, communication, digital health system and community mindedness helped to beat CORONA Virus

Japan
Handwashing, mouthwash with disinfectant and using face mask were a part of daily life of the Japanese people and this helped them to fight the menace well.

Denmark
Rapid response from the government, trust and a high level of confidence in government by Danish citizens, and the importance of social heritage contributed to the effective management of the coronavirus crisis. Responses include social distancing, lockdown for the entire population and screening of at-risk individuals. Primary care physicians played a major role to screen and send patients to the hospital. A very efficient health care system was the backbone of Denmark's success.

ডাবের জলের উপকারিতা

গরমের মধ্যে এক গ্লাস ডাবের জলের থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এছাড়াও ডাবের জলের বেশ কিছু উপকারিতা আছে।

অনেকেই জানেন না অম্বল হলে ডাবের জল খুব তাড়াতাড়ি উপশম দেয়। অম্বল তো সারবেই তার সঙ্গে বুক জ্বালা থেকেও সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাবেন।

নিয়মিত ডাবের জল পান করলে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডাবের জল খেলে রক্ত চলাচল ঠিক থাকবে এবং তার ফলে রক্তচাপ কম হবে। এবং আপনার হার্টও ভালো থাকবে। নিয়মিত ডাবের জল খেলে রক্তে চিনির মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

আপনি যদি শরীরের ওজন কমানোর কথা ভাবেন তাহলে আপনার ডায়েটে অবশ্যই ডাবের জল রাখবেন। এতে ফ্যাটের মাত্রা খুব কম থাকে। এবং পেট ভরিয়ে রাখে অনেকক্ষণ। তার ফলে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা হবে না আপনার।

ডাবের জলে অনেক রকমের নিউট্রিয়েন্টস এবং ভিটামিনস আছে। অ্যান্টি ভাইরাল এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গুনাবলীও আছে এতে। এর ফলে আপনার ইমিউন সিস্টেম এর উন্নতি ঘটবে। ফ্লু-এর মতো ভাইরাল ইনফেকশনের প্রকোপও কমিয়ে দেবে।

ডাক্তাররা অনেক সময় গর্ভবতী মহিলাদের ডাবের জল খাওয়ার মতামত দেন। কারণ নিয়মিত ডাবের জল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় আর বদহজমও ঠিক হয়ে যায়।

ডাবের জলে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের মত মিনারেল থাকায় যাঁরা কিডনির অসুখে ভুগছেন তাঁদের জন্য উপকারী। ডাবের জল Diuretic-এর কাজ করে ফলে মুত্রত্যাগের পরিমাণ বেড়ে যায়।

আপনার ত্বকের জন্যেই খুব উপকারী ডাবের জল। ব্রণ বা অ্যাকনে হলে তার ওপর ডাবের জল লাগালে সত্বর ফল পাবেন। হাত এবং নখের জন্যেও ডাবের জল ব্যবহার করতে পারেন।—**সংকলন : স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিশেষ রচনা

নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়ে বিপর্যস্ত দেশ

সোমনাথ গুহ

'নাগরিকত্ব সংশোধনি আইন' (সিএএ) এর যে প্রাথমিক রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে যে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ অবধি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিশ্চান ধর্মের যে সব মানুষ ভারতে এসেছেন তাঁদের অবৈধ অভিবাসী হিসাবে গণ্য করা হবে না। আইনের এই রূপরেখার সাথে একটি 'স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস এন্ড রিজনস' প্রকাশিত হয়েছে যাতে 'ধর্মীয় নিপীড়ন' এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মূল আইনে এই শব্দবন্ধের কোন উল্লেখ নেই। প্রথমেই যেটা লক্ষণীয় যে এই আইন প্রণয়নের (১১ই ডিসেম্বর, ২০১৯) পর কয়েক মাসের ওপর সময় অতিক্রান্ত কিন্তু এখনো আইনের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায় সিএএ বাস্তবে কী ভাবে চালু করা হবে তা সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাঁরাও বিভ্রান্ত। ইতিমধ্যেই যা বহুচর্চিত ও বিতর্কিত তা হচ্ছে মুসলিম ধর্মাবলম্বি মানুষদের এই তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এটা সংবিধানের আর্টিকেল ১৪ লঙ্ঘন করে। এই ধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে যে কোন ব্যক্তির সমান অধিকার এবং আইন দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হবার অধিকার রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। 'যে কোন ব্যক্তি' কথাটি লক্ষণীয়। এর অর্থ আমাদের দেশের সীমানার মধ্যে 'যে কোন ব্যক্তি' বৈধ হোক বা অবৈধ, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সংবিধানের ধারা ১৪ দ্বারা সমান ভাবে রক্ষিত। তাই মুসলিমদের এই আইনের অন্তর্ভুক্ত না করা অসাংবিধানিক। এই আইন চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক।

আইনে তৃতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে এই ছটি ধর্মের যে মানুষরা আসছেন তাঁরা শুধুমাত্র 'অবৈধ অভিবাসী' হিসাবে গণ্য হবেন না, তাঁরা কিন্তু সরাসরি নাগরিকত্ব পাচ্ছেন না; তাঁদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। ধরা যাক একজন হিন্দু মানুষ ২০১০ সালে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। সীমান্তবর্তি কোন ছোট শহরে বাড়ি ভাড়া করে তিনি একটা ব্যবসা শুরু করেছেন। প্রভাবশালী কাউকে ধরে নথিপত্র জোগাড় করেছেন। ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে। মোটামুটি থিতু হয়ে বসে তিনি একটা স্থায়ী জীবন শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নতুন আইন দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি সিএএর মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করলেন। এটা করা মাত্র যে মানুষটি স্থায়ী জীবন শুরু করেছিলেন তিনি কিন্তু নিজেকে অবৈধ ঘোষণা করলেন, নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে ফেললেন। কারণ এটা পরিষ্কার অমিত শাহ যতই মৌখিক আশ্বাস দিক, আবেদন করলেই নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে এমনটা আদৌ নয়। এখন বলা হচ্ছে এই তিনটি দেশ থেকে আসা ছটি ধর্মের নাগরিকদের অন্তত তিনটি নথি পেশ করতে হবে : (১) তাঁর ধর্মের প্রমাণ, (২) তিনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে এসেছেন সেটার প্রমাণ, (৩) তিনি ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯এ কিংবা তার আগে ভারতে এসেছেন সেটার প্রমাণ। এর সঙ্গে যদি মূল আইনে ধর্মীয় নিপীড়নের শর্ত যোগ হয়, তাহলে প্রত্যেক উদ্বাস্তু/শরণার্থীকে তিনি যে ধর্মের কারণে নিগৃহীত হয়েছেন এবং সেই দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন সেটা প্রমাণ করতে হবে। যিনি ধর্মের কারণে অত্যাচারিত হয়ে পালিয়ে এসেছেন তিনি কীভাবে সেটা প্রমাণ করবেন? তাঁকে কি আদৌ ঐ দেশের কেউ লিখে দেবেন যে তিনি ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার? এই শর্ত যদি মূল আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে অধিকাংশ অভিবাসীই ধর্মীয় নিপীড়নের কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন না।

এবার দেখা যাক ধর্মের প্রমাণপত্র আদৌ পেশ করা সম্ভব কি না। আমাদের দেশে নিজেদের তিনটি প্রধান ডকুমেন্ট হচ্ছে ভোটার, আধার, প্যান কার্ড। পাশপোর্ট সচ্ছল লোকের ডকুমেন্ট বা দেশের মাত্র সাড়ে ছয় কোটি মানুষের আছে। এই নথিগুলির মধ্যে কোনটাতেই ধর্মের উল্লেখ নেই। ব্যাংকের পাসবুকেও ধর্মের উল্লেখ থাকে না। পাসপোর্টেও জাতির (Nationality) উল্লেখ থাকে, ধর্মের নয়। ঐ তিনটি দেশের কোন নথিতে কি ধর্মের উল্লেখ থাকে, যদি না থাকে তাহলে একজন অভিবাসী কীভাবে নিজের ধর্মের পরিচয় দেবেন? এটা সহজেই বোধগম্য যে মুসলিমরা যাতে হিন্দু নাম নিয়ে সিএএর সুযোগ নিতে না পারে তাই জন্যই ধর্মের প্রমাণপত্র পেশ করা আবশ্যিক করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নথি পেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও ধর্মের প্রমাণপত্র না থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ আবেদন করতে দ্বিধা করবেন। আর যাঁরা আবেদন করলেন অথচ তাঁদের আবেদনপত্র নাকচ হয়ে গেল, তাঁদের কি হবে? তাঁদের একূল ওকূল দুটোই গেল। নিশ্চিত জীবন ছেড়ে তাঁরা নিজেদের অবৈধ ঘোষণা করলেন, আবার নাগরিকত্বও পেলেন না। অমিত শাহ বলেছেন আগে সিএএ চালু হবে তার পরে 'জাতীয় নাগরিকপঞ্জি' (এনআরসি)র কাজ শুরু হবে। আবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছেন এনআরসি নিয়ে নাকি এখনো কোন চিন্তাভাবনাই হয়নি। এঁরা নানা স্বরে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। যেটা বাস্তব সেটা হচ্ছে মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বি কোন মানুষের নাম এনআরসিতে বাদ পড়লে তিনি আবার সিএএর মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেটা অবশ্যই দীর্ঘ দিন এই দেশে জন্মগ্রহণ, বসবাস, চাকরিবাকরি করা, একের পর এক নির্বাচনে ভোট দেওয়া একজন মানুষের পক্ষে মানসিকভাবে ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক। কিন্তু তবুও তাঁর

কাছে সিএএর মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ থাকছে। কিন্তু একজন মুসলিমের নাম বাদ পড়ে গেলে তাঁর আর কোন দ্বিতীয় সুযোগ নেই। তাঁকে 'বিদেশি ট্রাইবুনাল' এ যেতে হবে, সেখানেও সুরাহা না হলে তাঁর স্থান হবে ডিটেনশন ক্যাম্পে। বিজেপি বলছে সিএএ মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিচ্ছে না। প্রত্যক্ষ ভাবে নিচ্ছে না, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে নিচ্ছে। বাকি ছটি ধর্মের মানুষ সিএএর সুযোগ পেয়ে যাওয়াতে এনআরসি বাস্তবে শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতি মুসলিম হয়ে দাঁড়াচ্ছেন একজন 'সন্দেহভাজন' নাগরিক, যার মাথার ওপর সিএএ-এনআরসির খাঁড়া চিরকাল ঝুলে থাকবে। বিজেপি হিন্দু ও বাকি পাঁচ ধর্মের শরণার্থী/উদ্বাস্তুদের ত্রাতা সাজার চেষ্টা করছে। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত তিনটি নথি পেশ করতে পারবেন না, তাঁদের কি হবে? তাই কাগজ দেখানর নাম করে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হোক।

সিএএ-এনআরসি-এনপিআর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে হতদরিদ্র, গরিব মানুষের। অসমে খসড়া এনআরসিতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছিল। 'রাইটস এন্ড রিস্কস এন্যালাইসিস গ্রুপ' এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে জাতীয় নাগরিকপঞ্জিতে নাম তোলার জন্য জনপ্রতি মানুষের খরচা হয়েছে ১৯০৬৫/- টাকা। যার অর্থ শুধু খসড়া প্রস্তুত করতেই সাধারণ মানুষের ৭৮৩৬ কোটি টাকা খরচা হয়েছে। ২০১৮ সালে অসমের জনপ্রতি আয় ছিল ৬৭৬২০/- টাকা, এর থেকে ১৯০৬৫/- টাকা কমে গেলে আয় হয়ে দাঁড়ায় ৪৮৫৫৫/- টাকা। সমীক্ষা বলছে এঁদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ দরিদ্রসীমার বহু নীচে বসবাস করেন। তাঁরা জমি বন্ধক রেখে, গবাদি পশু বিক্রি করে, কৃষিজাত সম্পদ, গরুর গাড়ি, রিকশা, অটো বিক্রি করে এই পয়সা যোগাড় করেছেন। অনেকে মহাজনের থেকে ঋণ নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেককেই নিজের এলাকা থেকে বহু দূরে শুনানিতে উপস্থিত থাকতে হয়েছে এবং সেটা শুধুমাত্র একবার নয় বেশ কয়েক বার। যাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে তাঁকে সাক্ষী হিসাবে পরিবারের যে সব সদস্যের নাম তালিকায় আছে তাঁদের নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত হতে হয়েছে। এর ফলে খরচ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। বহু মানুষ দেউলিয়া হয়ে গেছেন। তাঁরা এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর তাঁরা আর 'বিদেশি ট্রাইবুনাল'এ আবেদন করতে পারেননি। ট্রাইবুনালে আবেদন করতে হলে উকিলকে এক দেড় লাখ টাকা ফি দিতে হয়। এত টাকা তাঁরা পাবেন কোথা থেকে? এর ফলে অসমে অন্তত ষাট জন মানুষ আত্মহত্যা করেছেন।

আমাদের দেশে লিখিত নথিপত্র রাখা, সংগ্রহ ও রক্ষা করার ব্যাপারে পরম্পরাগত ভাবে একটা অনীহা আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে মধ্যযুগের আগে আমাদের দেশে ইতিহাস লিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। প্রচলিত নথিপত্রের মধ্যে জমির বা বাস্তুভিটের দলিল সংরক্ষিত করা চালু ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষেরই জমি নেই, সুতরাং জমির দলিল থাকারও কোন প্রশ্ন আসে না। ছত্তিসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী তো স্বীকার করেছেন তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের জমি নেই, তাই তাঁরা কোন দলিল দেখাতে পারবেন না। জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করার আইন সবে ১৯৬৯ সালের। তার আগে রাষ্ট্র কি আদৌ কারো কাছে জন্ম সার্টিফিকেট চাইতে পারে? এই আইন থাকা সত্ত্বেও ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে মোটে ৫৮% জন্ম নথিভুক্ত হয়। এর অর্থ বেশির ভাগ মানুষের কাছে জন্মের তারিখ, স্থান সংক্রান্ত কোন কাগজ নেই। রেশন কার্ড ছিল কিন্তু তা মূলত সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের জন্য, পরিচয়পত্র হিসাবে সেটার খুব একটা গরিমা ছিল না। অসম আন্দোলনের কারণে 'বিদেশি', 'অনুপ্রবেশকারী' শব্দগুলির সাথে আমরা পরিচিত হয়ে উঠি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে কাকে আমরা বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী বলব। এই বাতাবরণে দেশে ভোটার কার্ড চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্যান কার্ড, সর্বসাধারণের জন্য চালু হয় ১৯৯৮ সালে। শুধু করদাতাদের জন্য প্যান চালু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। আধার তো শুরু হল এই সেদিন, ২০০৯ সালে। দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ভোটার কার্ড তাই চালু হয়েছিল মোটে ২৭ বছর আগে। এর অর্থ দেশের মানুষের নাম নথিভুক্ত করতে রাষ্ট্রেরই কোন আগ্রহ ছিল না। রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত গাফিলতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে কোন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। যখন মানুষ বুঝতে পারল যে নিদেন পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য একটা ভোটার কার্ড দরকার তখন তাঁরা লাইন দিলেন। যখন তাঁদের বলা হল ব্যাঙ্কে খাতা খুলতে আধার লাগবে, সরকারি প্রকল্পের ভর্তুকি পেতে আধার লাগবে, তখন তাঁরা আধার করানর জন্য লাইন দিলেন। যখন তাঁদের বলা হল ব্যাংকে থেকে বেশি টাকা তুলতে গেলে প্যান লাগবে, তখন তাঁরা প্যান করানর জন্য লাইন দিলেন। প্রতিটি কার্ড করতে দিনের পর দিন নষ্ট হয়েছে, কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে, আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তারপর যখন কার্ড পাওয়া গেল, দেখা গেল তা ভুলে ভরা। ভুল সংশোধন করতে আবার ছোটো বিভিন্ন অফিসে। শুধুমাত্র ভোটার কার্ড সংশোধনের জন্য আমাদের রাজ্যে ৮০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এমন একটি আধার কার্ড কেউ দেখাতে পারবে না যাতে কোন ভুল নেই। আধার সংশোধনের জন্য চতুর্দিকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। মানুষ রাত জেগে লাইন দিচ্ছে, সংশোধনী কেন্দ্রগুলো ফর্ম দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস্তাধস্তি, মারামারি হয়েছে। এতেও রক্ষা নেই। এরপর আছে আধারের সাথে ব্যাংকের খাতা লিংক করা, আধারের সাথে মোবাইল নম্বর, ভোটার, প্যান লিংক করা, প্যান নম্বর ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি। মানুষ দিশেহারা। এমনিতেই রুটিরুজি জোগাড় করতে নাভিশ্বাস উঠছে, তার ওপর এই কাগজপত্র যোগাড় করতে গিয়ে চূড়ান্ত হয়রান। ভিটেমাটি খোয়ার আশঙ্কায় পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যেই তিনজন আত্মহত্যা করেছেন।

সিএএ-এনআরসি-এনপিআর এই ত্রিফলার আক্রমণে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত।

এরপর প্রশ্ন আসে যে দেশের জনসংখ্যা ১৩০ কোটি, সেখানে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি করার মতো পরিকাঠামো, দক্ষ কর্মী কি আদৌ আমাদের আছে। অসমের জনসংখ্যা তিন কোটি তিরিশ লক্ষ। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অসমে এনআরসি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া চালু হয়। ছয় বছর বাদে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৯এ চূড়ান্ত তালিকা সম্পন্ন হয়। এই দক্ষযজ্ঞে ৬০০০০ কর্মী শামিল করা হয়, ১৬০০ কোটি টাকা খরচা হয়। অসমের বিজেপির নেতারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন এই তালিকা ভুলে ভরা। এমনকি এই তালিকা বাতিল করে নতুন করে নাগরিকপঞ্জি তৈরি করার তাঁরা দাবী করেছেন। মনে রাখতে হবে এই ধরনের একটি তালিকায় ভুল কোন মামুলি ভুল হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটি ভুলের ওপর মানুষের ভিটেমাটি, জীবনমরণ নির্ভর করছে। করণিকের এক 'নিছক' ভুলের জন্য কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসকারী একজনকে হয়তো ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। তাই এই ধরনের কাজের জন্য দক্ষ, দায়িত্বসম্পন্ন এক বিপুল কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন। এই কাজটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এই ধরনের কর্মীবাহিনী আমাদের দেশে নেই। আর অসমেই যখন ছয় বছর লেগে গেছে, ১৩০ কোটি মানুষের জন্য এনআরসি করতে কি বিপুল সময় লাগবে তা পাঠক নিজেই ভেবে নিতে পারে। অসমে যতজন কর্মীর প্রয়োজন হয়েছে, যে পরিমাণ অর্থ খরচা হয়েছে তার নিরিখে পুরো দেশে তা কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই শুধুমাত্র লজিস্টিকসের কারণেই সিএএ-এনআরসি একটা অসম্ভব, অবাস্তব চিন্তা।

এই দানবীয় আইনের কারণে মানুষ আজ বিপন্ন বোধ করছেন। অসমের অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ, যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী, কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী বাঙালির নাম সমস্ত নথি ঠিক থাকা সত্ত্বেও মূল তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। তাই কেউই স্বস্তিতে নেই। এটা এক অভূর্তপূর্ব পরিস্থিতি যা স্বাধীনতার পরে দেখা যায়নি। নিস্পৃহ, শান্তিকামী মানুষও অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মী মানুষ ও শিক্ষিত সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ এই আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। নানা অভিনব পন্থায় মিছিল, সমাবেশ সংগঠিত হয়েছে। এই আইন প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। চতুর্দিকে দাবী তুলতে হবে মুসলিম সহ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিঃশর্ত ভাবে নাগরিকত্ব দিতে হবে।

লুইতের দেশে খিলঞ্জীয়া নিজভূমে পরবাসী

অমিতাভ সেনগুপ্ত

লুইত—বিশাল বিস্তারিত তার বক্ষ, গভীর গোপন তরঙ্গ, অকুল দরিয়া; জয় করতে ব্যর্থ হল মোগল বাহিনী সরাইঘাটের যুদ্ধে দুঃসাহসী সেনাপতি লাচিত ফুকুনের কাছে। বিস্তীর্ণ দু'পারে অসংখ্য জনজাতির সমন্বয় তরঙ্গায়িত। এক ব্র্যাকেটে অসমীয়া---বড়ো, ডিমাশা, রাভা, কোচ-রাজবংশী, কার্বি, মটক, অহোম, মিশিং আর আছে চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিক। এইসব নিয়েই অসমের খিলঞ্জীয়া [indigenous people] জনগণ।

অসমের এই খিলঞ্জীয়া (ঐতিহ্যগত ধারাবাহিক মূলনিবাসী) জনগণ ঔপনিবেশিক আমল থেকে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, পদানত শাসনাধীন। ড. হীরেন গোহাঁইর ব্যাখ্যায়, ''পুঁজিবাদের প্রথম পর্বেই বিদেশী বা বহিরাগতদের কর্তৃত্ব অসমে এসে অসমের মাটি, উদ্ভিদ জগৎ, জলসম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির শোষণ আর ব্যবহার করে কিছু সম্পদ সৃষ্টি করেছে, কিছু নতুন জীবিকা প্রবর্তন করেছে। কিন্তু সাথে সাথে ব্যাপক হারে সে ভূমিপুত্র সকলকে ক্রমে সবরকম প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে মাটি থেকে উচ্ছেদ বা বঞ্চিত করেছে। প্রচলিত সাংবিধানিক ব্যবস্থাদির মাঝে তার প্রতিকার সম্ভব না হওয়াতে ভূমিজ জনগণ সব জনগোষ্ঠী নিয়ে গণ-আন্দোলনে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে।"

'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন' নিয়ে আজ সারা ভারতের প্রবল প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। এই আইনের বহুদূর বিস্তৃত দুরভিসন্ধি আছে। যে সঙ্কীর্ণতা ও একনায়কত্বর ভাইরাস এর অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে তা ভবিষ্যতে জাতির মারণ রোগ নিয়ে আসবে। এই আইনের সূত্র ধরে আর এন.পি.আর.---[National Population Register—আহা! গালভরা নাম], এন.আর.সি. এবং নানা ধারা উপধারায় দেশবাসীর এক বৃহৎ শতাংশকে (হয়ত ত্রিশ শতাংশ—ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, বিশেষত শিক্ষায় ও আর্থিক অবস্থায় পিছিয়ে পড়া সমাজের নাগরিকদের) অ-নাগরিক বানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। বি.জে.পি. তথা আর.এস.এস. ধরে নিয়েছে বা টার্গেট করেছে তারাই ভবিষ্যতের চিরন্তন শাসক, তা হলে শাসক হিসাবে ভারতীয় জনগণের এক বৃহৎ শতাংশকে অ-নাগরিক বানিয়ে দিয়ে তাদের সবরকম সরকারী সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে দিয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল ব্যক্তি মালিকানার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জোর বাড়ছে। সরকারী শিক্ষা ক্ষেত্র, বিশ্ববিদ্যালয় সংকুচিত হচ্ছে। যেমন আই.আই.টি.গুলোতে (খড়্গপুর, কানপুর, রুরকি ইত্যাদি) সরকারি আর্থিক অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছে। ফলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের পর কেন্দ্রীয় জয়েন্টে যোগ্যতা উত্তীর্ণ হলে ছাত্রদের প্রবেশের জন্য আগে যেখানে

৩৮,০০০ টাকা ফি'জ দিতে হত তা' বেড়ে হয়েছে দেড় লাখ টাকা। তারপর সমস্ত কোর্স জুড়ে সেমিস্টার ভিত্তিতে বর্ধিত খরচ। এর ফলে স্বল্প আয়ের পরিবারের কৃতী ছাত্ররাও উচ্চশিক্ষা থেকে অপসারিত হচ্ছে। গবেষকরাও নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের সক্রিয় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা যায় অসম থেকে। ২০১৬তে ১৫ই জুলাই লোকসভায় নাগরিকত্ব আইন সংশোধন বিল [CAB] পেশ হয়। তখনই অসমের লেখক, অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিক, আইনজীবী সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করেন। তাদের স্বাক্ষরিত 'মেমোরান্ডাম অন্ সিটিজেনশিপ এ্যাক্ট' অসমের রাজ্যপালকে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৬তে দেওয়া হয়। সেই মেমোরান্ডামে উল্লেখ করা হয়—

"the proposed amendment that will grant citizenship to millions of Hindu migrants and refugees who have entered Assam from Bangladesh in recent decades, have filled the indigenous communities of Assam with grave disquiet and alarm, as it might reduce them to minorities in the state where they have evolved over centuries of history into their present cultures and identities.

The amendment on the face of it seems to offend against the secular character of the Constitution of India and its very idea of citizenship which is not based on religion."

এই মেমোরান্ডামে স্বাক্ষর করেন নর্থ-ইস্টার্ন হিল য়ুনিভার্সিটির প্রাক্তন প্রফেসর ড. মনোরমা বরুয়া, প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক হায়দার হুসেন, কটন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ উদয়াদিত্য ভরালি, অসমের প্রাক্তন মুখ্য-সচিব হরেন্দ্র নাথ দাস, ড. হীরেন গোহাঁই প্রমুখ। কিন্তু এতে বিজেপির রাজ্য প্রশাসনের কোন হেলদোল হয়নি। অতঃপর ২০১৭'র ৩০শে ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে (রাষ্ট্রপতির সচিব সঞ্জয় কোঠারির মাধ্যমে) একটি প্রতিবেদন পাঠান হয়, যার বিষয় : "Conforment of Citizenship on Bangladeshi Hindus and consequences for Assam."

এই প্রতিবেদনে বলা হয় : We, the following concerned citizens of Assam, assembled on 28th December 2017 in Guwahati in a large public meeting with representations from numerous social and political organisations feel compelled to address this public petition to you as the head of the state and custodian of our sacred constitution.

...the proposed Amendment Bill 2016 of Indian Citizenship Act 1955 designed to confer Indian Citizenship on millions of Bangladeshi Hindus, unacceptably large numbers of who have come over the border illegally and settled in Assam.

...Assam is home to endangered langauge and cultures that have since colonial times been under onerus and unjust pressure, and if the enormus new burden is suddenly imposed on us, they may suffer an eclipse.

We, therefore humbly pray that as the custodian of the constitution and its values, your Excellency will refuse to endorse such arbitrary, anti-people, undemocratic legislative steps...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপি নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পাশ করল। অসমের জনগণের কোন প্রতিবাদকে গ্রাহ্য করল না। লোকসভার ''হিংস্র গরিষ্ঠাতা" দিয়েই সব দাবিয়ে রাখার লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি। এই সংশোধনের বিরুদ্ধে অসমে আন্দোলনে সব প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাবিদরা, বিভিন্ন বামপন্থী গণতান্ত্রিক দল—সি.পি.আই., সি.পি.এম., সি.পি.আই.(এম.এল.) লিবারেশন, ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, জনতা দল (এস.), বড়ো স্টুডেন্টস য়ুনিয়ন, ট্রাইবল সংঘ, তাই অহোম যুব পরিষদ, হিল স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল ইত্যাদি অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ফলে এই আন্দোলন 'বাঙালী খেদা' আন্দোলনে পর্যবসিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৫তে ভারত সরকার স্বাক্ষরিত অসম চুক্তির ৫:৩ দফা (clause) অনুযায়ী "০১.০১.১৯৬৬-র পর থেকে ১৯৭১-র ২৪শে মার্চ পর্যন্ত (দিনটি অন্তর্ভুক্ত করে) অসমে আসা বিদেশী সকলকে ১৯৪৬র বিদেশী আইন আর ১৯৬৪'র বিদেশী (ট্রাইবুনেল) আদেশের ব্যবস্থা অনুসারে শনাক্ত করা হবে।" অর্থাৎ ওই সময়রেখা পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীরা ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসাবে গণ্য হবে। এবং তারপরেও যারা এসেছে তাদের বিতাড়নের দাবি উঠছে না। নাগরিকত্ব সংশোধিত আইনে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বা তারপরেও অসমে আসা হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব মর্যাদা দেওয়া যাবে না।

অখিল গগৈর নেতৃত্বে গঠিত সদৌ অসম কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি অসম জুড়ে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়। বিজেপি তথা আর.এস.এস. এই আন্দোলনকে 'বঙাল খেদা' এবং হিন্দু বিরোধী আন্দোলন বলে অপপ্রচার করে আন্দোলনকে প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিগত বছরের অক্টোবরে মাজুলিতে (যা শ্রীমন্ত শংকরদেবের সঙ্কীর্ণ জাতপাতের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী প্রচারিত ধর্মমতের কর্মকেন্দ্র) অনুষ্ঠিত বিজেপি'র (যার মূলে নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠক আর.এস.এস.) রাজ্য কার্য নির্বাহক বৈঠকে আর.এস.এস. সদস্য তথা বিজেপি'র তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁই বলেছিলেন যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন না হলে বিজেপি'র পক্ষে ভোট কমবে। অসমিয়া প্রতিদিন পত্রিকায় ১৩, অক্টোবর ২০১৮'য় সংবাদ শিরোনাম আসে—''সরকারের ছত্রছায়াতে বাঙালী সংগঠনের রণধ্বনি", সংবাদ প্রকাশিত হয় যে বিজেপি'র রাজ্য কার্যনির্বাহক কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে হিন্দু বাংলাদেশীদের সংস্থাপন করার জন্য বিজেপি তাদের স্বপক্ষে আন্দোলনে নামবে। অতঃপর

২৬টি হিন্দু বাঙালি সংগঠন বিজেপি'র মদতপুষ্ট হয়ে বিশাল গণসমাবেশের প্রস্তুতি নেয় নাগরিক সুরক্ষা সমিতির নামে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগঠনের (অবশ্যই হিন্দু বাঙালি, সব ধর্মের বাঙালি নিয়ে নয়) নেতা সুকুমার বিশ্বাস জানান যে Citizen Right Protection Forum-এর উদ্যোগে হবে এই সমাবেশ, সমাবেশে উপস্থিত থাকেন বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেব। এইসব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। অসমের বিজেপি নেতা তথা রাজ্য অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন যে, নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের ফলে আগামী দশ বছর বিজেপি ভোটে অনেক বেশী আসন পাবে।

সি.পি.আই.(এম.এল.) লিবারেশন পার্টির অসম রাজ্য সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) পংকজ কুমার দাস বলেন যে, নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের উদ্দেশ্য অসম চুক্তি (১৯৮৫) আর ভারতীয় সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিকে লঙ্ঘন করা। বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজন, উত্তেজনা, শঙ্কা, সংঘাত সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করেছে আর সেই উদ্দেশ্যে অসমিয়াভাষী ও বাংলাভাষীর মধ্যে ঐক্য-সম্প্রীতি ধ্বংস করার কৌশল নিয়েছে। আর সেটার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিজেপি'র বিধায়ক শিলাদিত্যর নেতৃত্বে চলা ভাষিক সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ।

আর.এস.এস.'র উদ্দেশ্য অনুপ্রবেশকারী বাঙালী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিয়ে হিন্দু গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা। এইটি হলে জাতিগত প্রশ্নে অসমিয়ারা (ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন জনজাতি, খিলঞ্জীয়া জনগণ নিয়ে) সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই কারণে একাত্তরের ২৫ মার্চের পর কারা অনুপ্রবেশ করেছে তা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক। আর সে জন্যই অসমে এন.আর.সি.'র [National Register of Citizenship] দাবি ছিল। ২০১৩তে অসমে এন.আর.সি. শুরু হয়, কিন্তু অগ্রগতি অত্যন্ত শ্লথ ছিল। জনৈক অসমিয়া অভিজিৎ শর্মা এন.আর.সি.'র কাজ দ্রুততার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও বিচারপতি নরিম্যানের সাংবিধানিক বেঞ্চ এন.আর.সি.'র কর্ম পদ্ধতির কয়েকটি গাইডলাইন দেয় এবং কাজে গতি আসে। বিজেপি এই প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ছিল না, বরং প্রশাসনিক স্তরে এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ বাংলাদেশী হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারেরও উপর চাপ বাড়বে ১৯৮৫'র অসম চুক্তিকে মান্যতা দেওয়ার যা 'হিন্দু রাষ্ট্র' বা আর.এস.এস. পরিকল্পনা ব্যর্থ করবে। এ বিষয়ে ড. হীরেন গোহাঁই আমাকে ২০১৮'র জুলাইতে মেল করে জানান, "First they (রাজ্য বিজেপি সরকার) stopped sending committed funds, then the state government withdrew hundreds of officers deported for work on NRC. Then the state cabinet committee overseeing the work sent a notification to NRC Co-ordinator. That in line with centre's plans-post 1971 Hindu migrants from Bangladesh should be put on NRC rolls.

The Supreme Court ended that play with strictures. Now they are playing a subtle game, Bengali Chauvimism is being encouraged to confuse people and disturb the work for NRC. Suddenly the border police in Assam are sending hundreds of so-called D-voters (suspected foreigners) to Foreigners' Tribunals. The latter are cheerfully declaring many of them as foreigners.

At the same time the misery and torments of people in detention camps for D-voters are hitting the headlines. Why did the humanitarians fall to take note or such misery for more than 25 years?

True, this is a humanitarian disaster. But Bengali intellectuals and scholars from Cachar district are painting this as a Bengali disaster. Tapadhir Bhattacharya is reminding all Bengalis that their language has the second biggest number of speakers in the country and in the world it comes sixth. In noisy confusion and original purpose of NRC is simply thrown into rubbish heap."

অসমে নাগরিকপঞ্জী তৈরিতে যে বিশাল ভুল হয়েছে, তা বিজেপি রাজ্য সরকারেরই সৃষ্টি। প্রকৃত নাগরিকরাও বাদ পড়েছে। বিজেপি তথা আর.এস.এস.-এর লক্ষ্য বা আশা ছিল ৬০-৭০ লক্ষ মুসলমান অনাগরিকে পর্যবসিত হবে। কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থ হল। কিন্তু আর.এস.এস.'র হাতে বিকল্প আছে—নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন। আর অসমের এই ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা নিল। এক নতুন কৌশল ধরল। একাধারে বিকল্প সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন আর অস্ত্র হল এন.পি.আর. [National Population Register] এবং এন.আর.সি. যার কারসাজিতে লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের অনাগরিক বানিয়ে দেওয়া যাবে আর মুসলমানদের আবহমান কালের স্বাভাবিক নাগরিকত্বকে বেআইনি করে দেওয়া যাবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগত কৌশলে।

আমেরিকার US Commission on International Religious Freedom [USCIRF] অভিযোগ করেছে, NRC in Assam is a tool to target religious minorities and to render Muslims stateless.

২০১৯এর ১১ই ডিসেম্বর লোকসভায় ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন জারি হবার পর সাথে সাথেই সমগ্র অসমে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ করে বিজেপি রাজ্য সরকারের ঘোষিত কার্ফুকে অগ্রাহ্য করে। এরকম বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ ভারতে আর কোথাও হয় নি। সরকারি কার্ফু ব্যর্থ হয়। অথচ এর খবর পশ্চিমবাংলার বাংলা বা ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় সেভাবে আসে নি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পথে নেমেছে। ১২ই ডিসেম্বর গুয়াহাটির লতাশিলে কার্ফু অমান্য করে আসুর ডাকে শিল্পী, অভিনেতা, সৃজনশীল মেধাজীবী ব্যক্তিরা এক প্রতিবাদী জনসমাবেশ করে। পরেও

সংগীতশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, চলচ্চিত্রের অন্যান্য শিল্পীরা পথে নামেন, জনসভা করেন। জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গ অসমিয়া দেশপ্রেমের গান, ভূপেন হাজরিকার গান জনসভায় গেয়ে আন্দোলনে উদ্দীপনা দেন। আন্তর্জাতিক চিত্র পরিচালক জহ্নু বরুয়া সরকারি পুরস্কার ফিরিয়ে দেন। ১৩ই ডিসেম্বর গুয়াহাটির চাঁদমারিতে কার্ফু অগ্রাহ্য করে এক বিশাল জনসমাবেশ হয়। নর্থ-ইষ্ট স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশনের ডাকে সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যাপক হারে প্রতিবাদী জনসভা ও মিছিল সংগঠিত করছে। শুধু গুহাহাটিকেন্দ্রিক নয় এই ব্যাপক প্রতিবাদ সারা অসমের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক। শুধু প্রথম দিকে গুয়াহাটিতে একটি মাত্র বাস জ্বলে এবং কলাক্ষেত্রে কিছু ভাঙচুর হয়। বিজেপি সরকারের পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়, ফলে পাঁচ জন শহীদ হয়েছেন, এদের মধ্যে ২ জন হিন্দু আর একজন জনজাতির ব্যক্তি আর বাকি দুইজন মুসলমান আর খ্রীষ্টান। পুলিশের এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে হীরেন গোহাঁই বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবী করেন এবং এই দাবিতে আন্দোলন চলছে।

'কা' বিরোধী এই আন্দোলনের শক্তিশালী সংগঠন হল সদৌ অসম কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর তার বর্শামুখ নেতৃত্বে আছেন অখিল গগৈ। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। অখিল গগৈকে বিগত প্রায় তিন বছর ধরে বিভিন্ন মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় বিজেপি সরকার তাকে হয়রান করছে। কখনো গুয়াহাটি আদালতে, কখনো অন্য কোনো আদালতে তাকে বারংবার হাজির হতে হয়েছে। অখিল গগৈর গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার দক্ষতা দেখে বিজেপি (আর.এস.এস.) ভয় পেয়েছে, এবার তাকে মিথ্যা মাওবাদী আখ্যা দিয়ে UAPA আইন ও অন্যান্য কালা কানুনে গ্রেপ্তার করেছে। আগেও সিটিজেনশিপ এ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরুদ্ধে যখন তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল সে সময় অখিল গগৈ ও হীরেন গোহাঁই-এর বিরুদ্ধে অসম সরকার 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' মামলা এনেছিল। অখিল গগৈকে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে নিয়ে যায়। শুধু অখিল গগৈ নয় সদৌ অসম কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির অগ্রণী সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ ধৈর্য কোয়ার, বিতু সোনোয়াল, মানস সহ মোট পঞ্চাশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিভিন্ন কালা কানুনে অভিযুক্ত করেছে আর এদের উপরে কঠোর আক্রমণ নামাবার জন্য এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার দায়িত্ব ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (NIA) উপর বর্তিয়েছে। অখিল গগৈ বলেছেন যে, অসমসহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের খিলঞ্জীয়া জনগণের অস্তিত্ব তীব্র সংকটের মুখে পড়েছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মণিপুর, মেঘালয়ের নাগরিক সমাজ North-East Forum for Indigenous People-এর প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। নাগরিক আইনের সংশোধনের ফলে নানান জনজাতি সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যাবে। আর বিজেপির 'মহানুভবতায়' অনুপ্রবেশকারী বাঙালি হিন্দুরা হয়ে যাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই আন্দোলনের তরঙ্গে উঠে এসেছে আরেকটি নাম, অরূপজ্যোতি সইকিয়া। গুয়াহাটি আই.আই.টি.'র অধ্যাপক। তাকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে 'আরবান মাওবাদী' বলে। তাকেও তিন দিন ধরে NIA তাদের অফিসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এক নাগাড়ে জেরা করেছে অখিল গগৈর সাথে যৌথভাবে। এই 'কা' বিরোধী আন্দোলনের আরেক অগ্রণী তরুণ হলেন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র য়ুনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রাঞ্জল কলিতা, ইনি গণিতে কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাকে আটক করে NIA এক নাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জেরা করে। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ''কাউকে ভয় করি না, আন্দোলন চালাব। অসমে বিজেপি ৩১ শতাংশের সমর্থনে সরকার গঠন করেছে, বাকি ৬৯ শতাংশ সমর্থন করে নি। কৃষক মুক্তি মানে 'মাওবাদী' নাকি?'' সম্প্রতি ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির যৌথ সম্পাদক ছাত্র নেতা জগজিত গোহাঁইকে আটক করেছে। যেখানেই আন্দোলন, যেখানেই প্রতিবাদ, সেখানেই সেই ব্যক্তির উপরেই বিজেপি নামিয়ে আনছে আক্রমণ। তাদের জনস্বার্থ বিরোধী, জাতীয় ঐক্য বিরোধী, ভারতের আর্থিক স্বার্থ বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার হচ্ছেন তাদেরকেই কালা কানুনের শিকল পড়াচ্ছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাশ্মীরি গবেষক সার্জিল ইমাম গুয়াহাটি গিয়েছিলেন। সেখানে জনগণের প্রবল 'কা' বিরোধী আন্দোলনকে সংগ্রামী অভিনন্দন ও সমর্থন করেছিলেন। কাশ্মীরিদের জীবনধারার নির্ণায়ক যেমন কাশ্মীরিরা, কোনো বর্হিশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারে না, তেমনি অসমিয়াদের জীবনধারার নির্ণায়ক অসমিয়ারাই কোনো বর্হিশক্তি নয়। সাথে সাথে তার কণ্ঠরোধ করতে বিজেপি'র কেন্দ্রীয় সরকার ও অসমের রাজ্য সরকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দিল্লী ফিরতেই তাকে আটক করা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর অসম বিভাজনের অভিযোগ দিয়েছে। দিল্লি থেকে গুয়াহাটি এনে ২১শে ফেব্রুয়ারি অসম পুলিশ হেফাজতে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা চলছে। অখিল গগৈ সহ আন্দোলনকারীদের মিথ্যা অভিযোগে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা অত্যাচারিত হচ্ছেন। অসুস্থ হচ্ছেন। করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এখন তিনি অসম পুলিশের হেফাজতে আছেন। এই হল বিজেপি শাসনাধীন গণতন্ত্রের নমুনা। আন্দোলনের প্রথম দিকে পুলিশ গুয়াহাটির প্রাণ টিভি চ্যানেলের অফিসের ভিতরে ঢুকে লাঠি পেটা করে। আরও তো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নমুনা সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আর টিভিতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য কখনো অশ্রু বিসর্জন করছে, কখনো তর্জন-গর্জন করছে। তর্কের খাতিরে প্রশ্ন তোলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে পারলে তারা কি গণতন্ত্রের স্রোতধারা নিয়ে আসবে?

বছরের শুরুতে গুয়াহাটিতে 'খেলো ইণ্ডিয়া' বিশাল ক্রীড়া উৎসব হয়ে গেল। উদ্বোধনে আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর জাপানের প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু 'কা' বিরোধী বিশাল

গণ-আন্দোলনের ভয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পিছপা হলেন, প্রধানমন্ত্রীদের গুয়াহাটি অনুষ্ঠান বাতিল হল।

'কা' বিরোধী আন্দোলন এখন নতুন গতিপথ খুঁজছে। গঠিত হয়েছে 'অসম চুক্তির ৬ নং দফা রূপায়ন সমিতি'। অসম চুক্তিতে অসমীয়াদের রক্ষা কবচ আর অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য উক্ত দফায় লেখা হয়েছে, ''অসমিয়া মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ভাষিক পরিচয় আর ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ আর বিকাশের জন্য যথোচিত সাংবিধানিক আইনগত আর প্রশাসনিক রক্ষা কবচ দেওয়া হবে।'' কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকার। এখন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এই অঙ্গীকারকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এই শর্ত পালনের দাবি জানিয়ে সমিতির এক প্রতিবেদন নিয়ে দিল্লি গেছেন সমিতির অধ্যক্ষ বিপ্লব কুমার শর্মা। তিনি বলেছেন যে, এই শর্ত কার্যকরি হলে অসমিয়ারা পাবে রক্ষাকবচ। কথা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সাথে দেখা করে প্রতিবেদনটি দেবেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত অমিত শাহ দেখা করেন নি।

বিজেপি বারবার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নেই। এর ফলে জনগণও চাইবে আঘাত আনতে। এই অবস্থায় আরেকটি নতুন সংগঠন 'বীর লাচিত সেনা' আন্দোলনে নতুন মাত্রা দিতে এগিয়ে আসছে। এদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ কাজ করছে।

আর বি.জে.পি. (আর.এস.এস.) তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদে অনড় থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ কেন্দ্রিয় সরকার অসম সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে অ-মুসলিম বাংলাদেশী বা সন্দেহজনক ভোটারদেরকে ছেড়ে দিতে কিন্তু মুসলমানরা আটকই থাকবে। অ-মুসলমান লোকদের সঙ্গে কোনো বৈধ নথিপত্র থাকুক বা না-থাকুক বা বৈধ নথির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই সংবাদ বেড়িয়েছে ৬ ফেব্রুয়ারি 'অসমীয়া খবর' দৈনিক পত্রিকায়। যে তপোধীর ভট্টাচার্য বা অন্যান্য তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষাকারীরা ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে কলকাতায় হিন্দু বাঙালিদের মানবতাবোধ জাগাচ্ছিলেন তারা এখন কি সোচ্চার হবেন? লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বিগত তিন বছরে মোট ৭৬১ জনকে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। উদারতা দেখিয়ে আরও বলেছেন, এরপর থেকে আর 'ডিটেনশন ক্যাম্প' থাকবে না, ওটা হবে 'হোল্ডিং সেন্টার' অর্থাৎ 'বাস কেন্দ্র'। যেখানে মুসলমানরা 'বসবাস' করবেন?

ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে বছর দুয়েক আগে কলকাতায় কিছু প্রতিবাদী সভা, লিফলেট হয়েছিল, বুদ্ধিজীবীরা কেউ কেউ সামিল হয়েছিলেন। এখন কি তারা অসমের আন্দোলনের স্বপক্ষে অখিল গগৈ সহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিতে কলকাতায় সমাবেশ, লিফলেটিং ইত্যাদি করবেন, নাকি হিন্দু বাঙালিরা বাকরুদ্ধ থাকবেন।

বড়ো শান্তি চুক্তি 'বড়ো ল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন' করার বিজয় উৎসব করতে নরেন্দ্র মোদি কোকড়াঝারের জনসভায় গিয়ে তার ভাষণে বলেন যে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের পরে কোন বাংলাদেশী বিদেশীকে অসমে ঢুকতে দেয়া হবে না। কি রকম স্ববিরোধী কথা! কি রকম মিথ্যাচার! বিজেপি'র রাজ্য কমিটি তথা আর.এস.এস. বলছে বাংলাদেশী হিন্দুদের অসমে সংস্থাপন করা হবে। আসুর নেতা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেছেন যে, হিন্দু বাংলাদেশীদের অসমের উপর চাপিয়ে দিলে বি.জে.পি. নিস্তার পাবে না। আইন বানিয়ে বিদেশীকে স্বদেশী বানানো অসমের জনগণ মানবে না।

আর.এস.এস. সমগ্র উত্তরপূর্ব অঞ্চলে তাদের হিন্দুত্বর থাবা প্রসারিত করতে চাইছে। নানা জনজাতির মধ্যে ধর্মগত অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। উদ্দেশ্য, জনজাতিদের মধ্যেও ইসলাম বিরোধী শক্তি তৈরি করা আর সাথে সাথে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কৃতিকে হিন্দুত্বের মোড়কে জড়ানো। জনজাতিদের মধ্যে সমান্তরালে পারস্পরিক সংঘাত তৈরি করা।

ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ আরও উঠবে, কিন্তু ঢেউ ভাঙার শব্দ আমরা কি শুনতে পাব? দিল্লির, উত্তরপ্রদেশের, রাজস্থানের জনগণের উপর আক্রমণের খবর আসছে, আমরা সরব হয়ে উঠছি। অসমের জনগণের সমস্যা, অসমের আন্দোলন নিয়ে আমরা নিস্তরঙ্গ।

'বেটি বাঁচাও' এর প্রকৃত চিত্র

- নারীর উপর আক্রমণ গত এক দশকে ৮৩% বৃদ্ধি
- প্রতি ঘণ্টায় ২১টি করে অপরাধ
- ২০১৭তে রিপোর্ট হওয়া ধর্ষণের সংখ্যা ৩৮,৯৪৭
- কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশেই ৩৭% মহিলা গার্হস্থ হিংসার শিকার
- ৫.৪% বিবাহিত মহিলাকে স্বামীরা জোর করে বলাৎকার করেন
- ২০১৯-র প্রথম ছ মাসে রিপোর্ট হওয়া শিশু ধর্ষণ ২৪২১২টি

কেউ অবৈধ নন নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ.পি.ডি.আর.)

বিপন্ন বিবিধতার মিলনভূমি

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...যত রক্ত-আঁখি/শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।' তা রক্তচক্ষু তো কম দেখা হল না কালে-কালে। চোখে চোখ রেখেই প্রশ্নটা করে ফেলা ভালো, মানুষের জন্য আইন নাকি আইনের জন্য মানুষ? আধার নিয়ে সময়মতো প্রশ্নটা আমরা জোরের সঙ্গে তুলতে পারিনি। পরিষেবা, ভর্তুকির ছুতো দেখিয়েছে ওরা। সে কি দয়া? আমাদেরই তো অর্থ। করের টাকা। সেটা তো যুদ্ধ-হিংসা-অস্ত্রের জন্য দিই না। পরিষেবা আমাদের অধিকার। প্রশ্ন করিনি বলে পেয়ে বসেছে। কাশ্মীরিয়াৎ-খতমেও চুপ থেকেছি। বাবরি ধ্বংস দেখতে হয়েছে, সেই ধ্বংসকারীদেরই মন্দির গড়ার ছাত্রপত্র দেওয়ার নির্লজ্জতাও। গুজরাটে নরমেধের পরেও পার পেয়েছে। আর নয়।

নাগরিককে বৃহৎ জেলখানার কয়েদি ঠাউরে নম্বরে চিহ্নিত করার খেলায় মেতেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আধারের পর বায়না ধরেছে নাগরিকত্ব প্রমাণের। প্রশ্ন করা প্রয়োজন, কে তুমি প্রমাণ চাওয়ার? ক্ষমতার মিছে দম্ভটাকে শিশুপাঠ্য কাহিনীতে চিরতরে মুখ ঢাকতে পাঠানোরই চ্যালেঞ্জ নিয়েছে শাহিনবাগ, পার্ক সার্কাস, জামিয়া-জেএনইউ। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনতারই—প্রতিষ্ঠার সময় এটা। অসহযোগ, বয়কটের পথে সিএএ-এনপিআর-এনআরসি বাতিল করাতেই হবে। 'শক-হুনদল-পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন'-এর ভারতটাকে ওরা হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানের ছকে ঢালতে চাইছে। প্রতিরোধে বিবিধতার, বহুত্বের ভারতটাকে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পতাকাটাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে আমাদের।

নাগরিকত্ব : গোড়ায় যা ছিল

১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ থেকে ১১ অনুচ্ছেদ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত। সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময়ে ৪-৮ অনুচ্ছেদে নাগরিক কে, স্পষ্ট বলা হয়েছিল :

* **অনুচ্ছেদ ৫** : ভারতে জন্মেছেন যিনি, তিনিই নাগরিক (এটাই দস্তুর অন্য বহু দেশে) বা কারও মা ও বাবার মধ্যে এক জনও যদি ভারতে জন্মান, সন্তান নাগরিক। বা অন্তত ৫ বছর ভারতে থাকলে।

* **অনুচ্ছেদ ৬** : কেউ অবিভক্ত ভারতে জন্মালে বা তাঁর মা-বাবা অথবা ঠাকুরমা-ঠাকুরদার কোনও এক জন অবিভক্ত ভারতে জন্ম নিয়ে থাকলে তিনি নাগরিক। ১৯ জুলাই ১৯৪৮-এর আগে পাকিস্তান থেকে আসা মানুষজন বা তার পর এসে ছ'মাস থাকার পর নিবন্ধীকৃত যাঁরা, নাগরিক তাঁরাও।.

> **অবিভক্ত ভারত বলতে ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশের 'ভারত শাসন আইন' ভুক্ত এলাকা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ তখন হয়নি, একই রাজনৈতিক ভূ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক। যারা অখণ্ড ভারতের কথা বেশি বলে, তারাই খেলছে ভাগের খেলা! অতীতও অন্ধকারময় ওদের। স্বাধীনতার লড়াইয়ে ছিল না, ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দিয়েছিলেন সাভারকর।**

* **অনুচ্ছেদ ৭** : ১ মার্চ ১৯৪৭-র পর পাকিস্তান চলে গিয়েও যদি কেউ পুনর্বাসন পারমিটে ভারতে আসেন এবং ৬ মাস থাকার পর নিবন্ধীকৃত হন, তবে নাগরিক।

* **অনুচ্ছেদ ৮** : ভারতের বাইরে বসবাসকারী কিন্তু মা-বাবা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমা যদি ভারতে জন্মে থাকেন, তা হলেও নাগরিক।

১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইন : স্বাধীন ভারতের প্রথম নাগরিকত্ব আইন, সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদে পাশ হয়। বলা হয়েছিল :

* ১ জানুয়ারি ১৯৫০-র পর ভারতে জন্মালেই নাগরিক। পরে এই তারিখ বাড়িয়ে ১ জুলাই ১৯৮৭ ও আরও পরে মা-বাবার কোনও একজন ভারতীয় হওয়ার শর্তে ২০০৪-এর ৩ ডিসেম্বর করা হয়।

* কেউ ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করলে এবং ৫ বছর বসবাসের পর নিবন্ধীকৃত হলে নাগরিক।

> এই ধারায় ধর্ম নির্বিশেষে শরণার্থীর নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার স্পষ্ট। এই ধারার উল্লেখেই ১৯৯৬-র ৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট অরুণাচলে বসবাসকারী বাংলাদেশ থেকে আসা ৬৪ হাজার চাকমা-হাজং শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদানের নির্দেশ দেয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মামলায় কেন্দ্রও নাগরিকত্বের দাবি সমর্থন করেছিল (ডব্লিউপি (সি) ৭২০/১৯৯৫)। ২০১৫-র ১৭ সেপ্টেম্বর ফের সুপ্রিম কোর্ট একই রকম রায় দেয় (ডব্লিউপি (সি) ৫১০/ ২০০৭)। শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৮৮৯-র কনভেনসনে ভারত স্বাক্ষরকারী। সব শিশুই জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের এবং বৈষম্যের শিকার না-হওয়ার অধিকারী। ১৯৬৬-র নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদেও বিধৃত এই অধিকার।

২০০৩-এর সংশোধনী

* ৩ ডিসেম্বর ২০০৪-এর পর ভারতে জন্ম নেওয়া যে কেউ নাগরিক হতে পারেন যদি তাঁর মা-বাবার কোনও এক জন ভারতীয় হন অথবা এক জন ভারতীয় নাগরিক এবং অন্য জন 'অবৈধ অভিবাসী' না হন।

অর্থাৎ মা-বাবার নাগরিকত্বের শর্ত জোড়া হল। বৈধ/অবৈধ ভাগ করাও শুরু বাজপেয়ী সরকারের আমলেই। ২০০৩-এর সংশোধনীতেই লুকিয়ে বিপদের বীজ। এটাও বাতিলের দাবি জরুরি। তবে এই অবধি অন্তত ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের

ধারণা ঠাঁই পায়নি ভারতীয় সংবিধান/আইনে। বৈধ-অবৈধ প্রমাণের দায় কেন নাগরিকের—সে প্রশ্নও রয়েছে। অসমের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৮৩-তে তৈরি আইএমডিটি আইনে কিন্তু 'অবৈধ' প্রমাণ করতে হত সরকারকেই। ২০০৫ সালে সর্বানন্দ সোনোয়ালের (বর্তমান অসমের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ন্যায়বিচারের প্রাথমিক শর্তের বিপরীতে দায় চাপায় নাগরিকের উপরেই। তখন ওই রায় চ্যালেঞ্জ করা হলে হয়তো অসমবাসীর এত যন্ত্রণা হত না।

২০১৯-এর সংশোধনী

* ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-র আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু-শিখ-জৈন-বৌদ্ধ-পার্সি আর খ্রিস্টানরাই শুধু নাগরিকত্ব পাবেন।

বাদ মুসললিমরা। পড়শি শ্রীলঙ্কার ধর্ম-নির্বিশেষে তামিল, মায়ানমারের রোহিঙ্গা, পাকিস্তানের বালুচ, শিয়া ও আহমেদিয়া, আফগানিস্তানের তাজাক, উজবেক, হাজারারা বা ভুটানের লোদসাম্পা, তিব্বতিরা নিপীড়নের শিকার হয়ে এ দেশে এলেও 'বৈধ' গণ্য হবেন না। বাংলাদেশের নাস্তিক ব্লগাররাও নন। ধর্মীয় ছাড়া আরও বহু কারণে মানুষ অভিবাসী হন। কাজের খোঁজই সবচেয়ে গুরুতর প্রয়োজন। পুঁজির বিশ্বায়নকে সাড়ম্বরে বরণ করা হলে শ্রমের ভুবনায়নে আপত্তি কোন অজুহাতে? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছিন্নমূল বা উন্নয়ন-উদ্বাস্তুর সংখ্যাও অগণন। চাকমা-হাজংরাও ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-রাঙামাটিতে কর্ণফুলি নদীর উপর কাপ্তাই বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়ন-উদ্বাস্তুই।

প্রশ্ন যেখানে

সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে আইনের চোখে সমতা, আইনে সমভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-জাত ভিত্তিক বৈষম্যের শিকার না-হওয়া অধিকার বিধৃত ১৫ অনুচ্ছেদে। এই দুই অধিকারই লঙ্ঘিত নতুন নাগরিকত্ব আইনে। এনআরসি হলে এবং ডিটেনশন ক্যাম্পই যদি ঠিকানা হয়, ২১ অনুচ্ছেদে বিধৃত জীবনের অধিকারও খর্ব হওয়ার আশঙ্কা ষোলো আনা। অনির্দিষ্টকাল ডিটেনশন ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক—সমস্ত বিধির পরিপন্থী। অসমে যাঁরা ইতিমধ্যেই ডিটেনশন শিবিরে গিয়েছেন, তাঁদের ৭৮ শতাংশের ক্ষেত্রে একতরফা রায় দিয়েছে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। নথির নামে উৎকট চাহিদা পূরণ অসম্ভব আম-আদমির পক্ষে। মহিলা, সিঙ্গল মাদারদের অবস্থা দুর্বিষহ। নাজেহাল আদিবাসী, গরিব শ্রমজীবী।

বলা হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যেখানে 'ইনার লাইন পারমিট' ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে নতুন আইন কার্যকরী হবে না। এই ছাড় কিন্তু নেই কাশ্মীরে (কারণ, ইতিমধ্যেই গায়ের জোরে লোপাট করা হয়েছে ভূস্বর্গের বিশেষাধিকার)। এখানেও প্রকট সেই মুসলিম-বিরোধী মনোভাব। লঙ্ঘিত সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ।

যদিও ধর্মীয় নিপীড়নের 'কারণে' পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু-শিখ-জৈন-বৌদ্ধ-পার্সি-খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলছে বিজেপি, সংশোধিত আইনে সেটাও কিন্তু বলা নেই। ২ নম্বর ধারায় কৌশলে বিষয়টি রাখা হয়েছে ২০১৫-য় এই সরকারের আমলেই সংশোধিত ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং পাসপোর্ট আইনের ৩ (২) (সি) ধারার উল্লেখে। পাসপোর্ট আইনের ওই সংশোধনীতে 'ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ-পার্সি-খ্রিস্টান' অভিবাসীদের অবৈধ গণ্য করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। প্রশ্ন হল, ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার—এটা প্রমাণ হবে কী করে? যে দেশ ছেড়ে কেউ আসছেন, সেখানের সরকার এই কারণ মেনে নথি দেবে না। বলা হচ্ছে, হলফনামা দিলেই হবে। কোনও ম্যাজিস্ট্রেট হলফনামা স্বীকার করেন সমর্থনসূচক নথির ভিত্তিতে। নথিই যদি না-থাকে হলফনামা তৈরি অসম্ভব হতে পারে। বলা হচ্ছে, পাঁচ বছর ভারতে থাকার পরে আবেদনের ভিত্তিতে মিলতে পারে নাগরিকত্ব। অর্থাৎ আবেদন করা ও তা বিবেচনা করা হয় কিনা, উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। এমনি-এমনি হবে না। বহু বছর ধরে দেশগড়ার কাজ করে এখন কৃপাপ্রার্থী হতে হবে কেন? 'র', আইবি তদন্ত করবে কেন? (জেপিসি রিপোর্ট পৃ. ৪০)। হলফনামা ছাড়া আবেদন গ্রাহ্য না-হলে ভবিতব্য কি তবে সেই ডিটেনশন ক্যাম্প? অসমে অভিজ্ঞতা এমনই। এক বার হলফনামায় অভিবাসী স্বীকার করে নিলে ভবিষ্যতে সমস্যা হবে না, সে গ্যারান্টি কোথায়? বিশেষত, অসমে যাঁরা এনআরসি-পর্বে নিজেদের এক দফা অধিবাসী দাবি করেছেন, তাঁরই এনআরসি-ছুট হয়ে এখন অভিবাসী দাবি পেশ করলে ফৌজদারি অপরাধেও অভিযুক্ত হতে পারেন। এমনই বন্দোবস্ত নিপীড়নের।

এনপিআর ও এনআরসি

২০০৩ সালে সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে বাজপেয়ী সরকারের সংশোধনী একেবারে নতুন একটি বিষয় সংযোজন করে। সংশোধনী নামেই স্পষ্ট—সিটিজেনশিপ (রেজিস্ট্রেশন অভ সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অব ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ডস) ২০০৩। এর ১৪ (এ) ধারায় বলা হয়, সবার রেজিস্ট্রেশন 'বাধ্যতামূলক', সেই লক্ষ্যে হবে দেশজুড়ে এনআরসি। আর সেই এনআরসি-র প্রথম ধাপই হল এনপিআর—ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার। ৩১ জুলাই ২০১৯-এ যার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস সার্ভের লক্ষ্যে। সমীক্ষা হওয়ার কথা ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০-র মধ্যে। বায়োমেট্রিক ডেটা এবং বাবা-মা'র জন্ম-তারিখ ও জন্মস্থান সম্পর্কিত তথ্যও দিতে হবে। নিজের বা মা-বাবার জন্মতারিখ নির্দিষ্ট ভাবে জানা না থাকলে আন্দাজের জন্য যে উৎসব-তালিকা দেওয়া হয়েছে এনপিআর ম্যানুয়ালে, তাতে পর্যন্ত মুসলিম-উৎসব নেই। এমনই বিভাজন-বিষ। নথি না থাকলে সমস্যায় পড়বেন প্রধানত মুসলিমরাই। এমনই কৌশল।

এ একেবারেই নতুন ধারণা ভারতীয় নাগরিক জীবনে। কোন

তথ্য লোকাল রেজিস্ট্রারের সন্দেহজনক মনে হলেই এনপিআর-এ 'সন্দেহজনক' ছাপ পড়ে যাবে। হবে বিশেষ শুনানি। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না-হলে রেজিস্টারে বাদ চলে যাবে নাম। অর্থাৎ অসমে এনআরপি-ছুটদের মতোই অবস্থা হবে। মনে রাখতে হবে, অসমে এনআরসি-র বৈধতা নিয়েও মামলা বিচারাধীন সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে (ডব্লিউপি সি ৫৬২/২০১২ ও ৩১১/২০১৫)। তার মীমাংসার আগেই অসমে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা তৈরির বৈধতা নিয়েই রয়েছে মস্ত প্রশ্ন। অসমে এনআরসি'র কাট অব ডেট ২৪ মার্চ ১৯৭১ লঙ্ঘন করেছে ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইন।

এনপিআর জনগণনার অঙ্গ নয়, এনআরসি-রই প্রথম ধাপ : ২০২১-র জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ২৬ মার্চ ২০১৯-এ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার তরফে। আর এনপিআর-এর ৩১ জুলাই ২০১৯-র বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে একই মন্ত্রকের অধীন অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল সিটিজেন্স রেজিস্ট্রেশন ইন্ডিয়ার তরফে এবং সিটিজেনশিপ (রেজিস্ট্রেশন অব সিটিজেনস অ্যান্ড ইস্যু অব ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ডস) রুল ২০০৩ অনুসারে। আরও উল্লেখযোগ্য, বলা হয়েছে, বাদ থাকবে অসম। সেখানে এক দফা এনআরসি-রই ষড়যন্ত্র—পরিষ্কার। এনপিআর ছাড়াই দশকের পর দশক জনগণনা হয়েছে। সমস্যা হয়নি। দরকারই হয়নি। ২০১০-১৫ পর্বে হলেও তা ছিল নেহাতই নিরীহ তথ্য সংগ্রহ। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের অধিকার খর্ব করতে এ বার সরাসরি কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের নকশাও রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেনসাস কমিশনার-এর সাইটে (http://www.censusing.gov.in/2011-Common/Faqs1.html) FAQ FOR NPR-এ ৫ নম্বর পয়েন্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

5. Is it necessary to register for the NPR?

It is compulsory for every citizen of the country to register in a National Register of Indian Citizens (NRIC) as per Section 14A. of the Citizenship Act 1955 as amended in 2004. The NPR is the first stem towards preparation of the NRIC. Out of the universal data set of residents, the subset of citizens would be derived after due verification of citizenship status. Therefore it is compulsory for all usual residents to register under the NPR. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শেষ বার্ষিক রিপোর্টের ২৬২ পাতাতেও একই বক্তব্য রয়েছে। তার পরেও বিজেপি-সঙ্ঘীদের বিভ্রান্তিকর প্রচার তাদের জুয়াচুরিরই প্রমাণ।

আপাদমস্তক হঠকারী, ঘৃণ্য এক ছক

অসমে এনআরসি প্রক্রিয়ায় খরচ হয়েছে ১৬০০ কোটি টাকা, প্রায় বিশ লাখ লোক চরম সঙ্কটে, শতাধিক ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন। মানবিক বিপর্যয় কহতব্য নয়। ন'য়ের দশকে কয়েকটি সংগঠনের দাবির প্রেক্ষিতে নেমে আসে এনআরসি-খড়্গ। শুরু ২০১৫-য়, বিজেপি সরকারের আমলেই। চলতি বছরের গোড়ায় যখন প্রথম বার লোকসভায় নাগরিক সংশোধনী বিল পেশ ও পাশ হয়, তখন এ সম্পর্কিত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) ৪৩৮ পাতার রিপোর্টও পেশ হয়েছিল। তার ৩৯ পাতায় আইবি-র তথ্য হিসাবে জানানো হয়, ধর্মীয় নির্যাতনের কারণ দর্শিয়ে ৩১ হাজার ৩১৭ জন দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় ভারতে অভিবাসী, তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদানে বাধা নেই। তা হলে কি নাগরিকত্ব পাবেন এ ক'জনই? আর বাদ যাবেন অমিত শাহ কথিত কোটি কোটি 'টারমাইট'? শব্দ-ব্যবহারেই প্রকাশ নীচতা।

আরও একটি জরুরি প্রশ্ন

কেন ২০১৫-য় পাসপোর্ট ও ফরেনার্স অ্যাক্টে সংশোধন সত্ত্বেও ১৩ লাখ হিন্দু অসম-এর এনআরসি-তে বাদ গেলেন? '১৫-র সংশোধনীতে তো বৈধতা দেওয়া হয়েছিল মুসলিম বাদে বাকিদের। তার পরেও যদি এই হাল, সিএএ নিয়ে বিজেপি-র গালগল্প কতটা ভরসাযোগ্য? ১৯৮৭-র ১ জুলাইয়ের আগে ভারতে জন্মানো যে কেউই যখন নাগরিক, তখন কোন যুক্তিতে বাদ যান তেমনও লাখ-লাখ মানুষ? ২০০৩-এর রুলস কী ভাবে মূল আইনকে টপকে যায়? কেন প্রমাণের দায় নাগরিকের? রাষ্ট্র তারই দেওয়া ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, পাসপোর্ট বা আধারের মতো নথি নিয়েও কী ভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে? অসমে গ্রাহ্য নথির তালিকা বার বার বদলে গিয়েছে, বিপন্ন হয়েছেন মানুষ।

মিথ্যের জাল ছিঁড়ে

২০১১-র জনগণনায় প্রকাশ, আগের এক দশকে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৭.৬৪ শতাংশ। আর অসমে সেটা ১৬.৯০ শতাংশ। বাংলায় মাত্রই ১৩.৯৩ শতাংশ। তা হলে পূর্ব-ভারতের এই দুই রাজ্যে লাখ-লাখ 'অনুপ্রবেশে' (মুসলিম!) জনবিস্ফোরণের তত্ত্ব কি ধোপে টেকে? গুজরাটে এই হার কিন্তু জাতীয় গড়ের ঢের বেশি—১৯.২০ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশেও কুড়ি শতাংশের বেশি। প্রসঙ্গত, ১৩০ কোটির দেশে ৭৯.৮ শতাংশ হিন্দু। মুসলিম জনসংখ্যা রয়ে গিয়েছে ১৪ শতাংশেই (১৪.২ শতাংশ)। ১৯৯১-২০০১ দশকে মুসলিম জনসংখ্য বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৫২ শতাংশ। ২০০১-২০১১ দশকে ৫ শতাংশ কমে হয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে তুলনায় কম। ৩ শতাংশ। দেশভাগ হয়েছে নেতাদের মর্জিতে, জনতার সম্মতিতে নয়, তা হলে উপমহাদেশের মানুষ কেন যন্ত্রণা পোহাবেন?

ব্যর্থ করো ষড়যন্ত্র

তা হলে কি ইজরায়েলের 'ল অব রিটার্ন'ই চালু করতে চাওয়া হচ্ছে? ইজরায়েল মানেই ইহুদির পিতৃভূমি, পুণ্যভূমি—এই ধারণা অনুসারেই কি হিন্দুর দেশ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হচ্ছে বিবিধতার এই মিলনভূমিকে? আবার এনআরসি-তে লিগাসি ডেটা চাওয়ার মধ্যে নাৎসি জার্মানিতে হিটলারের বিশুদ্ধ আর্য-রক্ত খোঁজার

উন্মত্ততাও সমান পরিলক্ষিত। নাৎসি ও ইহুদি---এই দুই মহাবিপরীতকে মেলানোর ছকে মোদী-শাহ কি 'ভারত'-এর ধারণাটাকেই ধ্বংস করতে চাইছেন? কেউ অবৈধ নয়—এই স্লোগান উঠেছে আজ বিশ্বজুড়ে। সিএএ, এনপিআর, এনআরসি বিরোধিতার সঙ্গেই ২০০৩-এর সংশোধনী, ২০১৫-পাসপোর্ট ও ফরেনার্স অ্যাক্টের সংশোধনী বাতিলের দাবিও সমান জরুরি।

মনে রাখা ভালো, পৃথিবীতে সর্বাধিক অভিবাসী কিন্তু ভারতীয়ই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অভিবাসী-সংক্রান্ত ২০১৫-র রিপোর্টে এই সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ অন্তত। কাজের খোঁজেই মূলত। ১২ লাখ ভারতীয় অভিবাসী বাংলাদেশেও। সেখান থেকে প্রায় ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আসে ভারতে ফি-বছর। এদিকে শ্রমজীবী মানুষকে আরও বেশি শোষণের জন্য আনা হচ্ছে নয়া শ্রম-কোড। তাতে সর্বনাশ সব ধর্মের মানুষেরই। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবর যৌথ প্রতিরোধই সময়ের দাবি।

রাজ্য বাজেটে প্রকল্প প্রাপ্তি (২০২০-'২১)

প্রকল্প	উদ্দেশ্য	বরাদ্দ*
● **বন্ধু**	ষাটোর্ধ্ব তফসিলি জাতির নাগরিকদের মাসিক ১ হাজার টাকা ভাতা (*যাঁরা অন্য কোনও পেনশন পান না*)	২৫০০
● **জয় জহার**	তফসিলি জনজাতির ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের মাসিক ১ হাজার টাকা বার্দ্ধক্য ভাতা (*যাঁরা অন্য কোনও পেনশন পান না*)	৫০০
● **বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা**	অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরতদের নানা সুবিধা (বিনামূল্যে বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সন্তানের শিক্ষার জন্য অনুদান)	৫০০
● **কর্মসাথী প্রকল্প**	বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর প্রকল্প (২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লগ্নির নতুন প্রকল্পে ঋণ ও ভর্তুকি)	৫০০
● **চা-সুন্দরী**	গৃহহীন চা শ্রমিকদের বাড়ি প্রকল্প	৫০০
● **হাসির আলো**	অতি-গরিব শ্রেণিকে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট নিখরচায় বিদ্যুৎ	২০০
● **বাংলাশ্রী**	নতুন এমএসএমই উৎসাহ প্রকল্প	১০০
● **এমএসএমই পার্ক**	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য ১০০ নতুন পার্ক	২০০
● **নতুন বাংলা সহায়তা কেন্দ্র**	ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবার পরিসর বৃদ্ধি	১০০
● **নতুন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়**	বীরসা মুন্ডা, অম্বেডকর এবং ওবিসি শ্রেণির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়	৫০
● **সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ**	কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	১৫

*কোটি টাকায়

প্রতিবাদের অধিকারের পক্ষে

''শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের পথেই স্বাধীনতা এসেছিল। আমাদের সৌভাগ্য দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও অহিংসায় বিশ্বাস করে। নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে নামতে বাধ্য হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে। কিন্তু সে জন্য সেই প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা যায় না''।—**বম্বে হাইকোর্ট**

''রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করলে ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়। এই পরিবেশ আইনের শাসন ও সংবিধানে বর্ণিত বহুত্ববাদী সমাজের বিরোধী। একমাত্রিক হওয়াটা ভারতীয়ত্বের পরিচয় নয়। আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমাদের দুর্বলতা নয়''।—**ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়** (সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি)

ব্যক্তিত্ব

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল : বাংলা রাজনীতির নায়ক থেকে বিস্মরণ

বাপ্পাদিত্য রায়

কথারম্ভ

''বাংলা ছিল মুসলিম প্রধান ও তপশিলিজন অধ্যুষিত। কংগ্রেসের হিন্দুওয়ালা নেতারা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন। মুসলিম লিগের অবাঙালী নেতারা ফজলুল হককে লিগ থেকে তাড়ালেন। ব্রিটিশ যুদ্ধনীতি পূর্ব পরিকল্পনামত সিঙ্গাপুর, মালয়, থাইল্যান্ড ও ব্রহ্মদেশ থেকে পশ্চাদপসরণ করে বাংলাকে যুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গন করে তোলে। ফলে, নিম্নবঙ্গকে ধ্বংস করে দেওয়া হল ও যুদ্ধের রেশন চালাতে বাংলায় ঘটল ৪৩-র দুর্ভিক্ষ। ৪৫-এ ম্যালেরিয়া মহামারী। ১৯৪০ পর্যন্ত ও ১৯৪৫-র পর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছিল বাংলার নিজস্ব রাজনীতি।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

ভারতের অন্য কোন প্রদেশ থেকে বাংলা কোনো প্রকার সাহায্য পায় নি। এমনকি সর্বাধিক সংখ্যক রাজবন্দীদের জন্যও তারা জেলখানায় জায়গা দেয়নি।

এই নতুন সময়ে বাংলার তপশিলি নেতা বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন অবিসংবাদী শূদ্র নেতা। তিনিই প্রথম বলেন, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের রক্ষা করা শূদ্রদের কাজ নয় ও মুসলমানদের সাথে শূদ্রদের শ্রেণীগত মিল অনেক বেশি। এই শূদ্র যোগেন মন্ডলই একমাত্র যিনি পাকিস্তানকে তাঁর স্বদেশ বলেছিলেন ও সেই কালবেলায় ভারতবর্ষ-ধ্যানটিকে রক্ষা করেছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত এখন। ১৯৩৭ তেকে ১৯৪৭ অবধি দশটি বছর তিনি ছিলেন বাংলার নমঃশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা। বাংলার ও ভারতের রাজনীতিতে পরে তিনি প্রধানতম বিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩এ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন। ৪৬-এ পুনর্নির্বাচিত হয়ে সারওয়ারদির মন্ত্রীসভাতেও। ১৯৪৬-এ তিনি মহম্মদ আলি জিন্না কর্তৃক অন্তবর্তী মন্ত্রীসভায় মুসলিম লিগের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতেরই শত্রু হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় চলে আসেন। আম্বেদকর ও যোগেন মন্ডল তাঁদের শূদ্রতার কারণে কোনো জাতীয়তাবাদেই গৃহীত হন নি। কিন্তু বহু নিন্দার পর কংগ্রেস দলিত-ভোটের জন্য আম্বেদকরকে জাতীয়-আখ্যানের দেবমন্ডলিতে জায়গা করে দেয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মন্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে স-ম-পূ-র্ণ মুছে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না।'' —'বরিশালের যোগেন মন্ডল', দেবেশ রায়

''...বাংলার নমঃশূদ্রদের এই অবিসংবাদী নেতা এক হৃতসর্বস্ব দলিত পরিবার থেকে শুধুমাত্র নিজের মেধা ও মননে উঠে এসেছিলেন প্রথমে বঙ্গীয় ও পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতির সামনের সারিতে। বরিশালের জল-নদী-খাল-বিল-আকাশ-মাটি যেমন তাঁকে গড়েছিল, তেমনই গড়েছিল তাঁর অস্পৃশ্য সমাজ এবং বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে সেই সমাজের তীব্র ও চিরন্তন অভিঘাত।...

যোগেন উপলব্ধি করেন, মুসলমানের রক্তে হাত রাঙিয়ে বর্ণহিন্দুদের দাঙ্গা থেকে রক্ষা করা কিংবা বর্ণহিন্দুর হয়ে লাঠি-সড়কি-বল্লম-কুড়ুল—নিয়ে মুসলিম মহল্লায় চড়াও হয়ে অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ, লুঠতরাজ ও হত্যালীলা চালানো কখনও, কিছুতেই বর্ণহিন্দুর অস্পৃশ্য নমঃশূদ্রদের দায় হতে পারে না। বরং বরিশাল, ঢাকা, যশোর, খুলনা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহে গরিব মুসলমানের সঙ্গে সহাবস্থানের অভিজ্ঞতায় নমঃশূদ্ররা দেখেছেন, বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের যতটা সামাজিক দূরত্ব, মুসলমানের সাথে ততটাই নৈকট্য। আর এখান থেকে যোগেনের মুসলিম-দলিত ঐক্যের ভাবনা ও তার নিজস্ব তত্ত্ববিশ্বে সেই ধারণার উত্তরণ।...

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ এড়াতে প্রতিবাদী আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মকে বরণ করেন। যোগেন কিন্তু এই সামাজিক অভিশাপের রাজনৈতিক প্রতিবিধান খুঁজে নেন দলিত-মুসলিম সংহতিতে এবং সে জন্য তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে হয় না।

এই মুসলিম সংসর্গ কখনও যোগেন মন্ডলকে নমঃশূদ্র তথা দলিতদের স্বার্থরক্ষার অবিচল ব্রত থেকে সরিয়ে নেয়নি, বরং দলিত স্বার্থের সুরক্ষার তাদিগই তাঁকে মুসলিম লিগের সংসর্গে টেনেছিল। কিন্তু সে জন্য তাঁকে তখনকার বঙ্গদেশে ক্রমশঃ মেরুকৃত ও সংহত হতে থাকা সমগ্র হিন্দু সমাজের নিন্দা ও শাস্তি শিরোধার্য করতে হয়। কায়েদ-এ-আজমের স্বপ্নভ্রষ্ট পাকিস্তানের উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িক বিবর্তনে হতাশ যোগেন কলকাতায় ফিরে এলে আবার অচ্ছুতই হয়ে যান—এবার বিভক্ত, হিন্দু বঙ্গের রাজনীতিকদের কাছেও। শেষ পর্যন্ত অনাদরে, অবহেলায়, গৃহশত্রুতায় দীর্ণ, ক্লিষ্ট যোগেন কোণঠাসা হতে থাকেন। এবং বিস্মৃতও।

সমসাময়িক দলিত নেতাদের চরম বিরোধিতা যোগেনকে সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন, আদতে হিন্দু নয় বলেই

তাঁরা বর্ণহিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য। হিন্দুত্বে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাকুলতা তাঁদের থেকেই যায়। পক্ষান্তরে যোগেন মনে করতেন, হিন্দুরা যখন তাঁদের লাখেরাজ স্বর্গের কাঁটাতারের বাইরেই অচ্ছ্যুৎদের বার করে দিয়েছে, তখন হিন্দু হওয়ার জন্য এই কাঙালপনা কেন? ভারতে ঘটে যাওয়া একের-পর-এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বর্ণহিন্দুদের স্বার্থে দলিতদের ব্যবহার করার ঘটনা দেখিয়ে দেয়, যোগেনের উপলব্ধিজাত ধারণা কত অভ্রান্ত ছিল। তাঁর তাত্ত্বিক সূত্র আত্মস্ত করতে পারলে আজকের দলিত রাজনীতি নিছক নির্বাচনী পাটিগণিতের স্বার্থে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের নিয়ে মায়াবতীর 'সর্বজনসমাজ'-এর খোয়াব দেখত না, বরং কাঁসিরামের সূত্র অনুযায়ী 'তিলক-তরাজু ঔর তলোয়ার/ইনকো মারো জুতে চার', এই শ্লোগানেই স্থিত থাকত।"—গৌতম রায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

"Even if India gets freedom, what she would do with this iretreavable loss of such a briliant and rare legal brain to politics."

—তদানীন্তন বরিশাল কোর্টের বিশিষ্ট উকিল কুলদারঞ্জন দাসগুপ্ত যোগেন মন্ডলের ওকালতি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগদানের পর।

''যোগেন মন্ডল বরিশালের মেগাস্থিনিস।''

---দুর্গামোহন সেন, সম্পাদক ও প্রকাশক, সেইসময়কার বরিশালের নামী সাপ্তাহিকী 'বরিশাল হিতৈষী'।

''লীগের তপশিলি প্রতিনিধি মন্ডল হয়েছেন আইনমন্ত্রী। তিনি গ্রামে গ্রামে তপশিলিদের রাজনৈতিক মিটিং করে বেড়ান।" —সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জকে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭।

''এটাকে আইনের আওতায় বিচার করলে সত্যি করেই প্রধানত সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার আনুপাতিক ভাগের কথা উঠবে। আমার মনে হয় না, মার্শাল ল জারি করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল বা গভর্ণর তা করতে অস্বীকার করায় অনানুগত্য দেখানো হয়েছে। আইনের দিক থেকে ও কমনসেন্সের দিক থেকে এটাকে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে, আলোচনার বিষয় হিসাবেই দেখা উচিত। আইনের খাঁচায় নয়।... কলকাতায় যা হয়েছিল। সিভিক অথরিটি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু নির্বাচিত সরকারকে তা জানায়নি। গভর্ণর তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি। কলকাতা, পাঞ্জাব, নোয়াখালি, বিহার—সর্বত্রই এই সন্দেহ তৈরি না হয়ে পারবে না যে সব পক্ষকেই কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-তপশিলি ভাগাভাগি সাব্যস্ত করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেটা দেখাতেও চাইছিলেন।"

---পাঞ্জাবে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তবর্তী সরকারের ক্যাবিনেট মিটিংএ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, জুন ১৯৪৭।

''আমি শিডিউলও না, হরিজনওনা। বামুন যদি জন্মপরিচয়ে বামুন হয়, আমি তা হলে আমার জন্ম পরিচয়ে চাঁড়াল। চাঁড়াল হিন্দু নয়। হিন্দুকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব নয়।"—যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বিধানসভার বক্তব্যে।

বরিশাল

একদা চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল অশ্বিনী দত্তের দেশ। এতদূরে এত দুর্গম একটি জেলাকে সারা বাংলায় যে প্রাধান্যে তিনি নিয়ে গেলেন, সে বরিশালবাসীর গৌরবকথা। জনসেবা, শিক্ষা, জাতিবৈরিতার অবসান, এক নাগরিক সমাজ তৈরি করে তোলার দরকার ও এক সামাজিক নৈতিকতা, তাঁর কাছ তেকে বরিশালবাসী শিখেছিল ও বরিশালের কাছ থেকে সারা বাংলা শিখতে চাইছিল। দূরত্ব ও দুর্গমতা হয়ত বরিশালকে এমন সমষ্টিবদ্ধ জীবন তৈরি করার পক্ষে দরকারি বিচ্ছিন্নতা দিয়েছিল। বরিশালের বিচ্ছিন্নতা ছিল বরিশালবাসীর একক বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। ও কতকটা উদ্ভট এক স্থানপ্রেমের অনড় অবলম্বন। বরিশালে ছিল সতীন সেনের মত সমাজসেবী এবং জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী নেতা। বিশিষ্ট সহজিয়া দার্শনিক আরজ আলি মাতব্বরের বাড়ি ছিল বরিশালের লামছরিতে। বরিশাল 'রূপসী বাংলা'র কবি জীবনানন্দেরও প্রাণভূমি। বরিশালের আরেক গর্ব চারণ কবি মুকুন্দ দাস।

বরিশাল খালবিলের দেশ, পঞ্চাশ পা যেতে হলেও সেখানে একটা খাল পেরতে হয় আর সেইসব খালে ভরা জোয়ারের জল সমুদ্র থেকে কলকলিয়ে বয়ে আসে প্রায় সব বাড়ির পৈঠায় দিনে বার কয়েক। বরিশাল জুড়ে নমঃশূদ্র আর মুসলমান জনগোষ্ঠী ছড়ানো। এখানকার বেশীরভাগ মুসলমান ফরাইজি। বামুন, কায়েত, বৈদ্যরা খুব নামডাক দিয়ে থাকতেন শহরগুলিতে। তাঁদের থাকার গ্রামগুলোও তাঁরা শহুরে করে নিয়েছিলেন। বরিশালের জমিদারির ব্যবস্থাও ছিল আলাদা। একজন মধ্যস্বত্বভোগীর জমি থেকে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে উপস্বত্বভোগীরা। জমিদার থেকে উপস্বত্বভোগীরা প্রায় পুরোটাই প্রায় ছিল, উচ্চবর্ণের হিন্দু। মুসলমান আর নমঃশূদ্ররা পুরোটাই প্রায় ছিলেন জমিদারির চাষী। কীর্তিপাশা, রায়েরকাঠি, বাটাজোড়, কোদালধোয়া, গৌরনদী, হিজলা, জলাবাড়ি আরো সব নামডাকের জমিদারি ছিল। ১৯২০ থেকে সরকার ভাঙনের নদীর চরে দখল মেনে নিতে শুরু করেন। সেই চরের দখল নিতে জমিদাররা এই নমশূদ্র আর মুসলমান জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতো। তখন থেকেই এই স্থলদেশে মারামারি-কাটাকাটির জায়গা হয়ে যায়। কিন্তু তাতে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি ছিল না। জমিদাররা নিজ স্বার্থে মামলা-মোকদ্দমা-অশান্তি লাগিয়ে রাখত। জমির দখল নিয়ে 'নমঃ' ও 'শ্যাখ' বা 'মেয়াদের' মধ্যে কাজিয়া-বিবাদ লাঠালাঠি-খুনোখুনি হলেও কোন অসদ্ভাব ছিল না। তারা এক সাথেই বসবাস, কৃষিকাজ, মাছধরা, নৌকো বাওয়া প্রভৃতি কাজ করে যেত। একসাথে চলত আনন্দ অনুষ্ঠান।

বরিশালের এক জলময় পশচাদভূমির সঙ্গে বরিশাল শহরের সম্পর্ক ছিল একেবারে আষ্টেপৃষ্টে। পুবে আড়িয়াল খাঁ, পশ্চিম কীর্তনখোলা নদী। দুটো জুড়ে দেওয়া মাঝারি এক নদী। সদরে বাংলা খ্যাত ব্রজমোহন কলেজ, হাইস্কুল, ব্রাহ্মসমাজ, স্বদেশী আন্দোলন, পত্রপত্রিকা, কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল, কলকাতার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ। মিটিং, মিছিল। ১৯০৬-র

আলোড়নকারী প্রাদেশিক সম্মেলন। তারপর ১৯২১এ আবার প্রাদেশিক সম্মেলন।

নদী বন্দর গুলি দিয়ে চাঁদপুর, ঢাকা, চিটাগাঙ, খুলনা বাংলার সর্বত্র স্টীমার সার্ভিস, খুলনা থেকে শিয়ালদা ট্রেন। বরিশালের বিখ্যাত বালাম চাল, নারকেল, সুপারি, ইলিশ, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ, ফলফলাদি। উপছে পড়া আরো কত ধরনের মাছ নদী, খাল, বিল, পুকুরে। কত ধরনের মাছ ধরার জাল, কত ধরনের নৌকো। লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ। অসংখ্য নদী। ছোটো বড়ো। নিজস্ব কথ্য ভাষা, রস-রসিকতা, আচার-সংস্কৃতি, পার্বন উৎসব। পুষুড়্যা বা পৌষ-পার্বন ছিল প্রধান উৎসব। চিতৈ পিঠা, সরা পিঠা, চুষি, পুলি, পাটিসাপটা প্রভৃতি চালের গুঁড়ো, নারকেল, দুধ, খেজুর গুড়ের তৈরি পিঠে-পুলি ছিল প্রধান আকর্ষণ। ছিপ, ট্যবইরা, গোলা নৌকো, পাটের নৌকো, ঘাসের নৌকা, পানসি, কাথানি, তালের ডিঙি, ডিঙি, সুপারিগাছের নৌকো, কাডামি, বাছারি থেকে গহনার বড় নৌকো। নৌকার উত্তেজক বাইচ প্রতিযোগিতা হত। কীর্তন প্রভৃতি ছাড়াও মাঝিদের ভাটিয়ালি, মনসামঙ্গল অবলম্বনে রয়ানি, ধান পোঁতার সারিগান, বিয়ের গান, মুর্শিদি, মারফতি, ধান ভানার গান, বাওয়ালি গান, জারি গান প্রভৃতি ছিল জনপ্রিয়। বিশেষ করে কবিগান আর যাত্রা। বিজয় সরকার, রাজেন সরকার প্রমুখরা ছিলেন বড় কবিয়াল। মৃৎশিল্প, তৈজস ও আসবাব নির্মাণ, কাঁসা, পিতল শিল্প, নকশিকাঁথা, লবণ শিল্প, ছোবড়া শিল্প, চাঁচ শিল্প, পাটি শিল্প, শোলা শিল্প, হোগলা শিল্প প্রভৃতি ছিল লোকশিল্প।

এ. কে. ফজলুল হক

ছপছপানো জলে বিছন ছিটনো ধান হত সারা বছর। ছিটান শালি, গুড়জালি, পুঁটি ধান, খৈশিষ, হাওরের আগুরি, চলনবালাম, কাটারি কত ধানের নাম। সেই পাহাড়তলির সোলা নাইয়ের ঝিল থেকে, পশ্চিমের দিকের উত্তরে পাবনা-রাজশাহি জোড়া চলন বিল থেকে, সিলেটের বাওর বিল থেকে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোরের বিস্তৃত বিলাঞ্চলে এদের চাষ। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, আয়েত্রী, করতোয়া, ধলেশ্বরী, কীর্তনখোলা, ভৈরব, মধুমতী, বেহুলা, বংশী, লৌহজং, তেঁতুলিয়া, মলঙ্গী, কুমার, আড়িয়াল খাঁ, লোহালিয়া, পাঙাসিয়া, রাজগঞ্জ, কর্ণফুলি, ফেনি, তিতাস, সন্ধ্যা, বলেশ্বর নিয়ে এই বিস্তৃত পূর্ববঙ্গের নদীময় বিভাগ। বোহালিয়া, গলাচিপা, বারনাবাদ, কচা, কালিগঙ্গা, বিনাদপুর, বিষখালি বিধৌত জলময় বাংলার শেষ বদ্বীপ অঞ্চল বরিশাল।

বরিশালের লোকবাদ্য ছিল ঢোল, খোল, করতাল, দোতারা, জলতরঙ্গ, কলম তরঙ্গ, বাঁশের বাঁশি, শঙ্খ, শিঙা, খঞ্জনি, সারিন্দা। ডঙ্কা, কাঁসর, একতারা। লোক উৎসবের মধ্যে বিয়ে, মেলা, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল। কৃষিকাজ ছাড়াও লোকপেশাগুলি ছিল : ওঝা, কলু, চুনারি, করাতি, কুমার বা কুম্ভকার, কামার বা কর্মকার, চামার/চর্মকার/ঋষি/মুচি, গাছি। গুনিন বা গণক, ঘরামি, ধোপা, জিয়ানি। ধুনকর, নলুয়া, নইক্দা, নাপিত, নৈচাবান্দ, পাটিয়াল। বাওয়ালি, বেদে, ময়রা, মাঝি, মিস্ত্রি প্রভৃতি। মাছ ধরা ছিল বাচ্চা বৃদ্ধ নারীদের এক সহযোগী পেশা। নদী, খাল, বিলে সম্বৎসর মাছ ধরা চলত। মাছ ছিল এক সহজলভ্য সুস্বাদু খাদ্যপ্রাণের যোগান। বহু রকম মাছ পাওয়া যেত। ভেটকি, ভোলা, আড়, বোয়াল, চিতল, পাঙাস, কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, কই, মাগুর, শোল, ট্যাংরা, পাবদা, পুঁটি, সরপুঁটি, খলসে, মৌরালা, ফ্যসা... নানারকম চিংড়ি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কচ্ছপ, কাঁকড়া ও পাখি, পাঠা-খাসি-মুরগি রান্না হত অনুষ্ঠানে। আবার তাদের ধরার জন্য বহুরকম জাল ও সরঞ্জাম ছিল যেমন ছিপ, ঝাঁকি জাল, ধর্মজাল, মৈয়াজাল, খরা বা চাপা জাল, কৈয়া জাল, বেড়জাল, ইলশা জাল, বোডাজাল, পলো, চাঁই, খুচইন, কোঁচ, ওচা, ছাপি। নেশা বা মদ্যপ্রাণের প্রচলন ছিল না। কৃষক মাঝিরা হুকোয় অনেকে তামাক খেতো, কেউ কেউ বিড়ি, বাবুদের কেউ কেউ সিগারেট। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল না। পুরুষদের মধ্যে স্ত্রীবিয়োগের পর কেউ কেউ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করতেন। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের পর বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়। পিরোজপুরের নমঃশূদ্র সমাজসেবী অগ্নি রায় একাই দু হাজারের বেশি বিধবা বিবাহ দেন। তবে বাল্য বিবাহের সমস্যা ছিল। আমন, আউস ও বোরোধান হত অন্তত ১০০, ২২ ও ১০ রকমের। না লাগত জলসেচ, না সার, না কীটনাশক। আমন পাকত অগ্রায়ণে, আউস আষাঢ়ে, বোরো ফাগুনে। নদী বোট ও স্টীমারগুলিতে গরম ভাত আর ফাউল কারি এবং বরিশাল শহরের হোটেলগুলিতে ইলিশ রান্নার স্বাদ ছিল জগদ্বিখ্যাত।

বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা—ছয়টি জেলা নিয়ে নদীমাতৃক বরিশাল ডিভিশন অবিভক্ত বঙ্গে বরিশাল বা বাখরগঞ্জ নামে অবিভক্ত ছিল। জেলার দক্ষিণ পূর্ব দিকে মেঘনা, তেঁতুলিয়া, খয়রাবাদ, শাহবাজপুর, আগুনমুখী প্রমুখ বৃহদাকার নদীগুলি অসংখ্য ছোট বড় বদ্বীপ সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে তেমনি দক্ষিণপশ্চিমে বিষখালি, পায়রা, মঠবেড়িয়া, হরিণঘাটা প্রভৃতি নদীও তৈরি করেছে অসংখ্য ছোট ছোট বদ্বীপ। এখানকার কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকত এখন বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। খুলনার দক্ষিণ অংশ ও বরিশালের দক্ষিণের কিছু অংশ নিয়ে সুন্দরবন। গভীর জৈববৈচিত্র্যপূর্ণ অরণ্য। এক সময় এবং এখনও কাঠ, মধু, মাছ প্রভৃতি সংগ্রহ করে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করেন।

নমঃশূদ্র

মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ও রাজবংশী এই তিনজাত মিলে মোট বাঙালির প্রায় তিনভাগের একভাগ। ১৯১১-র সুমারিতে বাংলায় নমঃশূদ্রের সংখ্যা গোনা হয়েছিল প্রায় ২১ লক্ষ। এর মধ্যে আট লাখেরই বাসভূমি ছিল বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ ফরিদপুর, নড়াইল, মাগুরা,

খুলনা, বাগেরহাট মিলিয়ে যে ডাঙা সেখানে। নমঃশূদ্রদের যারা নেতা ছিলেন তারা যদি বা ১৯২০-'২৫ সালে জনগোষ্ঠীভিত্তিক নানারকম আন্দোলন করেছেন। সেসব আন্দোলন বেশীরভাগটাই ছিল হিন্দু বর্ণসমাজে নমঃশূদ্রদের জায়গা ওপরের দিকে তোলার চেষ্টা। '৩০ সাল নাগাদ সেই নেতারা কৃষক নমঃশূদ্রদের নিয়ে মাথা ঘামাননি। তখন কাউন্সিল, লোকাল বোর্ড আর ডিস্ট্রিক বোর্ডে ঢোকার হাওয়া। নমঃশূদ্রদের নেতাদের অনেকেই কংগ্রেসেরও নেতা হয়ে গেছিলেন—কেশবচন্দ্র দাস, মোহিনী মোহন দাস। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতা বিশিষ্ট উকিল মৌলবি ফজলুল হক, তিনি বরিশালের চাখারের বাসিন্দা, কৃষক প্রজা পার্টি তৈরি করে মুসলমান রাজনীতির এই ফাঁকটি ভরাট করলেন। মুসলিম লিগ ছিল মুসলমান নবাব-জমিদার-ব্যবসায়ীদের এবং কংগ্রেস ছিল বর্ণহিন্দু রাজা-জমিদার-ব্যবসায়ীদের দল। এমনকি অশ্বিনীকুমারের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র অর্ধেক নেতাই ছিলেন জমিদার।

নমঃশূদ্র নেতারা বর্ণাশ্রম ও শূদ্র দাসত্ব নিয়ে সেভাবে ভাবেন নি। ১৯৩৫-র 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা গঠন এবং 'কমিউনাল এওয়ার্ড' মেনে মুসলমান, শিখ, তপশিলি, ইউরোপীয়ান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রমুখদের জন্য আসন সংরক্ষিত রেখে ১৯৩৭এ প্রায় সার্বজনীন ভোটাধিকার নিয়ে যে ভোট হল—সেটাকে উপলক্ষ করে বরিশালে নমঃশূদ্রদের নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়ে গেল নিজে থেকেই। সেই নেতৃত্বের প্রধান ও প্রথম ব্যক্তি—যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, বি.এ., বি.এল.। যিনি কলকাতা থেকে ওকালতি পাশ করে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে খানদানি বরিশাল বারে ঢুকে বছর খানেকেরই মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা জিতে এবং স্বকীয় আইনসঙ্গত দক্ষ সওয়াল করে নামযশ করে ফেলেছেন, আবার আইনসভার প্রার্থীও হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য ইউনিয়ন ও ডিস্ট্রিক বোর্ডের মেম্বার। আবার দাঁড়িয়েছেন তপশিলি সংরক্ষিত নয় সাধারণ আসনে। বিপক্ষে দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রার্থী বাটাজোড়ের জমিদার, অশ্বিনী দত্তের ভাইপো এবং কংগ্রেস জেলাসভাপতি সরল কুমার দত্ত। নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের এবং সমর্থনকারী উচ্চবর্ণের একাংশের ভোটে পরিশ্রমী ও কাজের মানুষ যোগেন্দ্রনাথ অসাধ্য সাধন করলেন। সারা ভারতে তিনিই একমাত্র তপশিলি প্রার্থী যিনি সাধারণ আসনে জিতে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় গেলেন। স্বতন্ত্র তপশিলি হিসাবে। এছাড়াও তাঁর ভোটারদের মধ্যে ছিল বাগরি, ধনন্তরী, কৈবর্ত, জোলা, ধোপা, মালো, দুলে, যুগি প্রমুখ নিম্নবর্গীয় ও পশ্চাদবর্তী জাতগুলি। জেতার পর বরিশাল শহর সহ বরিশাল জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যোগেন্দ্রনাথ বিপুল অভ্যর্থনা পান। রব ওঠে : ''জয় যোগেন মন্ডল জয়।'' এর আগে ১৯২৫এ অগৈলঝরাতে ভেগাই হালদারের নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে প্রজা সম্মিলনী হয় তাতে যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান এবং তিনি বিদায়ী বক্তব্য রেখেছিলেন।

ক্ষমতা মানে হিন্দু উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণের, ক্ষমতা। তাই ক্ষমতাবান হওয়ার একটাই অর্থ—হিন্দু হওয়া, উচ্চবর্ণ হওয়া ও ব্রাহ্মণ হওয়া। নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠাই তো নমঃশূদ্রদের মননচর্চার প্রধান বিষয়। সেই বিষয় নিয়েই প্রমাণপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে। বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণবাদ যে ব্রাহ্মণরা মেনে নেননি, তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল—আমরা নমঃব্রাহ্মণ না আমরা নমঃশূদ্র। তারপর তারা জলময় বাংলার জলে আত্মগোপন করলেন। ইতিহাসের এমন ব্যাখ্যার আরও কত সংস্করণ হয়েছে। সমস্ত সংস্করণের উদ্দেশ্য একটা কথাই প্রমাণ করা—নমশূদ্ররা শূদ্র নয়। নমশূদ্ররা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ—বল্লাল সেন কনৌজি ব্রাহ্মণদের পরামর্শে তাদের পতিত বলে শূদ্র করে দেন। নমঃশূদ্ররা চণ্ডাল নয়—কারণ চণ্ডালদের মত তারা গ্রামের বাইরে বাস করে না, চণ্ডালদের মত তারা ভাঙা মালসায় ভাত খায় না। খাওয়ার সময় জলপান চণ্ডালদের পক্ষে নিষিদ্ধ, নমঃশূদ্রদের পক্ষে নয়। নমঃশূদ্ররা চণ্ডালদের মত কেবল মরা মানুষের কাপড়চোপড়ই পরে না, কালো লোহার বালাও পরে না। নমঃশূদ্ররা অবৈদিক ব্রাহ্মণ, তাই নমঃশূদ্রদের উপবীত ধারণ। এই আত্মপরিচয় তো উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ১৯৩৭-'৪৭এ নমঃশূদ্রদের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের উত্থানের আগে, সমসময়ে ও পরে হয়ে এসেছে। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, তারকচন্দ্র, গোপাল সাধু, হরিবর, মহানন্দ—এরা নমঃশূদ্রদের আধ্যাত্মিক আভিজাত্য রক্ষা করে এসেছেন, 'মতুয়া ধর্ম' প্রবর্তন করেছেন। আর এঁদের দেখে ও এঁদের ক্ষমতা-সংজ্ঞার সীমার মধ্যে, কুমুদবিহারী মল্লিক, শশিভূষণ ঠাকুর, রাধামোহন মন্ডল, ভগবতী ঠাকুর, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, মহানন্দ হালদার, মুকুন্দ মল্লিক ও আরো অনেকে উচ্চশিক্ষার শেষে বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি এনে নিজেদের হিন্দু উচ্চবর্ণের সমতুল্য করে তোলার চেষ্টা করেন।

আবার অগৈলঝরার মহাত্মা ভেগাই হালদারের মত নমঃশূদ্র জাগরণের প্রাণপুরুষরা ছিলেন। ভেগাই হালদার ছিলেন প্রায় নিরক্ষর। ভারতের সব তীর্থ ঘুরে এসে, নিজের বাড়িঘর পরিবার থাকা সত্ত্বেও অগৈলঝরার হাটের ওপর একটি খড়ের ঘর বানিয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন অশ্বিনীকুমারের একান্ত সহচর। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বরিশালের নমঃশূদ্রদের তিনি সমাবেশিত করেন। ১৯০৬র অগৈলঝরাতে প্রজা সম্মেলনের ছিলেন প্রধান কর্মী এবং ১৯২৫-র অগৈলঝরাতে প্রজা সম্মেলনের প্রধান সংগঠক যেখানে মদনমোহন মালব্য, সরলা দেবী প্রমুখেরা যোগ দিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা তাকে গুরুত্ব দিতেন। স্বজাতীয় ও সহজাতীয়দের শিক্ষা বিস্তারে তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে একটি প্রাইমারি ও একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

নমঃশূদ্রদের সেই সময় প্রতিষ্ঠিত নেতারা ছিলেন : যশোর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, কংগ্রেস নেতা ও এম.এল.এ. এবং পুণে প্যাক্টে স্বাক্ষরকারী রসিককৃষ্ণ বিশ্বাস; লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ও পুণে প্যাক্টে স্বাক্ষরকারী বিরাট মণ্ডল; যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, রাইচরণ বিশ্বাস, ডাঃ মোহিনী মোহন দাস, জগৎ মন্ডল প্রমুখ। বনমালি দাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'নমঃশূদ্র শিক্ষা

সমিতি' এবং কলকাতায় নমঃশূদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বাণীভবন' মেস বাড়ি গঠন করেন।

গ্রামে নমঃশূদ্রদের পোশাক ছিল আট হাতি কোঁড়া ধুতি, লাল পাড়। সারা দিন ক্ষেতখামার, বিল হাওর, নদীনালায় কায়িক পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় কীর্তন বা নামগান ছিল পরিচিত। মাঝে মাঝে বাতাসার হরির লুঠি বা গাজিবাবার সিন্নি বিতরণ।

তাদের বেশীরভাগেরই জমি না থাকলেও বা অল্প জমি থাকলেও উর্বর জমি, জল ভরা মাছ প্রভৃতি কারণে খাওয়াদাওয়ার অভাব ছিল না।

নমঃশূদ্ররা ছিল প্রধানত কৃষক এক গোষ্ঠী। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার বদ্বীপ অঞ্চলে তারা কিভাবে এল তা নিয়ে নানা মত আছে। কেউ বলেন ১৭৬৯-'৭৫-র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া অঞ্চল থেকে খাদ্যের সন্ধানে এরা আসেন। আর এখানকার বিলগুলির উৎপত্তি সম্ভবত ১৭৭৮-র দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বিধ্বংসী বন্যার ফল। সেই থেকেই তৈরি হয় নিচা ও উঁচা ভৈরবের বিল, বাগিয়া বিল, মাতলা বিল, কুমারের বিল, দুর্গাদহের বিল। শিব-আত্রাইয়ের বিল, চলন বিল, গোদাই বিল প্রমুখ।

হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য উচ্চবর্ণের বানানো—মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে। ১৯২২এ বাথাডাঙ্গা হাটে কংগ্রেসি-খিলাফতিদের সাথে বয়কটবিরোধী শূদ্দুরদের লড়াই হয়েছিল। ১৯২৩-'২৬ হয়েছিল পদ্মবিলে নমশূদ্র-মুসলমান যুদ্ধ। অনেকে বলেন মুসলমানরা ধর্মান্তরিত শূদ্র। তবে এটি ঘটনা যে জমিজিরেত নিয়ে মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হলেও মুসলমান-নমঃশূদ্রদের মিলমিশই ছিল বেশী। উভয়েই ছিল গরীব কৃষক। একসাথে থাকা, খাওয়া, কাজ করা। বিপদ-আপদ- আনন্দ-উৎসব এক সাথে ভাগ করে নেওয়া। উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারাও ছিলেন কর্মঠ, দক্ষ এবং অনেকাংশে স্বাধীন। খোলসচন্দ্র প্রমুখের লেখায় পাওয়া যায় বরিশালে উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি যবনী (মুসলমান নারী) ও শূদ্রাণী খেয়ামাঝি ছিল।

সুভাষ চন্দ্র বোস

১৯২১-র গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে নমঃশূদ্ররা ছিল বিপক্ষে। ততদিনে নমশূদ্রদের মধ্যে বহুদিন কাজ করা খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রভাবে অনেকেই শিক্ষিত। আবার ধর্মান্তর রুখতে নমঃশূদ্রদের মধ্যে ভক্তিবাদী মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গুরু গুরুচাঁদ নমঃশূদ্র সমাজের একাংশের মধ্যে ধর্মীয় নেতা ও গুরুর মান্যতা পেয়েছেন। সৎ চাষি থেকে সদগোপ, নবশাখের মত 'চণ্ডাল' থেকে 'নমঃশূদ্র' শব্দবন্ধে উত্তরণ হয়েছে। এতে একদিকে জনগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, পাশাপাশি মনুস্মৃতির অন্তর্গত বর্ণভেদ প্রথাকেও বজায় রাখা হয়েছে। গুরুচাঁদ বলেছিলেন অসহযোগে ভদ্দরলোকদের কি আসে যায়। এক ভাই উকিল, এক ভাই মাস্টার, এক ভাইয়ের ব্যবসা। উকিল গেল অসহযোগ করে জেলখানায়, মাস্টার নিল সংসারের দায় আর ব্যবসায়ী খদ্দর বেঁচে লাভ করল। এগুলো তাদের সাজে। নমঃশূদ্ররা চাষ ছেড়ে অসহযোগে গেলে, তার সে বছরের চাষ তো গয়া-গঙ্গা। নীরদ মল্লিক কাউন্সিলে বিরোধিতা করলেন। বাখরগঞ্জে কংগ্রেসের ডাকা হরতাল নমঃশূদ্র বাজারিরা ভেঙ্গে দিল। পটুয়াখালিতে পুলিশ-নমঃশূদ্ররা মিলে ভাঙ্গার চেষ্টা করল। উত্তর কলকাতায় স্বদেশী মিছিলে ধাঁঙর, ডোম, মেথররা ঢিল ছুঁড়ল। পিরোজপুরে প্রিন্স অফ ওয়েলসের আগমন উৎসব নমঃশূদ্ররাই ভরিয়ে দিল। ১৯২২এ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেবার পর শুরু হল নানা আকারের নমঃশূদ্র সম্মেলন। দাবি উঠল জমির খাজনার হারের এবং জমির মালিকানার বদল চাই। ভীষ্মদেব মন্ডল কাউন্সিলে নমঃশূদ্রদের শিক্ষা ও চাকরির দাবি তুললেন। আবার নমশূদ্রদের রাজনীতির ভাগাভাগিও শুরু হল। বয়কটের পক্ষে-বিপক্ষে, বিধবা বিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে।

উচ্চবর্ণের কাছ থেকে পাওয়া শান্তিহীন অপমান সত্ত্বেও নমঃশূদ্র সমাজের অনেক প্রধান ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত হয়ে বামুন-কায়েত সাজার চেষ্টা করলেন। মল্লিক ভাইরা ব্রিটিশ স্থাপিত কাউন্সিল ও হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসী রাজনীতির ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র পি. আর. ঠাকুর বিলেত থেকে ব্যরিস্টারি পড়ে এসেও উপবীত ধারণ করে পারিবারিক ধর্মীয় বাণিজ্য-সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করলেন। গড়ে তুললেন মতুয়া মিশন। সেখানে দৈব চিকিৎসা, এমনকি মহাজনি ব্যবসা শুরু হল। পাশাপাশি রাজনীতির প্রাঙ্গণটিও দখল রাখলেন কংগ্রেসের বিধায়ক হয়ে। দেড়শ দুশো বছর আগে নাকি নমশূদ্ররা জেলখানার মেথরের কাজ করত। পরে বিহার থেকে আসা মেথররা এই বৃত্তিটা নেয়। সেই নমশূদ্ররা ধাঁঙরের ছোঁয়া খায় না, ধাঁঙররা আবার চামারের ছোঁয়া খায় না।

যোগেন্দ্রনাথ

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার মৈস্তারকান্দি গ্রামে এক দরিদ্র নমঃশূদ্র যৌথ পরিবারে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের জন্ম। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই, দুই বোন। যোগেন্দ্রনাথের বাবার নাম রামদয়াল মন্ডল। পারিবারিক পেশা ছিল নৌকার মিস্ত্রির কাজ। এ ছাড়াও বিল অঞ্চলে অল্প কিছু জমিতে ভাগ চাষ। তাঁদের অভাবী পরিবারের সকলের কায়িক শ্রমে কায়ক্লেশে কোনরকম সংসার চলত। অল্পবয়সে যোগেন্দ্রনাথ মাতৃহারা হন। বড় কাকিমার কাছে মানুষ। তাঁর আগে তাঁদের পরিবারে কেউ সেভাবে পড়াশুনার সুযোগ পান নি। প্রবল দারিদ্র ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র যোগেন্দ্রনাথ স্থানীয় জলিল মাস্টারের পাঠশালা হয়ে অগৈলঝরা প্রাথমিক স্কুল থেকে ক্লাস টু অবধি পরে তারপর বারথি তারা স্কুল থেকে গণিত ও সংস্কৃতে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তারপর বরিশাল শহরের বিএম কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলকাতার ল কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.এল. পাশ করেন। পড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ

জোগাতে তাঁদের স্থানীয় কিন্তু সারা দেশে প্রচলিত চাঁদসি ক্ষত চিকিৎসা, গৃহশিক্ষকতা, প্রুফ দেখা, শিয়ালদা কোর্টে দরখাস্ত লেখা বহু ধরনের কাজ করতে হয়। স্কুলে থাকার সময়েই অশ্বিনীকুমার দত্তের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সেবার কাজ শুরু করেন এবং 'লিট্‌ল ব্রাদার্স অফ দি পুওর' সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৯১৯-র বরিশালের সাইক্লোনে দক্ষিণে পটুয়াখালির দশমিনা, গলাচিপা অঞ্চলে ত্রাণ কার্য চালান। বার্থা তারা স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যোগেন্দ্রনাথের পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। নতুবা সমস্ত উচ্চবর্ণের ছাত্রের মধ্যে একটি 'চাঁড়াল' ছাত্রের টিকে থাকা সম্ভব হত না। কলকাতায় বি.এ. ও বি.এল. পড়ার সময় যোগেন্দ্রনাথ থাকলেন তাঁর স্বজাতীয় বিশিষ্ট চাঁদসি চিকিৎসক ডাঃ প্যারীমোহন সরকারের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে। ডাঃ সরকারের দুইপুত্র পরিমল ও সুবিমলকে পড়াতেন। এম.এল.এ. নির্বাচিত হওয়ার পরও ডাঃ দাসের বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। পরিমল ও সুবিমল তাঁদের মামা যোগেন্দ্রনাথের আপ্ত সহায়কের কাজ করত। বরিশাল কোর্টে ওকালতির সময় এবং পরবর্তীতে বরিশাল গেলে যোগেন্দ্রনাথ মোক্তারবন্ধু প্রহ্লাদ দত্তের বাড়ি থাকতেন। বি.এম. কলেজে পড়ার সময় হস্টেলে থাকতেন এবং শূদ্র ছাত্রদের সরস্বতী পুজো করার অধিকার নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতেন। তিনি উকিল, বক্তা ও বিধায়ক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। শোনা যায় তিনি প্রবল রসিক ছিলেন এবং ভালো পালাগান করতেন।

সততা, নিষ্ঠা, সংগ্রামী জীবন, পরোপকার, সমাজসেবা, তীক্ষ্ম মেধা ও স্মৃতিশক্তি, গভীর পাণ্ডিত্য, আইনি বুদ্ধি, চমৎকার সওয়াল-জবাব, নিজে স্বতন্ত্র তপশিলি বিধায়ক হলেও সমস্ত রাজনীতিকের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। অশ্বিনী দত্ত, ভেগাই হালদার থেকে ফজলুল হক, মহম্মদ আলি জিন্না অনেকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কিন্তু সবচাইতে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে। শরৎ বোসের উৎসাহে যোগেন্দ্রনাথ রাজনীতির পাশাপাশি হাইকোর্টে ল প্র্যাকটিশ শুরু করেছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্ত্রী কমলা ও একমাত্র পুত্র জগদীশ দেশে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তপশিলি ও নমঃশূদ্রদের এগিয়ে নিয়ে চলা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।

যোগেন্দ্রনাথের রাজনীতি

১৯৩৭-র নির্বাচনের পরপরই বাংলার দাপুটে নেতা এবং সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, যিনি পটুয়াখালি কেন্দ্রে হেভিওয়েট মুসলিম লিগ প্রার্থী খাজা নাজিমুদ্দিনকে পর্যুদস্ত করেন, যোগেন্দ্রনাথকে আহ্বান জানান তপশিলি ব্লক করে ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সরকারকে সমর্থন করতে। ফজলুল হক যোগেন্দ্রনাথের চাইতে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, যোগেন্দ্রনাথকে খুব পছন্দ করতেন এবং তাদের সুসম্পর্ক অটুট ছিল। হক সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও যোগেন্দ্রনাথ ক্ষমতায় টিকে থাকার তাদের অনীতিনিষ্ট ও ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থান সমর্থন করেননি এবং প্রস্তাব পেয়েও মন্ত্রীত্বে যোগ দেননি।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও কৃষকদের ঋণ মকুবের মত জনপ্রিয় দাবিতে একচ্ছত্র মুসলমান ভোট পেয়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি মুসলিম লিগকে হারিয়ে দেয়। কংগ্রেস-প্রজাপার্টি সরকার অনায়াসে বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গড়তে পারত। কিন্তু সংযুক্তপ্রদেশকে প্রাধান্য দিয়ে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস হাইকমান্ড যৌথ মন্ত্রীসভার প্রস্তাব বাতিল করেন। তখন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর উদ্যোগে প্রজাপার্টির সরকারকে সমর্থন প্রস্তাবও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা নলিনী সরকার, বিধান রায়, তুলসী গোস্বামী, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস নেতারা ভেস্তে দেন।

গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে, জাতিভেদ প্রথা অবসানের জন্য কোন আমরণ অনশন করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ সরকার যখন তপশিলিদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন তখন এর বিরুদ্ধে গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করে দেশজুড়ে এক সঙ্কট তৈরি করলেন। তখন কিছুটা বাধ্য হয়ে আম্বেদকর একটি মাঝামাঝি সমঝোতায় গেলেন। সই হল পুণে প্যাক্ট (১৯৩২)। এর ফলে আলাদা তপশিলি সংরক্ষিত আসন হল, কিন্তু নির্বাচনকারীরা থাকলেন শুধু তপশিলিরা নয় সকলেই। আসনসংখ্যাও কমল।

১৯৩৭এ বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩২ জন তপশিলি প্রার্থী বিধায়ক হন এবং তার মধ্যে ১৩ জন ছিলেন নমঃশূদ্র। তাঁরা মিলে তৈরি করলেন 'বেঙ্গল অ্যাসেমব্লিজ ইনডিপেনডেন্ট শিডিউল কাস্ট মেম্বার্স লিগ' যার সভাপতি হলেন হেমচন্দ্র নস্কর ও সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।

কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী নেতৃত্ব কৃষক প্রজাপার্টিকে সমর্থন না দেওয়ায় মন্ত্রীত্বলোভী নলিনীরঞ্জন সরকারের মধ্যস্থতায় হক সাহেবের সাথে মুসলিম লিগের বোঝাপড়া হয় এবং মুসলিম লিগ, ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো-ইনডিয়ান বিধায়কদের সমর্থনে হক সাহেব বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন এবং মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভায় কৃষক-প্রজাপার্টি বিরোধী মুসলিম লিগের বহু নবাব-জমিদার মন্ত্রী হন। প্রবল হক বিরোধী নাজিমুদ্দিন, সোরয়াবর্দি সহ। হিন্দুদের মধ্যে মন্ত্রী হন নলিনীরঞ্জন সরকার, বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, শ্রীশ কুমার নন্দী, প্রসন্ন কুমার রায়কত ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক। মন্ত্রীসভা ঘোষণার সময় গভর্ণর হাউসে আমন্ত্রণ জানিও যোগেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী করা হয় না। বিভিন্ন কিসিমের পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি ও দল যোগ দেওয়ায় এই মন্ত্রী সভা প্রথম থেকেই ছিল নড়বড়ে, ক্ষমতাও ছিল সীমিত এবং ব্রিটিশ গভর্ণরকেন্দ্রিক।

এবার ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমর্থনে না পারা যাচ্ছিল ব্রিটিশ লগ্নী পুঁজির বিপক্ষে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে সিদ্ধান্ত নেওয়া অন্যদিকে মুসলিম লিগের যোগ দেওয়ায়

না পারা যাচ্ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া। ফলে সম্পাদক সামসুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রজাপার্টির ভাঙ্গন ঘটে। এর উপর নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে চলছিল সরকারকে ফেলে দেওয়ার লাগাতার চক্রান্ত। সেইসময়ের প্রধান সংবাদপত্রগুলিও ছিল রাজা-নবাব-জমিদার ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। হয় হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসের অথবা মৌলবাদী মুসলিম লিগের সমর্থক।

যোগেন্দ্রনাথ ক্রমশ আইনসভার বিষয়গুলি রপ্ত করার চেষ্টা করছিলেন। বহু জটিলতা, বহু নিয়মকানুন। বহু প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বাদানুবাদ, বিরোধিতা, ফন্দিফিকির, লবিভাগ...। স্পিকার নির্বাচন নিয়ে অচলাবস্থা। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ, পাবলিক গরম করা। তলে তলে ব্রিটিশ সওদাগরি সংস্থা—নবাব, রাজা, জমিদার—ব্যবসায়ী—মন্ত্রীদের নিজ স্বার্থরক্ষা। তপশিলি বিধায়করা বিভক্ত ও অন্যের বাহক। বিরাট মন্ডল প্রজাপার্টির হুইপ, মুকুন্দ মল্লিক মন্ত্রী, রাধাকান্ত দাস কংগ্রেসের ডেপুটি হুইপ। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য ও আইনি যুক্তি দিয়ে তপশিলিদের স্বার্থে অবস্থান নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জমিদারি কাছারিতে তপশিলি প্রজাদের প্রতি অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ রোধে তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাব কংগ্রেস বিধায়ক মীরা দত্তগুপ্ত সমর্থন করেন। বিধানসভার সেশন শেষ হওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথ বরিশাল ফিরে জেলাপ্রশাসন ও জেলার নেতৃত্বস্থানীয়দের নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সমস্ত সরকারি ব্যবস্থায় তপশিলি সংরক্ষণ চালু করা, অগৈলঝরা স্কুলকে মডেল স্কুল গড়া সহ নমঃশূদ্র এলাকায় আরও স্কুল—কলেজ স্থাপন, মাইলারার পশ্চিমে খাল কেটে জল বের করে চাষের জমি বের করা। যোগেন্দ্রনাথের শ্বশুর খাগবাড়ির প্রহ্লাদচন্দ্র বারুই অগৈলঝরা স্কুল নির্মাণে প্রথম অর্থদান করেন। যোগেন্দ্রনাথ সহযোগীদের নিয়ে তাঁদের গৌরনদী সংলগ্ন স্বজাতি অধ্যুষিত ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ, পদ্মবিল, মতুয়া পীঠস্থান ওরাকান্দি প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন।

বর্ণহিন্দুরা চিরটাকাল নমঃশূদ্র, রাজবংশী, ধাঁগুর, মেথর, ডোম সহ শূদ্রদের উপর অত্যাচার শোষণ করে গেছে, 'চাঁড়াল' বলে ও নানাভাবে অপমান অপদস্থ করে গেছে। এর বিরুদ্ধে পিতৃপুরুষরা অনেক আন্দোলন করেছেন। আবার একটি অংশ পৈতে পরে পুজোপার্বন করে পদবী বদলে ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করেছে। তারা না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে গেছে। বর্ণাশ্রম প্রথায় জাতিবিন্যাসে বর্ণহিন্দুরা তাঁদের শূদ্রত্ব ঘোচায় নি। যোগেন্দ্রনাথ নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে আরও বেশী বেশী করে বুঝতে পারেন নিজেদের শূদ্রত্ব প্রতিষ্ঠাই পথ। তাই উচ্চবর্ণের জমিদার শিক্ষিতদের হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ তাঁকে ছোঁয় না। হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসী রাজনীতির তপশিলি আন্দোলনকে আত্মস্মাৎ করা থেকে আম্বেদকরের মত তিনি দূরে থাকার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ শাসনে তপশিলিদের সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র, অশিক্ষিত, পশ্চাদপর স্বজাতির উন্নয়নের ব্রত নেন।

প্রায় সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক বাধায় ও সঙ্কীর্ণ রাজনীতির জন্য অগৈলঝরা স্কুলের কাজ এগোয় না। এর জন্য যোগেন্দ্রনাথকে অধিবেশনের ফাঁকে রাইটার্সে মন্ত্রী সেক্রেটারিদের ঘরে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। বিধানসভায় যোগেন্দ্রনাথের প্রস্তাব গ্রামের স্কুলের তপশিলি ছাত্রদের মাইনে মকুব নাকচ হয়ে গেল। এমনকি তপশিলি বিধায়ক পুলিন মল্লিক বিরোধী বক্তব্য রাখলেন। ইতিমধ্যে হোম সেক্রেটারির অনুরোধে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমোদনে যোগেন্দ্রনাথ সরকারি আতিথেয়তায় রওনা দিলেন সিলেটের হবিগঞ্জে ব্রাহ্মণ-নমঃশূদ্র দাঙ্গা থামাতে। পথে গোয়ালন্দ ঘাটে দেখলেন অজস্র 'হিন্দু হোটেল'। বেশ কিছু 'বামুন ঠাকুরের হোটেল-হিন্দু ব্রাহ্মণদের জন্য', 'শুধুমাত্র হিন্দু বিধবা ও ব্রাহ্মণদের ষোল আনা নিরামিষ ভোজনালয়—জাত ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবেন না', কিছু মুসলমান হোটেলের হোর্ডিং দেখলেন। কিন্তু পেলেন না কোন 'শূদ্র হোটেল'। শূদ্রদের মুসলমান হোটেলে খেতে হয়। সঙ্গী এসডিও, ডেপুটি ম্যাজিসস্ট্রেটদের সাথে কথা বলে দেখলেন সবই বর্ণ হিন্দু, কিছু খানদানি মুসলমান। দেশে জমিদারি। হবিগঞ্জে গিয়ে ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানলেন এটি একটি পরিত্যক্ত স্থানে মন্দির ঘোষণা করে ব্রাহ্মণদের ঘোটলা। এক বছরে দুজন নমঃশূদ্র খুন হয়েছে। হবিগঞ্জের নমপাড়ায় সর্বজনগ্রাহ্য তুলসীমালা আখড়ার সাহায্যে নমঃশূদ্রদের আগে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের সাথে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে দুপক্ষের সমঝোতা করে দাঙ্গা বন্ধ করলেন।

স্বতন্ত্র তফসিলি এমএলএ হিসাবে এবং বিধানসভায় তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য যোগেন্দ্রনাথ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবুল হাসেম, হেমন্ত সরকার, বেগম শাকিনা মৌজিদদাজা, হেমন্ত বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রহমান বহু বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রায় সবদলের মন্ত্রী ও বিধায়কদের সাথে যোগেন্দ্রনাথের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবেই তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিক শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর। তারা দুজনেই যোগেন্দ্রনাথকে খুব পছন্দ করতেন। যোগেন্দ্রনাথও তাঁদের পরিবারের একজন হয়ে গেছিলেন। ১৯৩৮-'৪১ অবধি সুভাষের কংগ্রেস সভাপতি হওয়া, গান্ধীগোষ্ঠী কর্তৃক কোণঠাসা হয়ে পদত্যাগ, বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসে আকচাআকচি থেকে মহানিষ্ক্রমণ অবধি নিজে কংগ্রেসে যোগ না দিয়েও যোগেন্দ্রনাথ সুভাষের রাজনৈতিক সচিবের কাজ করে গেছেন। পাশাপাশি বারবার জেলের ভেতরে ও বাইরে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারে অসুস্থ সুভাষের চাঁদসি চিকিৎসা করেছেন। সুভাষের নির্দেশে তিনি অ্যালবার্ট হলে তফশিলিদের বড় সভার আয়োজন করেন, বড়তলা থেকে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হন। এই সময় '৩৯এ শরৎ বোসের বাড়িতে এআইসিসি সম্মেলনে গান্ধী সহ কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের সাথে সাক্ষাত হয়। গান্ধীর সাথে তফশিলি মন্ত্রী-বিধায়কদের আলোচনায় গান্ধীর হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের

মাধ্যমে এবং সকলকে কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে জাতিভেদ সমস্যার অবসানের তত্ত্ব যোগেন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করে। ইতিমধ্যে অন্যদের নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ 'অল বেঙ্গল শিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন' গড়ে তোলেন। এরপর বরিশালে গেলে হক সাহেব আন্দামান ফেরত কয়েকজন বিপ্লবীর সাথে যোগেন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে আসেন। তাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। বরিশাল কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। মাহিলাড়ায় হয় সফল কৃষক সম্মেলন। ব্রিটিশের অধীন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের জমিদারদের সরকার কৃষকদের জন্য প্রচুর চোখের জল ফেললেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত বিধি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করছিল না। উল্টে ১৯২৮-র অ্যামেন্ডমেন্টে আন্ডাররায়ত বা কোর্ফা প্রজা করে কৃষক উচ্ছেদের পথ সুগম করা হল। নীহারবাবু, বঙ্কিমবাবুদের মার্কসীয় আলোচনা, লেনিনের বই যোগেন্দ্রনাথের ভালো লাগত। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব উদ্দীপ্ত করত। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বর্ণাশ্রমের জন্মগত শূদ্রদের শূদ্রত্ব ঘুচবে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর দেখা সব মার্কসিস্টরাইতো বামুন-কায়েত-বৈদ্য কিংবা ওমুক বাবু তমুকবাবু। ইতিমধ্যে যশোরের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গার পর রসিককাকা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তারপর যশোরের ঝিকরগাছা, মাগুরা, ছিরিপুর, কুইলা, নরাইল, শালিখা, লোহারতালা, লাউজানি, পানিসারা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে রসিকলাল বিশ্বাস ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল দেখলেন বাইরে থেকে হিন্দু মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতির স্বেচ্ছাসেবকরা এসে গুজব ছড়িয়ে ও কলকাতার কাগজে সেগুলি পল্লবিত করে মুসলমান-নমঃশূদ্র দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেস এক পক্ষ, লিগ অন্য পক্ষ। ব্রিটিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। তারা অনেক চেষ্টায় দাঙ্গা বন্ধ করলেন। মিশন ও সঙ্ঘের ক্যাম্পগুলি হটিয়ে দিলেন।

এর মধ্যে বিধানসভায় যোগেন্দ্রের চেঁচামেচিতে তপশিলিদের প্রতিবছর বিদেশ যাওয়ার বৃত্তি, ১৯ জনের ডাক্তারি পড়ার বৃত্তি, অন্যান্য বৃত্তি, ফাণ্ড, চাকরিতে সংরক্ষণ চালু হয়েছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের নেতা আমলা আধিকারিকরা নানা কায়দায় এগুলি আটকে দিত।

সেইসময় বন্দীমুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, মুসলিম লিগের আন্দোলন, গ্রামে ভাগচাষীদের আন্দোলন নিয়ে কলকাতা ও রাজ্য সরগরম। অনাস্থা, খেয়োখেয়ি, ষড়যন্ত্র নিয়ে মন্ত্রীসভা টালমাটাল। হক সাহেব যোগেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী হবার প্রস্তাব দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ ঐ টালমাটাল অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথ তপশিলিদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি সুভাষ বসুর সাথে কাজ করছেন। সুভাষের বাড়িতেই প্রাক্তন বিপ্লবী, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা, পরবর্তীতে কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মানবেন্দ্র রায়কে দেখলেন, দেখলেন বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেককে। বরিশালে ব্যাপক সাইক্লোনে ভোলা প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই দুস্তর ফোঁসলানো ঢেউয়ের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ তেতুঁলিয়া, দৌলতখান, গয়াভাংগানি, লতা নদীর সীমানায় নৌকা করে ভাসানচরে পৌঁছন। সেখান থেকে দুদু মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে বরিশাল শহরে পৌঁছে ত্রাণের তদারকি করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসুকে খুলনা হয়ে ভোলা ও বরিশালে নিয়ে আসেন। বরিশালে সুভাষচন্দ্রের বিশাল সভায় সভাপতিত্ব করেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। সুভাষের নির্দেশে ইরাণি বংশোদ্ভুত বিশিষ্ট আইনজীবী, নেত্রী ও কাউন্সিলার শাকিনার নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনের ২০ হাজার ধাঁঙর-মেথর যে ঐতিহাসিক ধর্মঘটে অংশ নেন যোগেন্দ্রনাথ তাঁদের তপশিলি সংগঠন নিয়ে তাতে যোগ দেন এবং নিজে মেয়র সিদ্দিকি সাহেবের সাথে আলোচনা চালিয়ে কর্পোরেশনকে দাবীগুলি বেশিরভাগ মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

লিগ-হক মন্ত্রীসভার পতনের পর প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন গড়ে তুলে ১৯৪১এ হক সাহেব আবার প্রধানমন্ত্রী হন ও মন্ত্রীসভা গঠন করেন। হক সাহেবকে সমর্থন করে কংগ্রেসের শরৎ বোস গোষ্ঠীর ২৮ জন, কৃষক প্রজার ১৯ জন, হিন্দু মহাসভার ১২ জন, তপশিলি স্বতন্ত্র ১২ জন, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ২ জন, শ্রমিক ১, কংগ্রেস ও ন্যাশনালিস্ট ২৭ জন। ব্রিটিশ সরকার শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রেফতার করে। হক সরকার মুসলমানদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা ঘোষণা করলেন। ততদিনে পাকিস্তানের দাবি উঠে এসেছে। সেন্সাসে নিজেদের গোষ্ঠীর লোক বেশি দেখাতে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে ব্রিটিশ সিঙ্গাপুর, মালয়, বারমা থেকে পিছু হটে বাংলাকে পূর্ব রণাঙ্গণ তৈরি করছে। বারমা থেকে উদ্বাস্তুরা আসছিলেন। বেঙ্গল টেনান্সি বিল হারিয়ে গেল, গঠন হল ফ্রাউড কমিশন। পাটচাষীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে যোগেন্দ্রনাথ বিধানসভায় ও পাটশ্রমিকদের সভায় পাটচাষীদের পক্ষে বললেন।

ঢাকা শহরে এবং নারায়ণগঞ্জে দাঙ্গা শুরু হলে আবার যোগেন্দ্রনাথের ডাক এল। সঙ্গে গেলেন রসিকলাল বিশ্বাস। যোগ দিলেন ঢাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং তপশিলি ও কংগ্রেস নেতা মোহিনীমোহন দাস। ডাঃ দাস ও তাঁর স্ত্রী মুন্সিগঞ্জে তপশিলিদের মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এখানেও দেখা গেল বর্ণহিন্দুরা ইন্ধন জুগিয়েছেন। সাহারাও। অনেক কষ্টে মুসলমান এবং গোয়ালা, শাখারি, নমঃশূদ্রদের মধ্যে হিংসা সাময়িক বন্ধ করা গেল। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ এক পশ্চিমা হিন্দুত্ববাদী দুর্বৃত্তের আক্রমণে আহত হলেন।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে ইস্পাহানি প্রমুখ ব্যবসায়ীকে দিয়ে সমস্ত খাদ্য শস্য সরিয়ে নেওয়া হল ব্রিটিশ সেনার জন্য এবং জাপানিরা এলে যাতে না পায় তাই। এর সাথে নৌকা, সাঁকো সব ভেঙ্গে ফেলা হল। যোগেন্দ্রনাথ বিষয়টি বুঝতে কর্তাব্যক্তি এমনকি সামরিক অধ্যক্ষর সাথে দেখা করলেন। তারপর বরিশাল গিয়ে দেখলেন করুণ অবস্থা। কলকাতা শহর জুড়ে যুদ্ধভীতি, জাপানি বোমার আতঙ্ক, মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতি, ব্যবসায়ীদের মজুতদারি, কালো বাজারি। আইনশৃঙ্খলার অবনতি।

অন্যদিকে সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর আগমন ও ভারতের মাটিতে প্রবেশ। ভারত জুড়ে ভারতছাড়ো আন্দোলন। বাংলায় ভয়াল দুর্ভিক্ষ। শ্যামা-হক সরকারের ব্যর্থতা। হক সরকার পড়ে গেল। এবার নাজিমুদ্দিনের কোয়ালিশন সরকার হল। এবার যোগেন্দ্রনাথকে মন্ত্রী করা হল। ১৯৪৩-র ২৪ এপ্রিল ঐ মন্ত্রীসভায় যোগেন্দ্রনাথ ছাড়াও তপশিলিদের মধ্যে পুলিনবিহারী মল্লিক ও প্রেমহরি বর্মন মন্ত্রী হলেন। মন্ত্রীসভার ডেপুটি লিডার হলেন মুকুন্দবিহারী মল্লিক ও রসিকলাল বিশ্বাস। পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হয়েছিলেন অনুকূলচন্দ্র দাস, বঙ্কুবিহারী মণ্ডল ও রসিকলাল বিশ্বাস। কথিত আছে যোগেন্দ্রনাথ নাজিমুদ্দিনকে চাপ দিয়ে তপশিলি মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িতে নিয়েছিলেন। কিন্তু, সেইসময় তাঁর মূল কাজ ছিল দেশ ও গ্রাম থেকে নিরন্ন মানুষের আসা স্রোতে খাদ্য ও ত্রাণ যোগানো। যশোর রোডে বারাসতের কাছে লঙ্গরখানা খোলা হল। কিন্তু তা যে বড্ড অপ্রতুল। বাংলার দুর্ভিক্ষে ২০-৩০ লক্ষ মানুষ মারা গেলেন, বেশীরভাগই গ্রামের গরীব কৃষক। ব্রিটিশ ইম্পাহানিদের এই তৈরি করা দুর্ভিক্ষে প্রাণ গেল তাঁর বরিশাল-খুলনা-যশোর-ফরিদপুরের অসংখ্য স্বজনের।

ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর

এরপর যোগেন্দ্রনাথের সাথে হিন্দু মহাসভার টক্কর লেগে গেল। চারিদিকে হাহাকার ও সাম্প্রদায়িক পরিবেশে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের একাংশ দাঙ্গার ইন্ধন জ্বালিয়ে যাচ্ছিলেন। গোপালগঞ্জকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ সদলবলে সেখানে গেলে যোগেন দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে মিটিংতো দূরের কথা লঞ্চ থেকে তাদের নামতেই দিলেন না। এর ফলে বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ হিন্দুত্ববাদী কংগ্রেসের শত্রু তো ছিলেনই আর.এস.এস.—হিন্দু মহাসভার প্রধান শত্রু হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ ১৯৪৩-'৪৬এ নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভার সদস্য এবং বিধানসভায় ২১ জন তপশিলি স্বতন্ত্র বিধায়কদের নেতা হিসাবে একজন নিয়ামক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা এর আগে নেতৃত্বের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন হয়তো অর্থের জোরে বা খ্যাতির জোরে বা প্রতিষ্ঠার জোরে, তাঁরা যোগেনের নেতা হয়ে ওঠায় ও বাংলা আইনসভায় সরকার রাখা না রাখার কর্তা হয়ে ওঠায় প্রথমে অখুশি হলেন, তারপর বিরক্ত হলেন, তারপর ঈর্ষা করতে লাগলেন ও শেষে তাঁর বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

১৯৩৭-র ভোটে একটি বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ সারা ভারতে ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি সাধারণ আসনে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন। সাধারণ আসনে ভোটার ছিলেন সকলেই, নানা জাতের হিন্দু। সারা ভারতের ১০টি প্রদেশে হাজারের উপর সাধারণ আসনে বর্ণহিন্দুরা কোন তপশিলিকে ভোট দেয়নি। একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ ছাড়া সাধারণ আসনে কোন তপশিলি জেতেননি। অথচ আমরণ অনশনে গান্ধীজি মৃতপ্রায় হয়েছিলেন—তপশিলি হিন্দুদের আলাদা ভোট নাকচের দাবিতে। গান্ধীজি বলেছিলেন হিন্দুদের ভাঙ্গতে দেব না। আসলে তিনি হিসাব কষে দেখেছিলেন যে ভারতের হিন্দু জনসংখ্যা থেকে তপশিলিদের আলাদা ভোট করলে বর্ণহিন্দুরা জিততেই পারবেন না।

দ্বিতীয় যে বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন তা হল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দ্বিতীয় ভোটের আগে সারা ভারতে তপশিলিদের একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় তপশিলি ফেডারেশন' গঠন। আম্বেদকরের সাথে। এই ফেডারেশন তপশিলি আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ কেন্দ্রিক মেরুকরণ হওয়া রাজনীতিতে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ জিতে বিধায়ক হলেন। বাকি প্রার্থীরা পরাজিত হল। ১৯৪৬এ বাংলার সোরাওয়ারদির মুসলিম লিগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাতেও যোগেন্দ্রনাথ বিচার, আইন ও পূর্তবিভাগের মন্ত্রী হলেন।

যোগেন্দ্রনাথেরে তৃতীয় অদ্বিতীয় হওয়ার কীর্তি হল 'সংবিধান রচনা পরিষদে'র সদস্য-নির্বাচনে আম্বেদকর বম্বে থেকে হেরে যান। বল্লভভাই প্যাটেল প্রকাশ্যে বলেছিলেন আম্বেদকর যাতে কোনভাবেই গণপরিষদে ঢুকতে না পারেন কংগ্রেস সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। যোগেন্দ্রনাথ আম্বেদকরকে বাংলায় ডেকে এনে যশোর-খুলনা থেকে প্রার্থী করলেন। কংগ্রেস এক তপশিলি বিধায়ককে অপহরণ করেছিল। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ সমর্থকদের পাঠিয়ে রংপুর থেকে ঐ বিধায়ককে উদ্ধার করেন এবং আম্বেদকরকে ভাল ভোটে জিতিয়ে গণপরিষদে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

১৫ হ্যারিসন রোডের তপশিলি ফেডরেশনের এক সভায় পরিকল্পিতভাবে পি.আর. ঠাকুর, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, উপেন এদ্বারদের নেতৃত্বে যোগেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা হয়। অন্যদিকে অগ্নি মণ্ডলের নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভাপন্থী তপশিলি নেতৃত্ব তাঁকে হিন্দু বিরোধী হিসাবে আক্রমণ করেন। আম্বেদকরের সঙ্গ নেওয়ার জন্যও তাঁকে সমালোচনা করা হয়। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর তপশিলি ও শূদ্রকেন্দ্রিক রাজনীতির জবাব দেন, গত ১০ বছরের কাজে সালতামামি ব্যাখ্যা করে উচ্চবর্ণের প্রবল বাধার বিষয়গুলি তুলে ধরেন। এরপর বাংলা জুড়ে সাম্প্রদায়িক আবহে তপশিলি নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি বড় অংশ 'মতুয়া' গুরু পি. আর. ঠাকুরের নেতৃত্বে কংগ্রেসের দিকে ঝোঁকেন। আরেকটি অংশ হিন্দু মহাসভার প্রতি। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর শূদ্রকেন্দ্রিক উচ্চবর্ণীয় কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা বিরোধী রাজনীতিতে অটল থেকে স্বাভাবিক মিত্র মুসলিম লিগ—কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় এবং তপশিলি ফেডারেশনের কাজ করতে থাকেন।

কংগ্রেস ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়েছিল। মুসলিম লিগ

হক সাহেবকে তাড়াল। জিন্না হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। ওদিকে কংগ্রেসে নেহরু ও প্যাটেল ক্ষমতা দখল করেছেন। জাপান ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরাজিত। সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ অথবা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশ। তারা তখন নিজেদের কর্তৃত্ব অটুট রেখে ভারতকে ভাগ করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস ও লিগ নেতারা ক্ষমতার লোভে তাতেই সামিল। আর এই কাজটি ত্বরান্বিত করতে দেশ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক আবহ ও দাঙ্গা।

গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে ১৯৪৬-র আগস্ট কলকাতায়, তারপর নোয়াখালিতে, তারপর বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লি, অন্যত্র হল একের পর এক ভয়ানক দাঙ্গা, খুন, রক্তপাত, লুঠ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ। ফলশ্রুতিতে দুই সম্প্রদায়ের আক্রান্ত মানুষের আতঙ্ক, ভিটেমাটি ত্যাগ ও উদ্বাস্তুর স্রোতে সামিল হওয়া। যোগেন্দ্রনাথ তার স্বজাতি অঞ্চলে এই দাঙ্গা-রক্তপাত অনেকটাই আটকাতে পারলেন এবং স্বজাতিদের আশ্বস্ত করলেন দেশে থেকে যাওয়ার জন্য। সেই পর্যায়ে বাঙালি মুসলমানরা নমঃশূদ্রদের গায়ে হাত দেয়নি।

ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ভাইসরয় ওয়াভল ১৯৪৫এর সেপ্টেম্বর একটি অন্তবর্তী সরকার গড়লেন দিল্লিতে। নেহরু প্রধানমন্ত্রী হলেন। কংগ্রেস ১২ জন মন্ত্রীর তালিকা দিল। জিন্না প্রথমে রাজি না হলেও ৫ অক্টোবর পাঁচজন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করে যোগ দিলেন। লিগ-কোয়ালিশনের এই পাঁচজন মন্ত্রী ছিলেন—লিয়াকৎ আলি, চুন্দ্রিগড়, আবদুর নিস্তার, গাজনফর আলি ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। সাম্প্রদায়িক আবহে এবং অনেকখানি ইর্ষায় কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে অন্যদলের নেতাদের দ্বারা যোগেন্দ্রনাথের বিপক্ষে কুৎসা শুরু হল। কেন্দ্রের অন্তবর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে যোগেন্দ্রনাথ দিল্লি গেলেন।

এরপর মাউন্টব্যাটেন এসে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করলেন। ভারত ও পাকিস্তান এই নামে দেশ বিভক্ত হল। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর শূদ্রত্বের তত্ত্ব নিয়ে তাঁর স্বজাতি ও স্বদেশকে (যা বাটোয়ারার পর পড়ল পাকিস্তানে, পূর্ব পাকিস্তানে) নিয়ে পাকিস্তানে রইলেন। জিন্না তাঁকে পাকিস্তানের গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি এবং পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী করলেন। ৫ আগস্ট সিন্ধু এক্সপ্রেসে করে পাকিস্তানের তদানীন্তন রাজধানী করাচির দিকে যাত্রা করলেন যোগেন্দ্রনাথ। পরে আইনের সাথে তিনি পাকিস্তানের শ্রম, কমনওয়েলথ ও কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রী হন।

কিন্তু জিন্না পরবর্তী পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান সামরিকিকরণ, ইসলামিকরণ ও পাঞ্জাবীকরণে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানেও পরে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ব্যাপক হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় বহু নমঃশূদ্রও হতাহত হয়। উদ্বাস্তুর স্রোত ভারতের দিকে ছোটে। এর প্রতিবাদে তিনি পাকিস্তান মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে ভারতে ফেরেন। উচ্চবর্ণীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রভাবাধীন স্বাধীন ভারত তাকে আগেই ব্রাত্য করেছিল। এবার ইসলামিক সামরিক বাঙালী বিদ্বেষী পাকিস্তানও করল। উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে মুসলমান ও তপশিলি ঐক্য এবং ফলিত ক্ষেত্র পাকিস্তানের তত্ত্বায়ন বিফল হওয়ায় হতাশ যোগেন্দ্রনাথ মাত্র ৪৬ বছর বয়সে যাবতীয় নিন্দা ও বিদ্রূপ নিয়ে যখন ভারতে ফিরলেন তখন তাঁর স্বদেশ ভেঙ্গে গেছে, জন্মভূমি শত্রু দেশ, স্বজাতি রাস্তায় স্টেশনে বা ক্যাম্পে গাদাগাদি করে মরছে। যাবতীয় সমালোচনার মধ্যেও তাঁর স্বজাতি নমঃশূদ্র, তপশিলি ও উদ্বাস্তুদের ত্রাণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে গেলেন ১৯৬৮তে মৃত্যু অবধি। তিনি ১৯৫২-র নির্বাচনে বেনিয়াপুকুর-বালিগঞ্জ কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন। প্রথমে SBBS ও UCCR-র সাথে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করছিলেন। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন। পরে UCCR ব্রাত্য করে দিলে 1957এ তৈরি করেন 'ইষ্ট ইন্ডিয়া রিফিউজি কাউন্সিল (EIRC)'। কিন্তু ধারাবাহিক চেষ্টা করেও তিনি সফল হন না কারণ ততদিনে তপশিলি উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছে সিপিআই, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছেন চব্বিশ পরগণার গাইঘাটায় ঠাকুরনগর প্রতিষ্ঠা করে মতুয়া গুরু ও কংগ্রেস নেতা পি. আর. ঠাকুর।

যোগেন্দ্রনাথের তত্ত্বায়ন

১৯০৫-র ব্রিটিশ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের পর একদিকে উচ্চবর্ণ শিক্ষিত জমিদারদের স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্রতীপে ঢাকার নবাব, মুসলমান জমিদার এবং দ্রুত মুনাফা করা মুসলিম ব্যবসায়ীরা একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের অন্যদিকে পির মৌলবিদের এনে বাংলায় প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। যদিও এক্ষেত্রেও মূল দ্বন্দ্ব ছিল অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের গরীব মুসলমান এবং নমঃশূদ্র, হাজং ও অন্যান্য কৃষকদের শোষণ। ঈশ্বরগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জে দাঙ্গা হয়।

ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রাণ, দেবত্র, লাখেরাজ, সিকিমি তালুক, হুজুরি তালুক, নিমওসত তালুক, হাওলা, নিম হাওলা, ওমত নিম হাওলা, ইজারা, মিরাশ ইজারা, মিরাশ মালগুজার, কায়েম করজা, মেয়াদি করজা, জোত—নানা কায়দায় জমির ভাগ দেখিয়ে, না দেখিয়ে, কম দেখিয়ে, খাজনার হার কমিয়ে জমিদাররা সরকারকে কর ফাঁকি দিত। অন্যদিকে খাজনার পরও ঈশ্বরবৃত্তি, তহুরি, বিবাহ কর, পার্বনী, বিদ্যালয় খরচ, তীর্থখরচ, ডাক খরচ, ভোজ খরচ, গাজন, থিয়েটার, গোলাপূজা, মণ্ডপ সেলামি, মাচা—নানারকম বেআইনি আদায় করে কৃষকদের রক্তশূন্য করে দিত। আর না দিতে পারলে ভিটে মাটি উচ্ছেদ ও অত্যাচার। আবার এক্ষেত্রেও জমিদারদের পেয়াদা ও লেঠেলের দায়িত্ব পালন করত মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যেকার শক্তিধর নইক্দা জওয়ানরা। শোনা যায় প্রতাপাদিত্য ও বারো ভুইঞাদের সৈনিক ছিল নমঃশূদ্ররা। জমিদার-চুকানিদার-দর চুকানিদার—বর্গাদার মধ্যসত্বভোগীদের আদায়। নতুন জাগা নদীর চর দখল। এসবেও তারা।

যোগেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দু আইনে অবগাহন করে নয় নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর উপলব্ধিতে বুঝেছিলেন যে সব ধর্ম গ্রহণ করা যায়, এক হিন্দুধর্মে জন্ম নিতে হয়। আর শূদ্র সবসময় শূদ্রই থেকে যায়। অনেককিছুর মধ্যে তাঁর মনে পড়ে যায় বালকবেলার তেঁতুলকাঠির হাটের সেই দৃশ্যটি। লোভ সামলাতে না পেরে একটি বালক ঘোষ মশায়ের দোকানের সাজানো জিভে গজার স্তুপ থেকে একটি চুরি করেছিল। তাতে কামড় দেওয়ার আগেই ধরা পড়ে। ঘোষ মশায়ের দোকানের লোকেরা তার উপর ঝাঁপিড়ে পড়ে হাতা, শিক, ডাণ্ডা, শেষে আখার জ্বলন্ত খড়ি দিয়ে মেরে মৃতপ্রায় করে দিয়ে খালের জলে তিন ডুব দিয়ে দোকানে প্রবেশ করে। এরপর ঘোষ মশায় বারকোষের সমস্ত জিভে গজা মাটিতে ফেলে বলেন "চাঁড়ালের ছোঁয়া মিষ্টি আমি খদ্দেরদের বেচতে পারব না। চাঁড়ালের ছোঁয়া যাদের লেগেছে তারা তিন ডুব না দিয়ে আমার দোকানো ঢুকতে পারবে না।" তাই আইন সভায় হক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ঐতিহাসিক ভাষণের শেষে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ১০ আগস্ট ১৯৩৮এ বলেন, "...কিন্তু আমরা দায়িত্ব সহ আইনসভায় আজ ঘোষণা করতে চাই—কোন নমঃশূদ্র বা রাজবংশী বা তপশিলি জনগোষ্ঠীর একজনও আর উঁচু জাতের হিন্দুদের জীবনমান রক্ষা করতে মুসলমানদের সাথে দাঙ্গা করবে না। হিন্দু-ঐক্য একমাত্র তখন সরব হয় যখন বর্ণহিন্দুরা আক্রান্ত হন। আমরা হিন্দু না।"

রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও হিন্দু মহাসভার উচ্চস্তরে আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু নিজের লক্ষ্য ও আদর্শে স্থির থেকে সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। আম্বেদকরের সাথে যোগেন্দ্রনাথ 'অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন' তৈরি করেন। মহারাষ্ট্রের দলিত নেতা আম্বেদকরকে মেনে নেন এই তপশিলি জাতি ফেডারেশনের নেতা হিসাবে। যোগেন্দ্রনাথের তত্ত্ব ছিল তপশিলিদের রাজনৈতিক পরিচয় তপশিলি। অন্য পার্টি বা আন্দোলনে তপশিলিরা থাকতে পারে। যেমন মজুর ও কৃষক আন্দোলনে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক পরিচয় তপশিলি হিসাবে। যোগেন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে শূদ্র বা চাঁড়াল বলতেই বেশি পছন্দ করতেন।

ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টার একেবারে শেষ দিকে সারা ভারতে লিগ নেতৃত্ব বাদ দিয়ে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। তার আগে তিনি বাংলা ভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। তপশিলি হলেও হিন্দু থাকেন নি। পাকিস্তান প্রস্তাব মানলেও, পাকিস্তানের মন্ত্রী হলেও, মন্ত্রীত্বের সুবাদে পশ্চিম পাকিস্তানে থাকলেও মুসলিম হন নি। জন্ম থেকে তিনি মৃত্যু অবধি গর্ব ও স্পর্ধা নিয়ে শূদ্রই ছিলেন।

৫০-র দাঙ্গায় পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু প্রধানত নমঃশূদ্র হত্যায় তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। জিন্নাহীন পাকিস্তানে সামরিক-সাম্প্রদায়িক-পাঞ্জাবি জাত্যাভিমানি পরির্তনে তাঁকে কোনঠাসা ও হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ১৯৫০ এই তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন। উচ্চবর্ণ ও কংগ্রেস পরিবেষ্টিত আবহে আমৃত্য কুৎসা, নিন্দা ও ব্যর্থতার ঐকতানের মধ্যেও তিনি যথাসাধ্য তপশিলি, নমঃশূদ্র এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য কাজ করে গেছেন।

কোন রাজনৈতিক নেতাকে, সারা ভারতে এতটা অপমানিত হতে হয় নি, এতটা ঘৃণিত হতে হয় নি। এতটা তুচ্ছ হয়ে যেতে হয়নি। হিন্দুয়ানি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতকে, শূদ্রের এই স্বাধীনতা ও সাহস মেনে নিতে পারেনি, যে, নিজের শূদ্র-পরিচয়টাকেই একমাত্র পরিচয় করে তোলে ও হিন্দু পরিচয়কে অস্বীকার করে একেবারে ছলচাতুরিহীন সরলতায়। একলব্য ও শম্বুকের মত, এই শূদ্রের কোন ব্রাহ্মণ অস্ত্রগুরু বা হিন্দু-অবতারের দরকার হয়নি। হিন্দু সংস্কারে এই অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র, অস্পৃশ্য থেকে গিয়ে নিজের শূদ্র আত্মপরিচয়ের মাহাত্ম্য রচনা করেছেন।

[বিশেষ কৃতজ্ঞতা : শ্রী দেবেশ রায় এবং 'বরিশালের যোগেন মন্ডল'

কৃতজ্ঞতা : ঁশ্রী রণজিৎ কুমার শিকদার, ঁশ্রী সুরেন্দ্রনাথ শিকদার, ডাঃ হরিপদ রায়, শ্রীমতী অলকানন্দা রায়, শ্রী জগদীশচন্দ্র মন্ডল, শ্রী নীতিশ বিশ্বাস ও অন্যান্য।

বাংলাদেশের লোকজসংস্কৃতি গ্রন্থমালা—বাংলা একাদেমি, ঢাকা]

দিল্লির মেট্রোরেল

- ২০০২এ চালু হয়ে দিল্লির উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণে হরিয়ানার গুরুগ্রাম, বল্লভগড়, পূর্বে উত্তরপ্রদেশের নয়ডা/শহীদস্থল/বৈশালী থেকে পশ্চিমে মুণ্ডকা/দ্বারকা/নজফগড় অবধি চলে গেছে সারা দিল্লি জুড়ে
- রেড, ইয়ালো, ব্লু, গ্রীন, ভায়োলেট, অরেঞ্জ, ম্যজেন্টা, পিঙ্ক ও গ্রে মোট নটি লাইন এবং সিকান্দারপুর থেকে পৃথক র‍্যাপিড মেট্রো
- ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাজীব চক বিশেষ অরেঞ্জ এক্সপ্রেস লাইন
- মোট ৩৮৯.৩৫ কিমি। যমুনার উপর অ্যাকোয়া লাইন ২৯.৭০ কি.মি.। র‍্যাপিড মেট্রো ১২ কি.মি.। মোট স্টেশন ২৮৫

জনস্বাস্থ্য

কীটনাশক, আগাছানাশক, সঙ্কটনাশক

অরিজিৎ সিংহ

আত্মহত্যা মহাপাপ ও ভয়ঙ্কর ব্যাধি। সমগ্র বিশ্বে প্রতি বছর আট লাখের বেশী মানুষ এর সামিল। যার অর্থ প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে এক জনের মৃত্যু। বিষক্রিয়া হচ্ছে অন্যতম প্রধান কারণ। উন্নয়নশীল দেশে চাষে ব্যবহৃত বিষ প্রায় ষাট শতাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। আবার উন্নত দেশে অজ্ঞান করার ওষুধ, ইনসুলিন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি অন্যতম কারণ। দশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়স এর মানুষই বেশী আত্মহত্যা প্রবণ। যা এই বয়সে মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ হতে চলেছে।

ভারতীয় পুরাণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দ্বারা বর্ণিত তিন ধরনের (প্রাণীজ, খনিজ, উদ্ভিদ) বিষ ও তার প্রতিকারের কথা উল্লেখ আছে। সুশ্রুত তার গ্রন্থে বিভিন্ন বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন কালে অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা এড়িয়ে চলা গাছপালা, শাকসব্জিকে বিষের বিষয় হিসেবে দেখা হত। নীলকণ্ঠ শিব জগতের স্বার্থে গলায় বিষ ধারণ করেছিলেন। ওডিসি, এবর্স প্যাপিরাস্, রোমান নিরো কাহিনী আত্মহত্যা বা বিষক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু কেন এই আত্মহত্যা? মূল কারণগুলি দুরারোগ্য ব্যাধি, পণ বিবাদ, নেশা, পরীক্ষায় অসাফল্য, পারিবারিক বিপর্যয়, প্রণয়ে ব্যর্থতা, দারিদ্র, বেকারত্ব, সামাজিক সম্মানহানি, আর্থিক সঙ্কট (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো কি আটকাতে পারি না? চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সামাজিক মেলবন্ধন, বেকার সমস্যার সমাধান, ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষদের উপযুক্ত পরামর্শ দান, ব্যবহারিক পরিবর্তন, যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে আটকানো সম্ভব। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী।

তথ্য বলে দেয় চাষে ব্যবহারের বিষ প্রধান কারণ। যে যে বিষ গুলি বেশী দায়ী তার মধ্যে আছে অর্গানোফোসফোরাস, অর্গানোক্লোরাইড, অ্যালুমিনিয়াম ফোসফাইড, প্যারাকোয়াট ইত্যাদি। প্রথম দুটির ক্ষেত্রে প্রতিষেধক থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর হার দশ থেকে কুড়ি শতাংশ। অ্যালুমিনিয়াম ফোসফাইড পতঙ্গ ও ইঁদুরের হাত থেকে শস্য কে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। এর কোন প্রতিষেধক নেই এবং মৃত্যুর হার প্রায় ষাট শতাংশ, যা মূলত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কাজ বিকল করে। সহায়ক চিকিৎসা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। ইদানীং প্যারাকোয়াট এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে, যা আগাছা বা ঘাস মারতে ব্যবহৃত হয়। কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে এটি সহজলভ্য, এবং সাধারণের মধ্যে এর বিষক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা নেই। অল্পবয়সীরা ভয় দেখাতে বা ঝোঁকের বশে খেয়ে ফেলছে, যার পরিণাম ভয়াবহ। প্যারাকোয়াট হচ্ছে এক, এক, ডিমিথাইল, চার, চার বাইপ্যারিডিনিউম যৌগ। শরীরে প্রবেশ করে রেডক্স সাইক্লিং এর মাধমে রিএক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস তৈরি করে। নাইট্রিক অক্সাইড, পেরোক্সি নাইট্রেট এর মত জোরালো অক্সিড্যান্ট ফুসফুস, কিডনি, হার্ট, লিভার, ব্রেন প্রভৃতি অঙ্গকে বিকল করে। সহায়ক চিকিৎসা যেমন পাকস্থলি পরিষ্কার, ডায়ালিসিস, লিভার সাহায্যকারী চিকিৎসা ছাড়া বিশেষ কিছু করার নেই। এমন কি অক্সিজেন দেওয়া অনেকসময় ক্ষতিকর। নাই কোন প্রতিষেধক। মৃত্যুর হার পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি, মাল্টি অর্গান ফেলিওর হলে তা একশো শতাংশও হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে চাষের বিষে মানুষের প্রতিক্রিয়া হলে কোন প্রতিষেধক নাই, সে বিষ বাজারে থাকবে কেন? আজকাল ঘুমের ওষুধ প্রেস্কিপশন ছাড়া বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে, এমন কি ফিজিসিয়ান স্যাম্পলও। তাহলে চাষের বিষের বিক্রির ব্যাপারে সতর্কীকরণ বা বাস্তবমুখী নিয়মাবলী থাকবেনা কেন? খোলা বাজারে যে কেউ চাইলেই এই বিষ গুলি পাওয়া যায়। একজন বিজ্ঞান স্নাতক হলে তবে কীটনাশক ওষুধের দোকান খোলা যায়। তাদের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে না কেন? ঘাসমারা ও আগাছানাশক বিষের নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে। কারণ আগাছা তোলার (নিড়ান দেওয়া) লোকের অভাব বা ব্যয় সঙ্কোচ। বাড়ছে প্যারাকোয়াট এর ব্যবহার, হচ্ছে সহজলভ্য। একজন মানুষ মানসিক অবসাদে বা তাৎক্ষণিক ভারসাম্যহীনতায় এই সব বিষ খেয়ে ফেলছে। এর দায় কি বর্তমান সমাজব্যবস্থা, সরকারি নিয়মাবলী এড়াতে পারে? পরোক্ষভাবে সবাই দোষী। বিশ্বের বেশীরভাগ দেশই এই ধরনের বিষ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পড়শি শ্রীলংকাতেও প্যারাকোয়াট নিষিদ্ধ। মালয়েশিয়াতেও দুহাজার কুড়ি সাল থেকে বন্ধ হওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে। বাড়ির লোকের, সমাজের ক্ষতি বন্ধ হোক, বন্ধ হোক চিকিৎসকের চোখের জল ফেলা। যেসব কীটনাশক, আগাছানাশক এর নির্দিষ্ট প্রতিষেধক (আন্টিডোট) নেই তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হোক। জোর দেওয়া হোক প্রাকৃতিক প্রতিরোধের। লাগু হোক চাষের বিষ বিক্রির নতুন নিয়ম। দুজনের উপস্থিতি ছাড়া বিষ বিক্রি বন্ধ হোক। তৈরী হোক আরও বিজ্ঞানসম্মত বিষের বোতল ও তার সংরক্ষণ। বন্ধ হোক প্যারাকোয়াট, বন্ধ হোক অ্যালুমিনিয়াম ফোসফাইড। আমি, আপনি, আমরাই, আমরাই পারি সঙ্কটনাশক রূপে আবির্ভূত হতে।

(সূত্র : www.searo.who.int.>india>topical
History of Toxicology by A Aggrawal. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine,—Elsevier)

ডেঙ্গু নিয়ে দু-চার কথা

সব্যসাচী রায়

ডেঙ্গু আমাদের দেশ, তথা সারা পৃথিবীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মশা বাহিত সংক্রামক ব্যাধি। প্রতিবছর বহু লোক এতে আক্রান্ত হন, এবং বেশ কিছু মৃত্যুও ঘটে, যার মধ্যে অনেকগুলোই আমরা আটকাতে পারি। এই মুহূর্তে, সারা পৃথিবী 'করোনা'র প্রকোপে কাবু, কিন্তু ডেঙ্গুর গুরুত্ব ভুললে চলবে না।

ডেঙ্গু একটি মশা বাহিত রোগ, যে মশা পরিষ্কার জলে জন্মায়, এবং ভোরের দিকে ও সন্ধ্যার দিকে সবচেয়ে বেশি কামড়ায়। বাড়ির আশেপাশে কিংবা বাড়ির মধ্যে জমে থাকা জঞ্জালের সাথে ডেঙ্গু হওয়ার খুব একটা সম্পর্ক নেই। বাড়ির মধ্যে কোথাও আধ ইঞ্চি পরিষ্কার জল এক সপ্তাহ বা তার বেশি দিন জমে থাকলে তাতে ডেঙ্গু মশার বংশবৃদ্ধি হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে, গ্লাসে, ফুলদানিতে, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত চৌবাচ্চা, পুরনো ব্যাটারির খোল, পুরনো টায়ার, ডাবের খোলায়, অথবা, জমে থাকা বৃষ্টির জল।

এই রোগ গরীব-বড়লোক প্রভেদ করেনা। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লোক এই রোগের আক্রান্ত হয়েছেন বা মারা গেছেন। বিগত ৭-৮ বছর ধরে আমাদের রাজ্যে এই রোগের প্রকোপ বেড়েছে। এই রোগ সম্বন্ধে কিছু প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অধুনা পাল্টে যাচ্ছে—যেমন, আগে ভাবা হত যে ডেঙ্গু শুধু গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে হয়, কিন্তু এখন দেখা গেছে যে সারা বছরই কম বেশি হচ্ছে। আবার, আগে ডেঙ্গু প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে হতো, এখন কিন্তু ডেঙ্গু গ্রামেও ছড়াচ্ছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে বিগত ৩-৪ বছরে, ডেঙ্গুতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও, মৃত্যুর সংখ্যায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার, যে, ভাইরাস-এর মারণশক্তি বাড়ছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ চার রকমের ডেঙ্গু ভাইরাস দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে কোন ভাইরাস শক্তিশালী থাকবে, তার উপর তার মারণশক্তি নির্ভর করে।

সারা পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে ডেঙ্গু হয়ে থাকে, এবং গত ৫০ বছরে এর প্রাদুর্ভাব ৩০ গুণ বেড়ে গেছে। এই অসুখ কিন্তু সব ক্ষেত্রে মারাত্মক রূপ ধারণ করে না। জ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখালে, এবং ডাক্তার যদি মনে করেন যে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে ওনার পরামর্শ মেনে চললে ও কিছু পরীক্ষা করলে অধিকাংশ মৃত্যুই এড়ানো যায়। যদি ডাক্তারবাবু ডেঙ্গু নিরূপণ করেন এবং রুগীকে ওষুধ দিয়ে বাড়ি ছেড়ে দেন, তাহলে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে—

১) রক্তক্ষরণ
২) ঝিমুনি অথবা অস্থিরতা
৩) খিচুঁনি
৪) শ্বাসকষ্ট
৫) বার বার বমি
৬) পেটে ব্যথা
৭) চোখ মুখ ফুলে যাওয়া
৮) মাথা ঘোরা
৯) হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়া
১০) কম প্রস্রাব হওয়া

এই উপদেশ মেনে চললে কিন্তু অসুখটা বিপজ্জনক হলেও, চিকিৎসার সুযোগ থাকে। কিন্তু দেরি করলে সুযোগ কমে যাবে ও মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আর যদি ডাক্তারবাবু প্রথমেই ভর্তি করে নেন, তাহলে তো আলাদা কথা।

বাড়িতে থাকা অবস্থায়, রুগীকে প্রচুর জল খাওয়াতে হবে (মোটামুটি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে সারাদিনে ৫ লিটার তরল খাওয়াতে হবে) ও বিপদচিহ্ন গুলোর দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল (ক্রোসিন/ক্যালপল) ছাড়া কিছু খাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশক্ষেত্রে বিপদ কিন্তু জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরেই হয়, তাই সেই সময়ে ও অন্তত তিনদিন বাড়িতে কড়া নজরদারিতে রাখতে হবে। স্বাভাবিক সহজ পাচ্য খাবার খাবে।

এইসব উপদেশ মেনে চললে ডেঙ্গুর মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে।

ডেঙ্গুর টিকা সবে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখনও আমাদের দেশে উপলব্ধ নয়। তাছাড়া, এই টিকা খুব ছোট বাচ্চাদের উপর কাজ করে না। সুতরাং, ডেঙ্গু আটকানোর প্রধান দায়িত্ব আপনার, পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের নয়। বাড়িতে বা আশেপাশে জল জমতে দেবেন না।

এবার আসি ডেঙ্গুর কতগুলো অন্যরকম উপসর্গের কথা নিয়ে। আমরা জানি, ডেঙ্গুতে প্রধানতঃ জ্বর, গা হাত পা ব্যাথা, চোখের পিছনে ব্যথা, রক্তক্ষরণ, চামড়ায় লাল লাল দাগ, হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অস্থির ভাব, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত দেখা যায়। তবে, কোনও কোনও ডেঙ্গু অন্যভাবেও ধরা দিতে পারে, যেমন যকৃতের (liver) রোগ, বৃক্কের (kidney) রোগ, শ্বাসকষ্ট, অগ্নাশয়ের (pancreas) রোগ, জ্বরের সাথে পাতলা পায়খানা, পিত্তথলির (gall bladder) রোগ, হৃদয়ের মাংসপেশীর প্রদাহ (myocarditis), শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ, হৃদয়ের গতির অনিয়মতা। সন্দেহ হলে ডাক্তারবাবু এসব ক্ষেত্রেও ডেঙ্গুর পরীক্ষা করেন। এমনকি জ্বর ছাড়া ডেঙ্গু হতে পারে। আমাদের মত দেশে, যেখানে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এত বেশী, সেখানে যথাযথ লক্ষণ না পেলেও, ডাক্তারবাবুরা অনেক সময়ে ডেঙ্গু ও

ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করেন এবং এই উপদেশ সবার মেনে চলা উচিত।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হল যে ডেঙ্গু আটকানো কিংবা এর মৃত্যুহার কমানো অনেকটাই আপনার হাতে। কোথাও জল জমতে দেবেন না, মশারি ব্যবহার করুণ ও জ্বর হলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। নিজে সাবধানে থাকুন, অপরকে সাবধান করুন।

ডেঙ্গু জ্বরের পাঁচালী

[শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দ্বারা প্রণীত। আই.সি.চন্দ্র এণ্ড ব্রাদারস কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। বাবুরাম ঘোষের লেন ৩২ নম্বর ভবনে ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীঅধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারায় মুদ্রিত। সন ১২৭৯ সাল। মূল্য /০ আনা মাত্র]

গীত।

বাউলের সুর।

এবার পৃথিবী গেল রসাতসে। ধরণী কিবল
ভাস্‌ছে জলে॥
ওগো অকস্মাৎ বিধি, দিলেন কি ব্যাধি,
মরিতেছে ডেঙ্গু জ্বরানলে। কত মরে গরু
ঘোড়া, ভাস্‌ছে সব যোড়া যোড়া, পশু পক্ষ
আদি কোরে। ওগো শত শত নর, গেল
যমঘর, মহেশ্চন্দ্র চন্দ্র দাসে বলে॥

হেরি ঘোর কলিকাল, হর্ষ কলি মহীপাল, সংবাদ জানাচ্ছে সহোরেতে। বলে শুন সব প্রজাগণ, করি এই বিজ্ঞাপন, জানাই সকলের নিকটেতে॥ যে করিবে ধর্ম্ম ভয়, তার দুঃখ অতিশয়, এই দণ্ডে দণ্ড দিব তার। কিবা রাজা, কিবা প্রজা, সকলে পাইবে সাজা, এই আইন করিনু প্রচার॥ এত বলি ধ্বজা নিয়ে, দিল রাজা উড়াইয়ে, কলির রাজ্যেতে ডঙ্কা হয়। কিবা নর কিবা নারী, কিবা ছুঁড়ি কিবা বুড়ি, সকলেতে আনন্দ হৃদয়॥ হেরিয়া কলির ধ্বজা, সকলেতে কচ্ছে মজা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভুলে যাচ্ছে। জাতি ভেদ নাহি কার, সব করে একাকার, এক সানকে অন্ন সবে খাচ্ছে॥ চাপিয়া চৌঘুড়ী গাড়ি, কেহ উইলসনের বাড়ি, খানা খাচ্ছেন বসি চেয়ার পেতে। নাহি কিছু বাছে তার, বিফ্ খাচ্ছেন চমৎকার, ডিসে রাখি করিয়া কাঁটাতে॥ কলির ইয়ং বেঙ্গল, নাহি মানে কালাকাল, স্কুলেতে পড়ি পাতদুই তিন বই। নাহি মানে ধর্ম্মভয়, ইংরাজিতে কথা কয়, পিসিকে বলেন রসমই॥ মামাকে বলেন দাদা, প্রাণটা যখন হয় সাদা, কত রঙ্গের কথা তখন হয়। মুখে সদা করেন নুট, খান সদা বিস্কুট, ইয়ার পেলে আনন্দ হৃদয়॥ কলির রাজ্য এইরূপ, ঘটে অঘটন রূপ, হেরি কলি প্রফুল্ল অন্তর। অশ্বোপরে আরোহণ, কলিরাজা হর্ষ মন, মৃগয়াতে চলে একেশ্বর॥ হেন কালে ধর্ম্মরাজ, ধরিয়া গো রূপ সাজ, রাজপথে দণ্ডাইয়া রয়। কলিরাজা ততক্ষণ, ধর্ম্মে কহে বিবরণ, হাসি হাসি ধর্ম্ম প্রতি কয়॥ কহ ধর্ম্ম মহারাজ এখন কেহ হেন সাজ, অতিশয় দরিদ্রের বেশ। নাহি আর সে সব বল, খাচ্ছো এখন লোনা জল, শরীর এখন অস্তিময় শেষ॥ ধর্ম্ম কন কলিরাজ, নাহি কিছু বাস লাজ, তিনযুগ রাজ্য আমি করি। এখন হয়েছে শেষ দশা, এজন্য এখানে বসা, কিন্তু সকলেরে তুচ্ছ করি॥ যদি আমি করি মনে, গিয়া মরুত ভুবনে, সকলেরে হরিমন্ত্র দিব। তোমার রাজ্য ডুবাব জলে, হরিমন্ত্র দিব বলে, তবে আমি ধর্ম্ম নাম ধরিব॥ তোমাতে আমাতে কলিরায়, অনেক তফাৎ হব প্রায়, মনে বুঝে দেখহ এক্ষণে॥ তুমি সালিক আমি শুক, তুমি চরণ আমি মুখ, তুমি চণ্ডাল আমি নৃপবর। আমি সিংহ তুমি গাধা কি কহিব কলি দাদা, এক খেদে খেদিত অন্তর॥ তোমার এখন অধিকার, নাহিক এখন আমার ভার, তবু সবে মান্য করে মোরে। চারিযুগ আমার মান্য, সকলের কাছে ধন্য, বৃদ্ধলোকে মান্যমান করে॥ কলি বলে নবডঙ্কা, এখন তোমার নাহি শঙ্কা, যাহো দেখি মরুতভূমে একবার। দেখি কেমন ধর্ম্মরায়, মান্য করে নরে তোমায়, ফিরে আসা হবে তব ভার॥ এইরূপ দুইজন, করি কথোপকথন, ধর্ম্ম হয়ে বৃদ্ধক ব্রাহ্মণ। হস্তে করি আশাবাড়ী, চলিলেন তাড়াতাড়ি, মরুত ভুবনে ততক্ষণ॥ প্রথমেতে ধর্ম্মরায়, এক জমিদারের গৃহে যায়, হরিনাম করি বীনায় তান। শুদ্ধসত্ত হয়ে মন, ধর্ম্মরাজ ততক্ষণ, শ্রীহরি নামের গীত গায়॥

রাগিণী আলিয়া। তাল জৎ।

মন ভাব সেই কমলাকান্তেরে। ভব পারে
যেতে হবে, সঙ্গে কেহ নাহি যাবে, সব
পড়ে রবে, মাটির দেহ মাটি হবে পরে॥
দারা সুতা যত, বন্ধু আর বান্ধব, কেহ কারু
নয় মনেতে ভাব, নয়ন মুদিলে হইবে শব
সার করে সেই শ্রীচরণরে॥

সেই জমিদার হন খ্রীষ্টান, নাহি তার ধর্ম্মজ্ঞান হরি নাম শুনে অঙ্গ জ্বলে। বলে কোথাকার তুই বিট্‌লে বামন, দুখুরবেলা এলি এখন, এত বলি মারিবারে চলে॥ পায়ে তথা অপমান, ধর্ম্মরাজ অন্তর্ধ্যান, অন্য গৃহে যান ভিক্ষা আশে। ঘরে ঘরে মুরগী জবাই, জবাইগৃহ নাহিক কামাই, হেরি ধর্ম্ম পলান তরাসে॥ হেন কালে যত ছেলে, ধর্ম্মে মাচ্ছে ইট ফেলে, কেহ দিচ্ছে ধুলা গায়ে তার। কেহ ঝুলি ধরে টানে, ধুলা দেয় কোনজনে, কেহ বলে বামন পলারে এবার॥ হেরি ধর্ম্ম এরূপ আচার, বলে কলির এই ব্যবহার, মিছে আর কেন ঘুরে মরি। যে খাইলাম আমি মার, অন্য হলে যেত যমদ্বার। ধর্ম্ম বোলে তাই আমি তরি॥ ভাবিতে ২ ধর্ম্ম, শরীরেতে রহে ঘর্ম্ম, মহাক্রোধ উপস্থিত হয়। সেই ধর্ম্ম পড়ি ভুমে, জন্মিল এক দৈত্য ক্রমে, তিন মাথা ছয় চক্ষু তায়॥ ধর্ম্মের নিকটে কয়, কি করিব মহাশয়, কি কারণে সৃজিলে আমারে॥

পৃথিবী দিব রসাতল, কিবা সাগরের জল, গণ্ডুষেতে খাব একে বারে॥ শুনি ধর্ম্ম কন কথা, রাখহো মম বারতা, মরুতভূমে করহ গমন। তব নাম ডেঙ্গু জ্বর রাখিলাম অতঃপর, শুন ওহে জ্বর বিচক্ষণ॥ এক নাম হলো ব্লাক ফিবর, যাহ যথায় কলির নর, অঙ্গ চাপি ধর একবারে। চব্বিশ ঘণ্টা অধিকার, লরে তারে যমদ্বার, যেন, ডাক্তার বৈদ্য কিছু কোর্ত্তে নারে॥ শুনি জ্বর হর্ষ মতি, চলিলেন শীঘ্রগতি, পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। অঙ্গে আসি চেপে পড়ে, নড়িতে চড়িতে নারে, কম্প শীত তাহারে বারিল॥ হাত পা বেদনা হয়, জল দাও জল দাও কয়, মুখ বেতার হয় বিলক্ষণ। অম্বলেতে হয় রুচি, সদাই থাকেন অশুচি কেহ বলেন দেহ আম্র মোরে। যতক্ষণ বেঁচে রই, পাকা আম্র খেয়ে লই, কখন যাইব যমঘরে॥ বড় মানুষ আছে যারা, ডাক্তার বৈদ্য আনে তারা, ডাক্তারবাবু আগে টিপেন হাত। জীব মেল একবার হেরি জিহ্বা কি প্রকার, জিহ্বা দেখি ভাবেন পশ্চাৎ লিখে ঔষধ তদন্তর, বলে ফি দেও আমার অতঃপর, বিলম্ব নাহিক সয় আর। বলি টাকা লয়ে হাতে, রাখিয়া উল্ট ট্যাকেতে, গতি করেন পবন সঞ্চার বেদ্যেতে চিকিৎসা করে, আগে নাড়ি দেখি পরে, আদা পানের সত্ত দেন তায়। দেন অষ্টাদশন বিধি বলে ইহার হবে বিধি, বলে দাস্ত হোলে ভাল প্রায়॥ কত শত ইংরাজেরে, ধোচ্ছে সব ডেঙ্গু জ্বরে, ব্লাক ফিবরে মরে কোন জন। সহোরেতে হাহাকার, মুখে বাক্য নাহি কার, গড়াগড়ি পাড়ে জনে জন। কেহ পঙ্গু বাত জ্বরে, পড়ি সব ঘরে ঘরে, ইচ্ছা করে খেতে তরমুজ সসা। কত্তা যারা বিচক্ষণ, করি তারা নিবারণ, খেতে দেয় খই আর বাতাসা॥ কেহ অজ্ঞান হয়ে রয়, ডাকিলে না কথা কয়, দেখি পিতা মাতা ভাবে মনে। স্মরণ করেছ বোলে হরি, বলে এই দায়ে তেতরি, ক্ষমা কর আমার নন্দনে॥ ডেঙ্গু জ্বরে কাতর হয়ে পড়িয়াছে শয্যালয়ে, অঙ্গ হয়েছে কালির বরণ॥ মুখে বল্‌ছে গেলেম গেলেম, একবার বুঝি প্রাণে মলেম, আর বাঁচনেতে কিবা সুখ। যদি অনুকূল হয়ে কাল, লয়ে যান ধরে কাল, কালাকার হোলে ঘুচে দুঃখ॥ এইরূপ পরস্পর, ডেঙ্গুতে হয়ে কাতর হাহাকার কচ্ছে সকলেতে। হাম হয়েছে চমৎকার কাল কাল গাত্রে কার, লাল মনোহর কার গায়েতে॥ হেরি এরূপ পিকবর, ভ্রমিতেছে পরস্পর, হাহাকার হোচ্ছে সর্ব্বস্থান। নাহি সেরূপ কলরব, নিরবে রয়েছে সব, শব প্রায় হয়ে আছে প্রাণ॥ নবীনা নামে বিরহিনী, সবলে আছেন তিনি, ডেঙ্গুতে তার কিছু কর্ত্তে নারে। সবাকারে দেয় প্রবোধ, বলে মলে। কি আপদ, এখনকার লোক তিলে তাল করে॥ ওলো প্রবীণা শুয়ে কেন, মৃত্যু প্রায় আছিস যেন, আমারতো ভাই ধরেছিল জ্বর। কবিরাজ ডাক্তার দেখাই নাই, দিবা নিশি বেড়িয়ে বেড়াই, পলাল জ্বর তিন দিনের পর॥ এখন গায়ে এগ্নি হয়েছে বল, পৃথিবী দিতে পারি রসাতল, তলাতল একদিনে ভ্রমণ করি। যদি আমি পাখা পেতেম, চন্দ্র সূর্য্য ধরে আনিতেম, পাখা নাই তাই ঐ দুঃখে মরি॥ প্রবীণা কয় ওরে বাছা, এখন তোদের বয়েস কাঁচা, জল চিবিয়ে খাস এখন তোরা মানিস্‌নাকো কোন পথ, চলিস্ যেন ঐরাবত, প্রবীণ হয়েছি এখন মোরা॥ কখন ঘোনাবে কাল, না মানিবে কালাকাল, কেশে ধরি লয়ে নিজালয় আছি গঙ্গার মড়া হয়ে, দাহ কোল্লেই যায় ফুরায়ে, এ দুঃখ নির্ব্বাণ তখন হয়॥ বল দেখিলো ও নবীনে বেড়িয়ে এলি সর্বস্থানে, কোনখানে দেখ্‌লিলো আমোদ। ঘুরে এলি পাড়া পাড়া, গীত বাদ্যের দেখ্‌লি সাড়া, কোথায় কিবা হয়েছে প্রমোদ॥ নবীনা কহে ওগো দিদি, সর্ব্বস্থানে ঘটেছে ব্যাধি, নিরবে রয়েছে সর্ব্বজন। ঘুরে এনু পাড়া পাড়া, কার মুখে নাহি সাড়া, ঘটিয়াছে এই অঘটন॥ কোন দেবতা দিয়াছে শাপ, তাতে পাই মনস্তাপ, এ রোগ হয়েছে জগৎ যুড়ে। ছুঁড়ি বুড়ি নাহি বাচে সবার অঙ্গে জ্বর ঢুকেছে, সকলে মরিছে জ্বরে পুড়ে কিন্তু তিন দিনের জ্বর যার অঙ্গে এসে, ছমাস তিনি থাকেন বসে, পথ হাঁটতে তিনি হন কাতর। যষ্টি হস্তে ভর করে, চোলে যান ধীরে ধীরে, ধরে গেঁটে বাত মনোহর॥ এলেম বেড়িয়ে যত গ্রাম, কত লব তার নাম, একে একে বলি তোর কাছে। যোড়াবাগান মাণিকতলাঃ আর সিদ্ধেশ্বরী তলাঃ তালতলা হাড়কাটার গলি। আছে যত বেশ্যাগণঃ ধরেছে জ্বরে বিলক্ষণঃ নিরব রয়েছে সর্ব্বস্থলি॥ নাহি সে সব বেশ ভূষাঃ মাথায় নাই মাথাঘসাঃ চুল যাচ্ছে বিছানায় মিশায়ে। ঢাকাই ধুতি গড়াগড়িঃ কাঁদছে সদা ডাক ছাড়িঃ জল একটু খাই এই বলিয়ে॥ অনুগত বাবু যারাঃ পদতলে শুয়ে তারাঃ ডেঙ্গু জ্বরে কাতর হৃদয়। খানসামায় বাতাস করেঃ অঙ্গ টিপে দেয় পরেঃ হেরি দুঃখ হইল অতিশয়॥ ডেঙ্গু জ্বরে এই দশাঃ সকলের ঘুচে ব্যাবসাঃ কাপড়ওয়ালার কাপড় বিকায় নাই। ঘৃতওয়ালা ঘৃত লয়ে, ফিরিতেছে ফুকারিয়ে, মদের দোকানে পড়েছে ছাই॥ মামাদের হয়েছে ভাবনা মদ নিয়ে হইল কান্নাঃ বলে এখন মদ কি করিব। সবার হলো ডেঙ্গু জ্বর, ভয়ে কাঁপে কলেবরঃ মড়ার মতন আগ্‌লেকি থাকিব॥ দোকানে ছিল যত শুড়িঃ দোকান বন্ধ করে মাল্লে পাড়িঃ বাড়ি যায় সকল মামাতে। বেশ্যাবিনে এইরূপঃ ঘটেছে অঘটন রূপঃ দেখে এমন পাড়াতে পাড়াতে॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জৎ।

বাই এমন জ্বর কোথায় দেখি নাই। ঘরে
ঘরে পড়ে আছে সারি সারি দেখতে পাই॥
কার মুখে না সরে কথা, অচেতন আছে
তথা, দশ ডাক দিলে পরে শুনিতে
না পায়। শবের মতন যেন গড়া-
গড়ি যায়, কম্পজ্বরে ধরেছে কারে হেন
জ্বরের মুখে ছাই॥ কেহ বলে মোর গেল
পদ, একি হোলরে আপদ, সর্ব্বাঙ্গ টা-টায়ে
উঠে আচম্বিতে বাই, বাবারকালে
আমি এমন জ্বর দেখি নাই, মহেশ্চন্দ্র
ভনে তিনদিন সবুর করগো সবাই॥

তখন এই রূপেতে বিরহিনী বল্‌ছে পরস্পর। নবীনা ও প্রবীণাতে হয়ে একত্তর॥ হেনকালে শ্যামা বামা রমণী দুজন। নবীনের গৃহে আসি দিল দরশন॥ বলে ভাই একি কাণ্ড জগৎ যুড়ে হোল। কেহ

কেহ ব্লাক ফিবরেতে প্রাণে মলো॥ পাপেতে হইল পূর্ণ কলি হলো ঘোর। ছুঁচর গলায় চন্দ্রহার কুকুরে আতর॥ অদিনেতে বাদল হোচ্ছে অলোকের কথা। তাই মাসে দুট গ্রহণ প্রায় হচ্ছে হেথা॥ দিনে দিনে কলি কাল পূর্ণ হলো পাপে পৃথিবী যাবেন রসাতল বুঝি পরিতাপে। মহেশ্চন্দ্র দাসে কয় সবায় করি মানা। পরের মন্দকারি কভু হইওনা হইওনা॥ পশ্চাতে আছয়ে কাল জাননা জাননা। কখন হরিয়া লবে দেখিতে পাবেনা॥

রাগিণী সুরট। তাল আড়খেমটা।
শুন শুন সর্ব্বজন। করনাক কেহ কু আচরণ॥
মন্দ কর্ম্ম কল্লে পরে, ডেঙ্গু ধরিবে তাহারে,
যাবেন তিনি যমের ঘরে, তাইতে করি
নিবারণ॥ মান্যকর দেবগণে, যাতে সুখী
থাকবে মনে, শ্বরণেতে নারায়ণে, তরা-
বেন ভববন্ধন॥

সমাপ্তঃ।

[কৃতজ্ঞতা : দীপঙ্কর মাঝি]

স্বাস্থ্যনীতি

কে. শ্রীনাথ রেড্ডি

ভাষান্তর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে উচ্চতম পরিকাঠামো পর্যন্ত আমূল পরিশোধন প্রয়োজন সঠিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানের জন্য। বর্তমানে ভারতবর্ষ, Sustainable Development Goal (SDG) বা ''স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য'', যা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০২০ থেকে ২০৩০ স্থির করেছে, তাতে প্রবেশ করল। স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যের তিন নম্বর লক্ষ্য (SDG3) যা সকল দেশবাসীর জন্য সার্বিক সুস্বাস্থ্য প্রদানের কথা বলেছে। তাই এটা ভারতের কাছে সবথেকে বড় পরীক্ষা।

১. MMR বা মাতৃমৃত্যুর হারের অনুপাত বর্তমানের ১ লক্ষে ৭০ থেকে নামিয়ে আনতে হবে।

২. ৫ বছর অনূর্ধ শিশু মৃত্যুর হারও বর্তমানের এক হাজারে ২৫ থেকে নামতে হবে। যাতে সদ্যজাতের মৃত্যুর হার এক হাজারে ১২র নীচে নামিয়ে আনা যায়।

এর জন্য মা ও শিশুর পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দারিদ্র দুরীকরণ, শিক্ষার প্রসার এবং লিঙ্গসাম্য। এখানে অঙ্গনাড়ী কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

২০২৫ এর মধ্যে টি. বি. রোগ দেশ থেকে দূর করতে হবে। মশক বাহিত ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, চিকেনগুনিয়া আমাদের বড় সমস্যা। এইচ আই ভি-এডস্ কেও আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

পরিশ্রুত পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন বা স্বচ্ছ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য, শিশুকালের সার্বিক টীকাকরণ, সঠিক রোগনির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরবর্তী খোঁজখবর ও পরিষেবা—এ সবগুলো যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমেই সংক্রামক রোগসমূহ থেকে মুক্তি আসতে পারে।

তামাক, মদ ও অন্যান্য ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন করতে হবে। বায়ুদূষণ রোধ করতে হবে। মানুষের মানসিক সুস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

২০১৮ সালে 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প' চালু করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের ঘরের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে। এর জন্য ভারতবর্ষকে প্রভূত পরিমাণে স্বাস্থ্য সৈনিক—প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মী থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করতে হবে।

'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' নিম্ন আয় পরিবারের যথেষ্ট উপকারে আসবে।

মোটকথা সার্বিক লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারতবর্ষকে একটি শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলা হাসপাতাল তৈরী করতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলির শয্যাসংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে।

টেকনোলজির প্রভূত উন্নয়ন আমাদের উপরিউক্ত লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য আবিষ্কার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতিকে কাজে লাগাতে হবে এবং তার সুফল তৃণমূলস্তরে পৌঁছে দিতে হবে।

নাইট্রেট-এর বিপদ

আর্সেনিক ও ফ্লোরিনের ভয়াবহ দূষণের পর আমাদের রাজ্যে এসে উপস্থিত নাইট্রেট-এর বিপদ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান দপ্তরের গবেষকরা নদীয়ার চাপড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর-১ এবং কালীগঞ্জ ব্লকের বেশ কিছু ভূগর্ভস্থ জলের নমুনায় এবং খাদ্যশৃঙ্খলে পেয়েছেন মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রেট। মূলত অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল তুলে কৃষি এবং নাইট্রোজেন ভিত্তিক রাসায়নিক সারের ব্যবহার এর কারণ। নাইট্রেট দূষণের ফলে স্নায়ুতন্ত্র, ফুসফুস, অন্ত্র, ত্বক, চুল, নখ প্রভৃতির ক্ষতি হয়।

DENGUE MANAGEMENT PROTOCOL

MANAGEMENT OF DENGUE CASES AT PRIMARY HEALTH CARE LEVEL AND REFERRAL

–Comp. Snigdha Bandopadhyay & Gautam Mridha

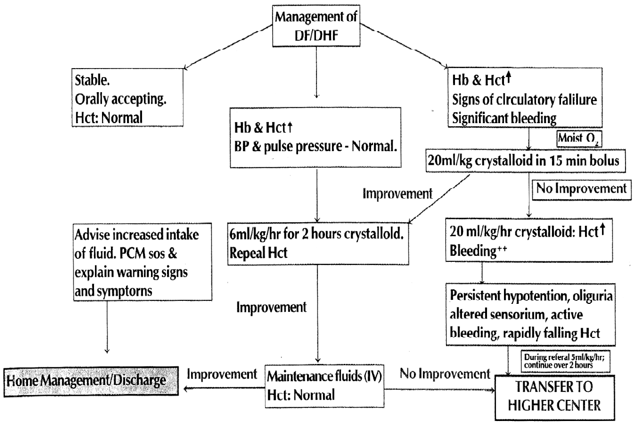

General Management of Dengue Fever (DF)

i. Management of dengue fever is symptomatic and supportive

ii. Bed rest is advisable during the acute phase.

iii. Use cold/tepid sponging to keep temperature below 38.5° C

iv. Antipyretics may be used to lower the body temperature. Aspirin/NSAIDs like ibuprofen, etc should be avoided since it may cause gastritis, vomiting, acidosis,platelet dysfunction and severe bleeding. **Do not even use combination of paracetamol plus above mentioned drugs.**

Paracetamol is preferable in the doses given below :

1 -2 years: 60 -125 mg/dose	3-6 years: 125 mg/dose
7-12years:250mg/dose	Adult: 500 mg/dose

v. Encourage oral intake to replace fluid loss from fever and vomiting. Small amounts of oral fluids should be given frequently for those with nausea and anorexia. The choice of fluids should be based on the local culture: coconut water, rice water or barley water. Oral rehydration solution or soup and fruit juices may be given to prevent electrolyte imbalance and are preferable to plain water. Commercial carbonated drinks (cold drinks)/ drinks that exceed the isotonic level (5% sugar) should be avoided. They may exacerbate hyperglycaemia related to physiological stress from dengue and diabetes mellitus. Sufficient oral fluid intake should result in a urinary frequency of at least 4 to 6 times per day. A record of oral fluid and urine output could be maintained and reviewed daily in the ambulatory setting.

vi. Patients should be monitored for 24 to 48 hours after they become afebrile for development of complications.

[Note: In children the dose of paracetamol is calculated as per 10-15 mg/Kg body weight per dose. Paracetamol dose can be repeated at intervals of 6 hrs depending upon fever and body ache.]

Advice in patient's card

What should be done?

* Adequate bed rest
* Adequate fluid intake : at least 5 glasses of other fluids (with electrolytes) in addition to normal daily intake of plain water e.g. milk, fruit juice (caution with diabetic patient), oral rehydration solution (ORS) or barley/rice water/coconut water

Note: Plain water alone may cause electrolyte imbalance

* Take paracetamol (as per doctors' advice; not more than 3 to 4 times in 24 hours in children)
* Tepid sponging
* Look for mosquito breeding places in and around the home and eliminate them

What should be avoided?

* Do not take acetyl salicylic acid (aspirin), mefenamic acid, ibuprofen or other NSAIDs or steroids. If you are already taking these medications please consult your doctor
* Do not take combination of paracetamol with above mentioned drugs
* Antibiotics are not necessary

If any of following is observed, the patient should be immediately taken to the nearest hospital; these are warning signs for dengue:

* Bleeding:
  - red spots or patches on the skin
  - bleeding from nose or gums
  - vomiting blood
  - black-coloured stools
  - heavy menstruation/vaginal bleeding
* Frequent vomiting or not able to drink
* Severe abdominal pain
* Drowsiness, mental confusion or seizures
* Pale, cold or clammy hands and feet
* Difficulty in breathing
* Dizziness
* No urination for 4-6 hours

Management of DHF Grade I and II

Any person who has dengue fever with thrombocytopenia, high haemoconcentration and presents with abdominal pain, black tarry stools, epistaxis, bleeding from the gums

etc.needs to be hospitalized. All these patients should be observed for signs of shock. The critical period for development of shock is during transition from febrile to afebrile phase of illness, which usually occurs after third day of illness. Rise of haemoconcentration indicates plasma leakage and loss of volume for which proper fluid management plays an important role. Despite the treatment, if the patient develops fall in BP, decrease in urine output or other features of shock, the management for Grade III/ IV DHF-DSS should be instituted.

Oral rehydration should be given along with antipyretics like Paracetamol, sponging, etc. as described above. The algorithm for fluid replacement therapy in case of DHF Grade I and II is given in Chart 1

Management of Shock (DHF Grade III/IV)

Immediately after hospitalization, the haematocrit, platelet count and vital signs should be examined to assess the patient's condition and intravenous fluid therapy should be started.The patient requires regular and continuous monitoring. If the patient has already received about 1000 ml of intravenous fluid, it should be changed to colloidal solution preferably Dextran 40 or if haematocrit further decreases fresh whole blood transfusion 10-20mI/kg/dose should be given.

However, in case of persistent shock even after initial fluid replacement and resuscitation with plasma or plasma expanders, the haematocrit continues to decline, internal bleeding should be suspected. It may be difficult to recognize and estimate the degree of internal blood loss in the presence of haemoconcentration. It is thus recommended to give whole blood in small volumes of 10ml/kg/hour for all patients in shock as a precaution.

Oxygen should be given to all patients in shock.

Treatment algorithm for patients with DHF Grades III and IV is given in Chart 2.

Chart 1: Management of DHF Grade I and II

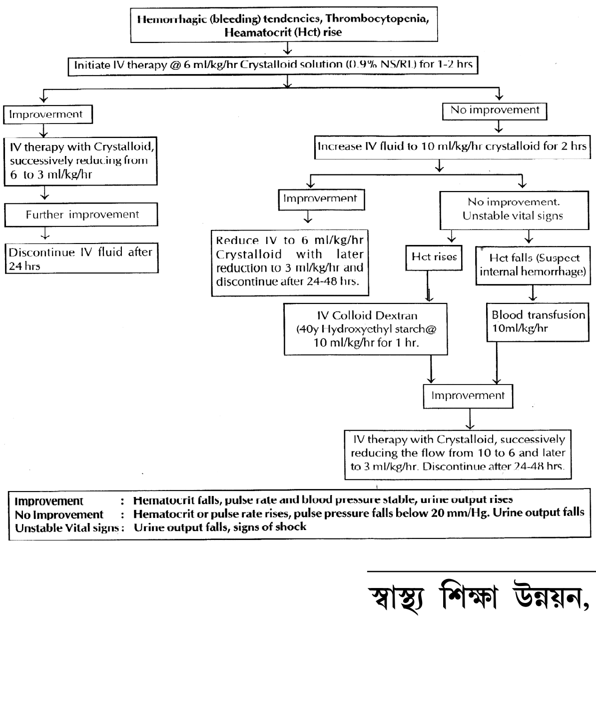

Chart 2: Management of Shock (DHF Grade III and IV)

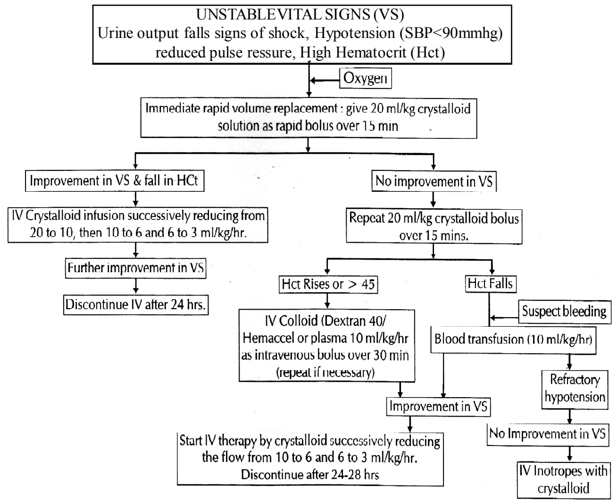

Chart 3: Management of compensated shock in children

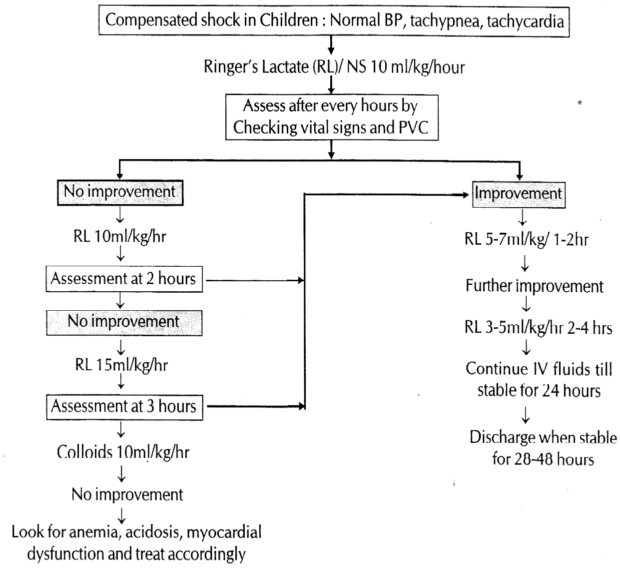

Chart 4: Management of hypotensive shock in children

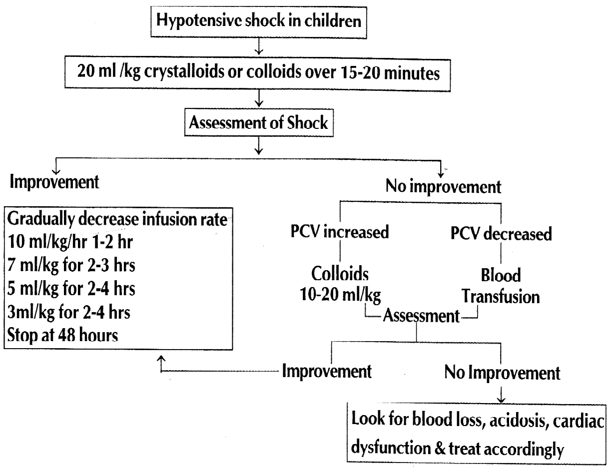

When to start and stop intravenous fluid therapy

Febrile phase

Limit IV fluids.

Early IV therapy may lead to fluid overload especially with non-isotonic IV fluid

Critical phase

IV fluids are usually required for 24-48 hours

NOTE: For patients who present with shock, IV therapy should be <48 hours

Recovery phase

IV fluids should be stopped so that extravasated fluids can be reabsorbed

Choice of intravenous fluids for resuscitation

Replacement of plasma lost because of increased vascular permeability is a mainstay of severe dengue management, particularly during the critical stage. Two main types of volume expander are used to replace lost fluid in the management of dengue fever: crystalloids and colloids. Crystalloids are aqueous solutions of mineral salts or other water-soluble molecules, whereas colloids contain larger insoluble molecules such as gelatin, dextrans or starches.

There is no clear advantage of the use of colloids over crystalloids in terms of the overall outcome. However, colloids may be the preferred choice if the blood pressure has to be restored quickly. Colloids have been shown to restore the cardiac index and reduce the level of haematocrit faster than crystalloids in patients with intractable shock and pulse pressure less than 10 mm Hg. One of the greatest concerns regarding colloid use is the impact on coagulation.

Crystalloids

Normal plasma chloride ranges from 95 to 105 mmol/L. Saline 0.9% is a suitable option for initial fluid resuscitation, but repeated large volumes of 0.9% saline may lead to hyperchloremic acidosis. Hyperchloraemic acidosis may aggravate or be confused with lactic acidosis from prolonged shock. Monitoring the chloride and lactate levels will help to identify this problem. When serum chloride level exceeds the normal range, it is advisable to change to other alternatives such as Ringer's Lactate.

Ringer's Lactate

Ringer's Lactate has lower sodium (131 mmol/L) and chloride (115 mmol/L) contents and an osmoiality of 273 mOsm/L. It may not be suitable for resuscitation of patients with severe hyponatremia. However, it is a suitable solution after 0.9% Saline has been given and the serum chloride level has exceeded the normal range. **Ringer's Lactate should preferably be avoided in liver failure and in patients taking metformin where lactate metabolism may be impaired.**

Colloids

The types of colloids are gelatin-based, dextran-based and starch-based solutions. One of the biggest concerns regarding their use is their impact on coagulation. Theoretically, dextrans bind to von Willebrand factor/ Factor VIM complex and impair coagulation the most. However, this was not observed to have clinical significance in fluid resuscitation in dengue shock. Of all the colloids, gelatin has the least effect on coagulation but the highest risk of allergic reactions. Allergic reactions such as fever, chills and rigors have also been observed in Dextran 70. Dextran 40 can potentially cause an osmotic renal injury in hypovolaemic patients.

What type of intravenous fluid therapy should we use?

- Use isotonic solutions (normal saline, Ringer's lactate)
- Colloids are preferred if the blood pressure has to be restored urgently

When are colloids given?

- Hypotensive shock
- Repeated shock - 2nd or 3rd shock and onwards
- After > 20 to 30 ml/kg of crystalloids
- If Hct does not decrease after crystalloid administration in shock state DOSE: Limited to 30 to 50 ml/kg/day

What intravenous fluids should not be used?

- Hypotonic solution, e.g. 0.45% saline, even during the febrile phase.
- Dextrose solutions should be limited to avoid hyperglycaemia, but may be used in hypoglycaemia with close blood glucose monitoring
- Albumin solutions

HOW MUCH & HOW FAST to run intravenous fluid?

- Give the minimum IVF required to maintain good perfusion and urine output of about 0.5 ml/kg/hr.
- Volume based on ideal body weight if overweight.
- Titrate to haemodynamic state and age

What does **"titrate IVF rate to haemodynamic state"** mean?

Reassess haemodynamic responses immediately after every IV bolus.

AFTER correction of shock:

Reduce IV infusion rate in step-wise manner whenever:

- Haemodynamic state is stable
- Rate of plasma leakage decreases towards end of critical phase indicated by:
  * Improving haemodynamic signs
  * Increasing urine output
  * Adequate oral fluid intake
  * Haematocrit decreases below baseline value in a stable patient

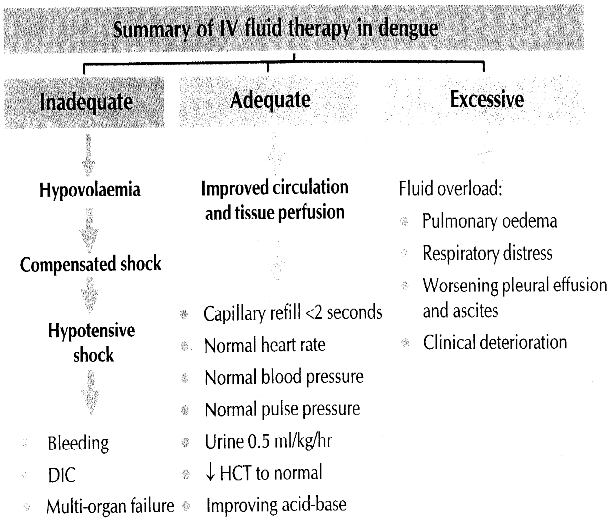

Table 3: Ideal body weight (IBW) for overweight/obese adults can be estimated based on the following formula

Female	Male
45.5 kg + 0.91 (height - 1 52.4cm) or	50.0 kg + 0.91 (height - 1 52.4 cm) or
45.5 kg + 2.3 kg for each inch over 5 ft	50 kg + 2.3 kg for each inch over 5 ft

Calculation of fluid

Required amount of fluid should be calculated on the basis of body weight and charted on a 1-3 hourly basis, or even more frequently in the case of shock. For obese and overweight patients calculation of fluid should be done on the basis of ideal body weight. The regimen of the flow of fluid and the time of infusion are dependent on the severity of DHF. The schedule given below is recommended as a guideline. It is calculated for dehydration of about 5% deficit (plus maintenance).

Table 4:

The maintenance fluid should be calculated using the Holliday-Segar formula as follows:

Body weight in kg	Maintenance volume for 24 hours
<10kg	100m l/kg
10-20	1000 + 50 ml / kg body weight exceeding 10 kg
More than 20 kg	1500 + 20 ml / kg body weight exceeding 20 kg

For intravenous fluid therapy of patients with DHF, following regimens of fluid are suggested: 1.5/ml/kg/hr, 3ml/kg/hr; 6ml/kg/hr; 10ml/kg/hr, and 20ml/kg/hr. For ready reference, the calculated fluid requirements, based on body weight and rate of flow of fluid volume for the five regimens are given in Table 5.

Bodyweight (in kgs)	Volume of fluid to be given in 24 hrs (Maintenance +5% deficit)
5	500+250 =750
10	1000+500 =1500
15	1250+750 =2000
20	1500+1000 = 2500
25	1600+1250 = 2850
30	1700+1500 = 3200
Body weight (in kgs)	**Volume of fluid to be given in 24 hrs (Maintenance + 5% deficit)**
35	1800+1750=3550
40	1900+2000=3900
45	2000+2250=4250
50	2100+2500=4600
55	2200+2750=4950
60	2300+3000=5300

Bodyweigh (in kgs)	Rate of fluid (ml/hours)				
	Regimen 1 1.5ml/kg R-1	Regimen 2 3ml/kg R-2	Regimen 3 6m l/kg R-3	Regimen 4 10ml/kg R-4	Regimen 5 20m!/kg R-5
5	8	15	30	50	100
10	15	30	60	100	200
15	23	45	90	150	300
20	30	60	120	200	400
25	38	75	150	250	500
30	45	90	180	300	600
35	53	105	210	350	700
40	60	120	240	400	800
45	68	135	270	450	900
50	75	150	300	500	1000
55	83	165	330	550	1100
60	90	180	360	600	1200

[Source : "Medical Officers Handbook for Clinical Management of Dengue", Dept. of Health & FW, Govt. W.B.]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অঙ্কের সেতু ধরে কালিনিনগ্রাদে

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

অপরূপ সুন্দর বাল্টিক সাগর, যার ঢেউয়ে অবিরাম স্নান করে চলেছে পৃথিবীর ন'টি দেশ-ডেনমার্ক, ইস্টোনিয়া, ফিনল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, সুইডেন, পোল্যান্ড, জার্মানি ও রাশিয়া। শেষোক্ত দেশটির একটি অংশ অদ্ভুতভাবে অবস্থান করছে বাল্টিক সাগরের ধারে-তার নাম কালিনিনগ্রাদ। পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও বাল্টিক সাগরে ঘেরা কালিনিনগ্রাদ মূল রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ঐরূপ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই রাশিয়ার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত সামরিক দিক থেকে। ২০১৮ সালে এই

কালিনিনগ্রাদ শহরের মানচিত্র

কালিনিনগ্রাদই মুখরিত হয়েছিল Luca, Etebo, Lovren, Granit প্রমুখের পদধ্বনিতে, বিশ্বকাপ ফুটবলের মঞ্চে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে ঐতিহ্যময় কালিনিনগ্রাদের প্রকৃতিও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এখানে আছে 'Dancing forest' যেখানে নানা ভঙ্গিতে প্যাঁচানো পাইন গাছের দেখা মেলে; অবশ্য কি কারণে তাদের ঐরূপ অবস্থা তা আজও অজানা। এছাড়াও কালিনিনগ্রাদ বিখ্যাত তার Amber-ভাণ্ডারের জন্য। লক্ষাধিক বছর ধরে সৃষ্ট উদ্ভিদ রজনের জীবাশ্ম Amber যার মধ্যে প্রায়শই বন্দী থাকে প্রাচীন পৃথিবীর জীবনের নিদর্শন-বীজ, পাতা, পোকামাকড় প্রভৃতি; ঠিক যেন প্রকৃতির হাতে গড়া বিগত সময়ের আয়না।

এহেন কালিনিনগ্রাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র কালিনিনগ্রাদ শহর প্রেগোলিয়া নদীর মোহনায় অবস্থিত। এই শহরটি দার্শনিক Immanuel Kant-এর জন্মস্থানও বটে। অবশ্য সেই সময় এই শহরের নাম ছিল কোনিন্সবার্গ (Königsberg)-যে শহর জন্ম দিয়েছিল এক এমন প্রশ্নের যার সমাধান পথ প্রশস্ত করেছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির।

কিন্তু সেই প্রশ্ন বুঝতে গেলে জানা দরকার কোনিন্সবার্গের অবস্থানকে। শহরের মধ্য দিয়ে বহমান প্রেগোলিয়া নদী, নদীবক্ষে দুটি দ্বীপ-Kneiphof ও Lomse। অর্থাৎ সমগ্র শহরটি চারটি ভাগে বিভক্ত, নদীর দুই ধারে দুটি, নদীর মধ্যে আরও দুটি। এই চারটি ভাগ পরস্পরের সাথে সাতটি সেতু দিয়ে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই ঐ শহর ঘুরতে গেলে সেতুগুলিকে ব্যবহার করতে হয়। শহরবাসীদের কাছেও তাদের সুন্দর শহরের পরিভ্রমণ করা ছিল বিনোদনের অঙ্গ। এই বিনোদন থেকেই উঠে আসে সেই প্রশ্ন যা মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন রত্নের সন্ধান দেয়—"এমন চলার পথ কি পাওয়া সম্ভব যাতে প্রতিটি সেতুকেই পার করা যাবে কিন্তু কেবলমাত্র একবারের জন্য অর্থাৎ কোনো সেতুকেই একবারের বেশি অতিক্রম করা যাবে না?"

সামান্য খেয়ালই বটে, কিন্তু সেই খেয়ালেই এক নতুন পথের খোঁজে মেতে উঠল মানুষ। অথচ অনেক চেষ্টা করেও সেই কাঙ্ক্ষিত পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। যেভাবেই চেষ্টা করা হোক না কেন, হয় একটা সেতু বাদ যাচ্ছে অথবা একই সেতু দুবার অতিক্রম করতে হচ্ছে। তাহলে কি এই খামখেয়ালিপনার কোনো সমাধান নেই, নাকি সমাধান থাকলেও তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না? এমন পরিস্থিতিতে এই সমস্যা গিয়ে পৌঁছল বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লিঁওনার্দ অয়লারের কাছে। ঘটনাচক্রে ১৭২৭ সাল থেকেই অয়লার ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে যা কোনিন্সবার্গ থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। অবশ্য অয়লার প্রথমদিকে এই সমস্যাকে সেরকম আমল দেননি কারণ এর সাথে গণিতের কোনো সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেননি। কিন্তু অঙ্ক কোথায় নেই? আপাতদৃষ্টিতে যা নিছকই এক খেয়ালমাত্র ছিল তাই কড়া নাড়ল গণিত জগতের এক নতুন দরজার। অয়লার অপর এক গণিতজ্ঞ জিওভানি মারিননি-কে লিখলেন, "This question is so banal, but seemed to me worthy of attention in that geometry, nor algebra, nor even the art of counting was sufficient to solve it."

লিঁওনার্দ আয়লার

অবশেষে ১৭৩৫ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ অ্যাকাডেমি পেল অয়লারের সমাধান যা ১৭৪১ সালে প্রকাশিত হল এই শিরোনামে—Solutio problematics ad geometrian situs pertinentis (The solution of a problem relating to the geometry of position).

মজার কথা এই যে, এরপরও অয়লার এক চিঠিতে কার্ল এহলার-কে লেখেন,

“I do not know why even questions which bear so little relationship to mathematics are solved more quickly by mathematicians than by others.”

প্রসঙ্গত, এহলারের অনুরোধেই মূলত সাতটি সেতুর সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন অয়লার।

কিন্তু তিনি ঠিক কি করেছিলেন তা বুঝতে গেলে স্কুলে করা একটা অঙ্কের কথা মনে করতে হবে—২.১ মিটার দীর্ঘ, ১.৫ মিটার প্রশস্ত একটি আয়তঘনাকার চৌবাচ্চার অর্ধেক জলপূর্ণ আছে। ঐ চৌবাচ্চায় আরও ৬৩০ লিটার জল ঢাললে জলের গভীরতা কতটা বৃদ্ধি পাবে?”

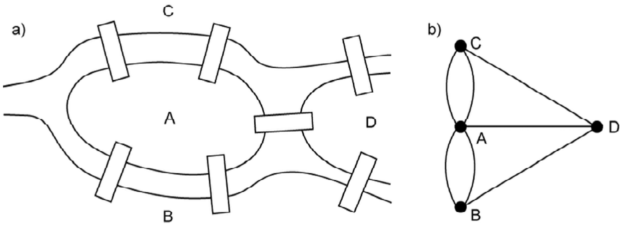

সেতুগুলির গাণিতিক অবস্থান

অঙ্কটি করতে গেলে কি আদৌ ‘অর্ধেক জলপূর্ণ’-এই শব্দ দুটি অপরিহার্য? আসলে অঙ্কের সমাধান নির্ণয় করতে গেলে ‘পাখির চোখ’ দেখাটা খুব প্রয়োজন। তাই সেতু সমস্যা সমাধানে ‘পাখির চোখই দেখেছিলেন অয়লার’। সেই অয়লার যিনি চোখের সমস্যার কারণে পরিচিত হয়েছিলেন আরও এক নামে—‘Cyclops’ (গ্রীক পুরাণে বর্ণিত এক চক্ষু দৈত্য) এবং পরবর্তীকালে সম্পূণরূপে অন্ধও হয়ে যান তিনি। ফিরে আসা যাক অয়লারের সমাধানে। অয়লার বুঝতে পেরেছিলেন যে সেতু সমস্যা সমাধান করার জন্য শহরের মধ্যে কোথায়, কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তা দেখা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর কাছে সমগ্র সমস্যাটি ধরা দেয় চারটি ভূমিখণ্ড A,B,C,D ও তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা সাতটি সেতুর আকারে।

আরও ভালোভাবে বললে চারটি বিন্দু A,B,C,D ও তাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা রেখার আকারে। যেখানে A পাঁচটি এবং B,C.D তিনটি করে রেখা (বা সেতু)-র সাথে যুক্ত। সমস্যা অনুযায়ী কোনো বিন্দু (বা ভূমিখণ্ড)-তে যাওয়ার জন্য একটা রেখা (বা সেতু) দরকার, বেরোনোর জন্য অবশ্যই আরও একটা; কারণ একই সেতু একবারের বেশি অতিক্রম করা যাবে না। এই কারণেই যাত্রাপথের শুরু বা শেষের বিন্দু (বা ভূমিখণ্ড) ছাড়া অন্তর্বর্তী বিন্দু (বা ভূমিখণ্ড)-গুলিকে অতিক্রম করতে গেলে প্রতিটির সঙ্গে দুটি রেখা (বা সেতু) যুক্ত থাকতেই হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে B বিন্দু (বা ভূমিখণ্ড)-কে একবার অতিক্রম করতে দুটি রেখা (বা সেতু) লাগবে। B বিন্দু (ভূমিখণ্ড)-কে সমগ্র যাত্রাপথে যতবার অতিক্রম করতে হবে তার দ্বিগুণসংখ্যক রেখা (বা সেতু) লাগবে। অর্থাৎ যাত্রাপথের প্রাথমিক ও অন্তিম বিন্দু (বা ভূমিখন্ড) ছাড়া অন্য প্রতিটি বিন্দু (বা ভূমিখন্ড)-র সাথে জোড়সংখ্যক রেখা (বা সেতু) যুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু A.B.C.D প্রতিটি বিন্দু (বা ভূমিখণ্ড)-এর সাথে যুক্ত রেখা (বা সেতু)-র সংখ্যা বিজোড়। সুতরাং কোনিন্সবার্গের সমস্যার কোনো সমাধান নেই।

কিন্তু সত্যিই কি সমাধান সম্ভব নয়? অয়লার দেখালেন যে বিজোড়সংখ্যক রেখার সাথে যুক্ত বিন্দুর সংখ্যার যদি দুই বা শূন্য হয় তাহলে এমন পথ পাওয়া সম্ভব যাতে প্রতিটি রেখাকে অবশ্যই একবার কিন্তু কেবলমাত্র একবারই অতিক্রম করা যাবে। অর্থাৎ কোনিন্সবার্গে যদি মাত্র একটি সেতুও ভাঙা হোত অথবা আরও একটি সেতু গড়া হোত যাতে বিজোড়সংখ্যক সেতুর সঙ্গে যুক্ত ভূমিখন্ডের সংখ্যা দুই হয়ে সম্ভব হোত বহুকাঙ্খিত পথের সন্ধান পাওয়া।

অষ্টাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ অয়লার বুঝেছিলেন তিনি এক নতুন দিগন্তকে ছুঁয়ে ফেলেছেন। একটা শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ও তার মধ্যে থাকা সেতুগুলিকে তিনি হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছেন সামান্য কয়েকটি বিন্দু ও রেখার মাধ্যমে। তাঁর নতুন চিন্তাধারা জ্যামিতির সেই পথের সূচনা করল যেখানে দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের কোনো গুরুত্ব নেই, এই জ্যামিতি শুধুমাত্র অবস্থানের। সত্যিই তো, কোনিন্সবার্গের ঐ বহুচর্চিত সমস্যার সমাধানে সেতুর দৈর্ঘ্য বা যাত্রাপথের দৈর্ঘ্যের কোথায় প্রয়োজন হল?

গণিতের পৃথিবীতে দৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল দুইটি নতুন ক্ষেত্রের—Topology ও Graph Theory, যাদের গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রয়োগের দিকটা একটু দেখা দরকার।

ডি.এন.এ-র উপর কিছু বিশেষ উৎসেচকের প্রভাব বিশ্লেষণ অথবা স্নায়ুতন্ত্রের খুঁটিনাটি বুঝতে, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি থেকে রোবোটিক্স, এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর যে বারকোড থাকে সেখানেও টোপোলজির ছোঁয়া বিদ্যমান। অন্যদিকে কম্পিউটার চিপের নক্সা হোক বা Website-এর গঠন অথবা জীববিজ্ঞান, ভাষাবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান-কোথায় নেই গ্রাফ থিওরি?

বর্তমান যুগে গণিতের এই দুই শাখার প্রয়োগের ক্ষেত্র এতটাই সুবিস্তৃত যে তার সম্পূর্ণ বর্ণনা দু-এক কথায় বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা সহজেই অনুমেয় যে তিনশো বছর আগে নির্ণীত সেই সমাধান যা এক খেয়ালের জবাব ছিল, তা আজ অত্যাধুনিক এক সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবস্থান করছে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কোনিন্সবার্গের সেই সাতটি সেতুর মধ্যে দুটিকে বিনষ্ট করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, আরও দুটি ভেঙে পরবর্তীকালে তৈরি করা হয় হাইওয়ে; শাসনের বদল হয়, প্রোগোলিয়া নদী দিয়ে বয়ে যায় অনেক জল। নির্মাণ থেকে ধ্বংস, আনন্দ থেকে হাহাকার-সব কিছুর সাক্ষ্য বহন করে কোনিন্সবার্গ আজ হয়েছে ‘কালিনিনগ্রাদ’। কিন্তু সেই প্রশ্নের বর্ণময়তা আজও অমলিন হয়নি, সেই প্রশ্ন আজও এই মানবজাতিকে শিখিয়ে যাচ্ছে একটাই সত্য-প্রশ্নের হাত ধরেই এগোয় আমাদের সভ্যতা। তাই প্রশ্ন করা থামালে চলবে না। প্রশ্ন করতে হবে, প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হবে।

সাইক্লোট্রনের শহর

বিকাশ সিংহ

লেখক পরিচিতি : INSA Senior Scientist and former Homi Bhaba Professor, DAE, former Director, Saha Institute of Nuclear Physics and Variable Energy Cyclotron Center.

(ভাষান্তর : অঙ্কিতা সেনগুপ্ত)

তাপীয় আয়নীকরণ সমীকরণের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিপ'দার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাই ভারতে সর্বপ্রথম সাইক্লোট্রনের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, যা কিনা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারনিবাসী রাদারফোর্ড আবিষ্কার করেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস। অতি পাতলা একটি স্বর্ণপাতের উপর তিনি হিলিয়াম (আলফা কণা) নিক্ষেপ করেন যা কিনা ঐ পাতে অবস্থিত পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ধাক্কা খেয়ে প্রায় বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হয়। রাদারফোর্ড নিজে রসিকতার সুরে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতেন এই বলে—"If you fire a bullet at a blotting paper and the bullet comes right back at you"। আবিষ্কৃত হল পরমাণুর কেন্দ্রস্থল, নিউক্লিয়াস।

১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারি মেঘনাদ সাহা কলকাতায় স্থাপন করেন Institute of Nuclear Physics; উদ্বোধন করেন নোবেল লরিয়েট প্রফেসর মাদাম কুরি জোলিয়ট। মেঘনাদ সাহা তখন জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত। সেইসময়ে তাঁর এইভাবে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার জগতে পদার্পণ কিন্তু খুব একটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। ঘটনাচক্রে ওনার ছাত্র বি. ডি. নাগ চৌধুরী বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে আর্নেস্ট লরেন্সের সাথে কাজ করছিলেন। সাইক্লোট্রনের আবিষ্কর্তা লরেন্স এই শহরের বুকে সাইক্লোট্রন স্থাপনের কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগের মাঝেই আমেরিকা থেকে পাড়ি দিল ভ্যাকুয়াম পাম্পসহ সাইক্লোট্রন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের একটি বড় অংশ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, খুব সম্ভবত অতলান্তিক মহাসাগরে ডুবেই চিরতরে হারিয়ে যায় সেটি।

যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৪৭ সালে আমেরিকাতে ফিরে যান নাগ চৌধুরী। ১৯৪৮ সালের মধ্যে সাইক্লোট্রনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কলকাতায় আসতে শুরু করে এবং নির্মাণকাজও শুরু হয়ে যায়। খুব শীঘ্রই সেটি কাজ করাও আরম্ভ করে কিছু সময়ের জন্য। এটি ছিল কলকাতার প্রথম সাইক্লোট্রন, এক যুদ্ধের ভয়াবহতার ফসল।

ষাটের দশকে তখন Bhaba Atomic Research Centre-এ পদার্থবিদ্যার প্রধান ছিলেন ডঃ রাজা রামান্না। তিনি Saha Institute-এ একজন কাউন্সিল মেম্বারও ছিলেন। সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর জন্য এমন একটি সাইক্লোট্রনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন যা তৈরি হবে ভারতীয় প্রযুক্তিতে এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা। প্রায় তলানিতে ঠেকে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় বাধ্য করেছিল স্বনির্ভরতা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের দিকে যেতে। একদিকে নকশাল আন্দোলনের প্রচণ্ডতা এবং অন্যদিকে চরম বৈদ্যুতিক বিভ্রাটের মাঝে জীবন মোটেও সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও ডঃ রামান্নার চেষ্টায় সাইক্লোট্রন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন পাওয়া গেল ডঃ হোমি জাহাঙ্গির ভাবার নেতৃত্বাধীন ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের কাছ থেকে। এবারের সাইক্লোট্রনটি প্রায় লরেন্সের বার্কলে সাইক্লোট্রনের মতই। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডেরই ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা ও বি. ডি. নাগচৌধুরী।

কিন্তু বিদ্যুতের সমস্যা তখন এতটাই ব্যাপক ছিল যে ডঃ রামান্না এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে এই তরুণ নিবেদিতপ্রাণ ইঞ্জিনিয়াররা বেশিরভাগ কাজ তখনই করবে যখন রাতে নিদ্রামগ্ন শহরে বিদ্যুতের চাহিদা কমে যাবে। রসিকতার সুরে ডঃ রামান্না এই সাইক্লোট্রনটির নাম দিয়েছিলেন পৃথিবীর "first nocturnal cyclotron"। সৌভাগ্যবশত নকশালপন্থীরাও এই ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামায়নি কারণ বিজ্ঞানীরাও সেরকমভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না।

১৯৬৯-এর মধ্যে পরিকল্পনামাফিক অর্থের জোগান শুরু হয়ে যায়। সেইদিনগুলি সত্যিই রোমাঞ্চকর ছিল; নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরা সকাল সকাল অফিস গিয়ে সন্ধ্যে-সন্ধ্যে ফেরত আসার অর্থাৎ সমাজের 'থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়' নিয়মের বিপরীতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন যা সার্থক হয়েছিল। রাতে কাজ করেও যেভাবে দ্রুতগতিতে কাজ এগোচ্ছিল তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। চলতি হাওয়ার অনেক আগেই এই সাইক্লোট্রনের নব্বই শতাংশ ছিল "made in India"। একথা মনে রাখা দরকার একটা সাইক্লোট্রন বানানোর মত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো কিন্তু ষাটের দশকে একেবারে তৈরি অবস্থায় ছিল না।

রাঁচির "Heavy Engineering Corporation' ২০০ টনের চুম্বকটি বানিয়েছিল। সাইক্লোট্রনে প্রোটন বা হিলিয়াম বৃত্তাকার পথে ঘোরে এবং একটি বৃত্তাকার পথ থেকে তার বাইরের বৃত্তাকার পথে গেলে শক্তি অর্জন করে। সাইক্লোট্রনের এই বিপুল শক্তির চালক রেসোনেটর ট্যাঙ্কটি তৈরি করে Garden Reach Ship-builders and Engineers (GRSE)। সাধারণত তারা জলরোধক জাহাজ বানালেও এবার দরকার ছিল বায়ুনিরোধী চেম্বার যা তৈরি করা ছিল অনেক শক্ত কাজ। যাকে বলা যায় "necessity is the mother of invention"-এর যথার্থ উদাহরণ।

অনুমোদনের আট বছরের মধ্যে ১৯৭৭-এর ১৬ই জুন সকাল সাড়ে তিনটেতে পাওয়া গেল হিলিয়ামের প্রথম আভ্যন্তরীণ স্রোত। নকশাল আন্দোলনের উদ্দামতা, বিদ্যুতের তীব্র সঙ্কট আর চরম রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মধ্যে এইভাবেই গঠিত হয়েছিল "The first nocturnal cyclotron of the world"। পরিকাঠামোর দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও এই সাইক্লোট্রনটির শক্তি বার্কলের সাইক্লোট্রনের সমান।

এই সাফল্য ছিল অতুলনীয়। যদিও প্রথমদিকে কিছু ধাক্কা অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের "shutdowns" হচ্ছিল। কিন্তু একবার যখন সেটা চলতে শুরু করল অবিশ্রান্তভাবে দিনের ২৪ ঘণ্টা ধরে চলতে লাগলো কোনরকম অসুবিধা ছাড়াই। অনেকধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হতো এই মেশিন দিয়ে; সারা দেশ থেকে কলকাতায় আসত কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা। ডঃ রামান্নার স্বপ্ন তখন এক ঘোর বাস্তব, প্রকল্পের তৎকালীন ডিরেক্টর আস দিভাতিক (As Divatic) ও তাঁর দল এক অনবদ্য কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। বোস, সাহা আর রমনের দেশের অহংকারে আরও এক সংযোজন সাইক্লোট্রন। এ ছিল বিপ্লব যা এনেছিল পরিবর্তন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জগত থেকে "city of joy" এসে দাঁড়িয়েছিল গবেষণামূলক পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার দুয়ারপ্রান্তে, আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে।

এখনও পর্যন্ত ঐ মেশিন কিন্তু এক সাবলীল জেট ইঞ্জিনের মতই অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি 'night shift'-এ থাকা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা চাইলেই দু-একজন অপারেটার রেখে স্বচ্ছন্দে বাড়ি চলে যেতে পারেন। এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল যেখানে বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা হাতের নাগালের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে গবেষণার কাজ করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু রুম টেম্পারেচার সাইক্লোট্রনটিকে চালাতে যথেষ্ঠ পরিমাণে বিদ্যুতের প্রয়োজন হচ্ছিল। অনেক ভাল ও নজর কাড়ার মত গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিপুল শক্তির প্রয়োজন এক প্রকার বোঝার মতই মনে হচ্ছিল। যাইহোক, আমার কিছু তরুণ সহকর্মী কয়েকটি উচ্চমানের গবেষণায় ত্রুটি পেয়েছিলেন, ফলাফল পৃথিবীখ্যাত জার্নালগুলিতে আজকের দিনেও ছাপা হচ্ছে।

অতএব, এরপর লক্ষ্য ছিল এমন এক সাইক্লোট্রন বানানো যা হবে উচ্চশক্তিসম্পন্ন আর সুপারকন্ডাক্টিং। এর জন্য দরকার তরল হিলিয়ামে (-২৬৯° সে উষ্ণতায় বা পরম শূন্য তাপমাত্রার চেয়ে চার ডিগ্রি কেলভিন বেশি উষ্ণতায় তরলে পরিণত হিলিয়াম গ্যাস) নিমজ্জিত নিউবিয়াম টাইটানিয়াম যৌগের তার। এই তারগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় নিতান্তই নগন্য রোধের সম্মুখীন হয়, ফলে এটি হয়ে যায় "superconducting"। প্রায় রোধহীন হওয়ার জন্য বিদ্যুতের খরচ হয় না বললেই চলে। সাইক্লোট্রন চালানোর খরচও বেশ কমে যায়। এই সাইক্লোট্রনটির শক্তিও রুম টেম্পারেচার সাইক্লোট্রনের তিনগুন।

এটা সহজে অনুমান করা যায় যে এই সাইক্লোট্রনটির প্রযুক্তি পূর্ববর্তী সাইক্লোট্রনটির তুলনায় অনেক বেশি জটিল। আমেরিকাতে এইরূপ সাইক্লোট্রন রয়েছে তিনটি, দুটি Michigan State University ও একটি টেক্সাস, অস্টিনে। মিশিগানের একটি সাইক্লোট্রন তো বেশ শক্তিসম্পন্ন। তবে পৃথিবীর সর্বোন্নত সুপারকন্ডাক্টিং জোড়া সাইক্লোট্রনের মালিক হওয়ার কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব করতে পারে জাপান। সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রনের জনক আমেরিকান পদার্থবিদ হেনরি ব্লসার একবার আমাকে এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রন "is a real bitch, she will tease you like mad"। আমি আমার আরও কিছু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় সহকর্মীদের সাথে এই কাজে ঝাঁপালাম। আমরা জানতাম যে আমরা খুব বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।

প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন ছিল ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের কাছে যাওয়া যার তৎকালীন প্রধান ছিলেন ডঃ পি কে আয়েঙ্গার। একজন অনবদ্য টেকনোক্র্যাট ও অসাধারণ পদার্থবিদটি বেশ উদ্যমী মানুষ হলেও মাঝে মাঝেই কি করতে চলেছেন তা আগে থেকে আঁচ করা যেত না। দিল্লিতে যখন কমিশনের বৈঠকে সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রনকে আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করা হল তখন আমাকেই এর পক্ষে বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছিল। অর্থমন্ত্রকের এক উর্ধ্বতন আমলা পরিহাস করে বললেন, "I think this amount of money can be much better spent on building a road in rural India"। এক গভীর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। আমি প্রত্যুত্তরে বললাম "It is more to the point to build a superconducting cyclotron in India even a rarity is Asia, indeed in the world rather than building a road to nowhere"। সেই আমলা ছাড়া আর সবাই হেসে ফেলল। সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রনের জন্য অনুমোদন পাওয়া গেল। এক আসন্ন ইতিহাসের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমি নিজেও তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রনের সবচেয়ে জটিল অংশটি হল ক্রায়োস্যাট। এটি হল তরল হিলিয়াম পূর্ণ পাত্র যাতে সুপারকন্ডাক্টিং তারের কয়েল নিমজ্জিত থাকে। এই কয়েলগুলি সক্রিয় হলে প্রয়োজনীয় চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। আমরা একদিকে হরিদ্বার থেকে তিরুচিরাপল্লি, অন্যদিকে বোম্বে থেকে দিল্লি—ভারতের সর্বত্র চষে ফেললেও আশানুরূপ পরিমান পাওয়া গেল না। আমরা ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানিগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেও কেউ কোন যুতসই প্রস্তাব উপস্থাপিতই করতে পারল না। বেশিরভাগের পছন্দ না হলেও "Make in India" আদর্শকে ত্যাগ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমি ফ্রান্সের বিখ্যাত Ansaldo Company-র কাছে গেলাম এবং ক্লান্তিকর আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে চুক্তিতে সই করা হল।

অবশেষে ১৮ই জুন ১৯৯৭ সালে ভিত্তি স্থাপন করলেন

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। হেনরি প্লসার সঠিক ছিলেন। যেহেতু ক্রায়োজেনিক (তরল হিলিয়াম সম্পর্কিত) প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই প্রয়োজন ছিল প্রথম থেকে সবকিছু শেখার এবং সামনে এগোনোর জন্য কঠোর পরিশ্রমের। সমগ্র প্রক্রিয়াটি ছিল ধীরগতির কিন্তু চাহিদাপূর্ণ।

৪২ কিমি দীর্ঘ সুপারকন্ডাক্টিং তারের কয়েল ওয়াইন্ডিং করার কাজও বেশ দুরূহ ছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে পুনের একটি ছোট ফার্ম "R & D philosophy"-তে বিশ্বাস করতো। ফার্মটির প্রধান MIT থেকে পিএইচডি করলেও মোটা মাইনের নিশ্চিন্ত চাকরি না করে, কিছু উৎসাহী নতুন চিন্তাধারার সহযোগীদের সাথে "R&D" প্রকল্পের পথেই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে ওয়াইন্ডিং মেশিন যথাস্থানে পৌঁছে গেল। বিল্ডিং-এর নকশা তৈরির পর অবশেষে সেটি নির্মিত হল; যথারীতি, যা ভাবা হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি সময় লাগল কারণ তেজস্ক্রিয়তা থেকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হয়েছিল। চুম্বক তৈরি করে এবারও "Heavy Engineering Corporation" অনবদ্য কীর্তি স্থাপন করল। অবশেষে বারো বছরের পরিশ্রমের পর ২০০৯ সালের ২৫শে আগস্ট সকাল চারটের সময়ে সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রনের আভ্যন্তরিন স্রোত দেখা গেল। এই বিরাট কৃতিত্বের কথা আমি আরও কয়েকটি দেশকে জানালাম। আণবিক শক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চ্যবন বেশ সুন্দর বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু লোক তখনও খুশি ছিলেন না। তাদের বক্তব্য এটাই ছিল যে বহির্স্রোত না পাওয়া সত্বেও কেন সাইক্লোট্রনের সাফল্যের দাবি করা হচ্ছে। আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। আমি যখন লন্ডনের King's College-এ রিসার্চ ফেলো ছিলাম তখন থেকেই সাইক্লোট্রনের সাথে যুক্ত। আভ্যন্তরিন স্রোত পাওয়ার পরই মিশিগানের সাইক্লোট্রনটিকে কার্যকরী ঘোষণা করা হয়েছিল। মিশিগানে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন যেখানে এই সাফল্য উদযাপন করা হয়েছিল সেখানে আমিও ছিলাম। কিন্তু এই অখুশি মানুষগুলি অখুশিই থেকে গেলেন। নিজেদের অনভিজ্ঞতার জন্য এঁরা ব্যর্থতা বা সাফল্যহীনতার সাথেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই সাফল্যের বিরোধিতা করেছিলেন।

বহির্স্রোত পাওয়ার জন্য সাইক্লোট্রনের স্রোতকে একটি জটিল চৌম্বকীয় ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পাঠাতে হয় যেখানে কৌশল প্রয়োগের সুযোগ অতি অল্প। এই কাজ খুব সোজা নয়। আসলে আমিও জানতাম যে এই কাজ করতে গিয়ে মিশিগানে সমস্যা হয়েছিলো; এমনকি মিশিগানের অভিজ্ঞতার পরও টেক্সাসে অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী? আমি কৃতকার্য হওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ম্যাপিং করে এগোতে বলেছিলাম। যন্ত্রণাদায়ক ও ক্লান্তিকর পরিশ্রমের পর যখন আমাদের প্রচেষ্টা গভীর হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলো, তখনই ২৬শে নভেম্বর ২০১৯-এ বহির্স্রোতের দেখা মিলল। আমি কখনও এত গর্ব অনুভব করিনি, বর্তমান ডিরেক্টর ডঃ সুমিত সোম ও তাঁর দল দুর্দান্ত কাজ করেছিলেন।

ভারতে, সাধারণত সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতাই আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে। সবকিছুরই মধ্যেই অভাব এর মূল কারণ। আমরা জন্মগতভাবেই নিরাশাবাদী হই। কিন্তু ২৬শে নভেম্বর ২০১৯-এ শুধুমাত্র আমিই যে সঠিক প্রমাণিত হলাম তা নয়, এটাও অনুভব করলাম যে আজকের ভারতীয় যুবসমাজ অনেক বেশি আশাবাদী। তারা বিগত বছরগুলির দারিদ্র্য দেখেনি, অনুভবও করেনি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই সততাপরায়ন তরুণসমাজ সত্যিই ভারতকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। রাজনীতির কথা ভুলে যাওয়াই উচিৎ।

ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকজন ভাবতে শুরু করেছিল যে রুম টেম্পারেচার সাইক্লোট্রন থেকে সুপারকন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রন পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জনসাধারণের জন্য এমন কিছু করা উচিৎ বা সমাজের পক্ষে হিতকর হবে।

আমার মনে হল ক্যান্সার টিউমার নির্ণয়ের জন্য বিশেষ আইসোটোপ উৎপাদন করতে পারে এমন নির্ভরশীল মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন আনা দরকার। আমি আমার এক অঙ্কোলজিস্ট বন্ধুর কাছে জেনেছিলাম যে প্রোস্টেট ক্যান্সার যদি সময়মতো ধরা পরে তাহলে তার সঠিক চিকিৎসা হল প্যালেডিয়াম আইসোটোপ। এটি বিদেশ থেকে প্রায় সাধ্যাতীত খরচায় আনানো হয়। কার্ডিওলজিস্টরা আমায় বললেন যে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতার "prognosis" করার জন্য প্রয়োজনীয় থ্যালিয়ামও অত্যন্ত দামী।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিস্তর ছোটাছুটির পর (The Statesman - 30 November 2018) অবশেষে বেলজিয়ামের কোম্পানি IBA-এর কাছ থেকে "30 meV" সাইক্লোট্রন কেনার জন্য আর্থিক অনুদান দিতে ভারত সরকার সম্মত হল। এবারের কাজও ছিল বেশ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে পাঁচ একর জমি দান করেছিলেন সেটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন নেওটিয়া হাউসিং কমপ্লেক্সের কাছে এটি "garden of cyclotron"। শীততাপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বড়ো বাক্সে কিছু সময়ের জন্য মেশিন রাখা হয়েছিল যতক্ষণ না বিল্ডিং তৈরি হয়। আমার চিন্তা ছিল যে এত সময়ের জন্য পড়ে থাকলে মেশিনে মরচে না ধরে যায়। কিন্তু ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮-এ যখন মেশিনটি সচল হয়ে যেন প্রায় যাদুবলে কাজ করতে শুরু করল তখন সকল চিন্তাই দূর হয়ে গেল।

এখন কলকাতায় তিনটি সাইক্লোট্রন কোনপ্রকার সমস্যা ছাড়াই কাজ করছে। অনেক বছর আগে বঙ্গ নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ সময়ে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং সাহিত্য বাংলার অন্তরাত্মাকে উজ্জীবিত করেছিল। সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রেই তখন এর ব্যক্তিক্রম ঘটেনি।

এখন এই বাংলায় বিজ্ঞান পর্দানশীন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানজগতের বাইরে কেউই জানে না বিজ্ঞান ও সাহিত্যে কোথায়

কি ঘটে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরাও গবেষণাপত্র প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকছেন, সাহিত্য ও থিয়েটারও সঙ্কীর্ণ, প্রাদেশিক ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমরা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি নিয়েই খুশি, সারা বিশ্বের কি হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নই।

ভোগবাদ ও 'মোর্চা' রাজনীতি আমাদের সমাজের অনেক গভীরে ছড়িয়ে গেছে। কোথায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল, বোস, সাহা বা মহলানবীশ যাঁর নিজ নিজ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন তাঁদের মতো একজনও কোথায়? কোথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার এককণাও যাঁর মধ্যে আছে এমন কেউ? একজন বাঙালি হিসেবে আমি ভীষণ হতাশা বোধ করি। একথা ঠিক যে আমাদের অনেক প্রতিভাধর ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিন্তু তারা অধিকাংশই বিদেশে গিয়ে নিজের নাম উজ্জ্বল করাটাই শ্রেয় মনে করে। বাংলাকে মধ্যগগনে আনার জন্য কোন ইচ্ছা কারো মধ্যে নেই, নেই কোন দায়বদ্ধতা। আমাদের নিজেদেরটা নিয়েই আমরা আনন্দে আছি আর তাই অন্য দিকে তাকাবার আগ্রহ নেই। তিনটি সাইক্লোট্রন আমাদের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের কঠোর পরিশ্রমের অন্যতম উদাহরণ। কলকাতা এখন সাইক্লোট্রনের শহর হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

[কৃতজ্ঞতা : দি স্টেটসম্যান]

দেহের আবশ্যিক উপাদান ভিটামিন সি

অমিতাভ চক্রবর্তী

পর্তুগীজ নাবিক ফারদিনান্দ ম্যাজেলান-এর কথা তো ছোটোবেলায় সবাই পড়েছি। ১৫১৯ থেকে ১৫২২ খ্রিস্টাব্দ, তিন বছরের এই সমুদ্রযাত্রায় ম্যাজেলান গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছিলেন এক চক্কর। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী। এমনকি ভাস্কো দা গামাও ভারতে আসার আগে ১৮৯৭ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিযানে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর ১৬০ জন সঙ্গীর মধ্যে শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল যাত্রাপথে। ইউরোপের নাবিকরা তখন বিশালাকার সব নৌবহর সাজিয়ে মশলার খোঁজে পাড়ি দিচ্ছেন অজানার পথে। নতুন জলপথ ধরে অনেকেই হয়তো পৌঁছে যাচ্ছেন কোনো নাম না জানা দেশে। কিন্তু এই অভিযানগুলি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একেকটি অভিযান, তা সে সফল হোক না নাই হোক, কেড়ে নিতো বহু প্রাণ। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণগুলিও যেন প্রায় একই রকম। হাত-পা-এর পেশী ফুলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথা ছাড়াও দাঁতের মাড়ি ও নাক থেকে গড়িয়ে পড়তো রক্ত। সমস্যা আরও গভীর হয়ে উঠলে থ্যাতলানো মাড়ি থেকে খুলে আসতো একের পর এক দাঁত। প্রচন্ড শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে দেখা দিতো ডায়রিয়া এবং ফুলফুস ও যকৃতের সমস্যা। পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক অবধারিত মৃত্যু। স্কার্ভি নামক এই মারাত্মক অসুখ তখন সমুদ্রযাত্রীদের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও বড় আতঙ্কের। ১৫৯৩ সালে স্যার রিচার্ড হকিন্স নামে এক ব্রিটিশ নেভি অ্যাডমিরাল-এর দাবি অনুযায়ী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় সমুদ্রযাত্রায় স্কার্ভিজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি।

প্রতিকার খুঁজছিলেন অনেকেই। এমনকি তাদের একটা অংশ এমন ধারণাও করেছিলেন যে লেবুর রস এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারে। ১৬১৭ সালে জন উডাল নামে এক ব্রিটিশ সার্জেন-এর লেখা The Surgeon's Mate বইতে স্কার্ভির প্রতিরোধ ও প্রতিকারে লেবুর রসের বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব কথাই তাঁরা বলতেন অনেকটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ঠিক ত্রিশ বছর বাদে জেমস লিন্ড নামে এক স্কটিশ নেভি সার্জেন স্কার্ভি আক্রান্ত রোগীদেরকে নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা করলেন। তিনি মোটামুটিভাবে একই ধরনের সমস্যা যুক্ত বারোজন রোগীকে বেছে নিলেন। দুজন করে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করলেন তাদের। নরম বিস্কুট, বার্লি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের সঙ্গে তালিকায় রাখলেন মাংসের ভর্তা। এই সাধারণ খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রুপকে একই পরিমাণ সমুদ্রের নোনাজল, আবার কোন গ্রুপকে জায়ফল, সর্ষে, রসুন প্রভৃতি থেঁতো করে তার নির্যাসমিশ্রিত জল প্রভৃতি। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সরাসরি মানুষকে গিনিপিগ বানিয়েই চলছিল পরীক্ষা। দিন কয়েকের মধ্যেই ফল মিলল হাতেনাতে। সৌভাগ্যবশত ফলের রস খেতে পাওয়া রোগীরা সেরে উঠেছিলেন দ্রুত। প্রায় একই সময়ে জেম্স কুক নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন গ্রহণ করলেন এক অভিনব পদক্ষেপ। সফরসঙ্গীদের স্কার্ভিমুক্ত রাখতে বিশেষ খাদ্যতালিকার পাশাপাশি খুব জোর দিলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে। জাহাজের প্রত্যেক কর্মীকে নিয়মিত তাদের জামাকাপড় ও ডেকের বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করতে হতো। কোথাও যেন এতটুকু ছত্রাক বা জীবাণু না জন্মায়। কখনো টাটকা ফল ও সব্জির অভাব থাকলে খাদ্যতালিকায় অবশ্যই থাকতো সিলারি গ্রাস বা অন্য কোনো স্থানীয় ঘাস-লতাপাতা। তখন ১৭৭০ সাল। নর্দান কুইন্সল্যান্ডের কাছাকাছি অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়েও তাঁর জাহাজ 'এন্ডেভর' কোনোরকম প্রাণহানি ছাড়াই ফিরে এসেছিলো। ফুটো হয়ে যাওয়া জাহাজের পাটাতন থেকে জল বের করে মেরামত করতে প্রায় তেইশ ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন নাবিকরা। আসলে কুকের কড়া নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সেই অভিযানে একজন নাবিকও স্কার্ভিতে আক্রান্ত হন নি। এই সাফল্যের জন্য সেই বছর রয়্যাল সোসাইটি তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান, 'কোপলে মেডেল' দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল জেম্স কুককে।

কিন্তু কি এমন আছে টাটকা ফল বা শাকসবজিতে, যা এই

ভয়ঙ্কর অসুখ থেকে মানুষকে রক্ষা করে? অসুখ এবং তাঁর থেকে মুক্তির সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও নির্দিষ্ট সেই পদার্থটিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউই। এদিকে পেড়িয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে বছর দশেক আগে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা তখনো অশান্ত। অথচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিরিখে সে এক সোনালি সময়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব পাল্টে দিয়েছে সনাতন পদার্থবিদ্যার ধারণা। তখন ১৯২৮ সাল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করছিলেন অ্যালবার্ট স্যুজান-গিয়োজি (Albert Szent-Györgyi) নামে এক হাঙ্গেরিয়ান যুবক। তিনি একাধারে ডাক্তার ও জৈবরসায়নবিদ। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় গবাদিপশুর অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স (বৃক্কের কাছে অবস্থিত অন্তক্ষরা গ্রন্থির চর্বিযুক্ত আভ্যন্তরীণ অংশ) থেকে সামান্য পরিমাণ (এক গ্রামেরও কম) কেলাসিত পদার্থ আলাদা করতে সমর্থ হলেন তিনি। স্যুজান-গিয়োজি ভাবলেন তিনি সুগারের মতো গঠন যুক্ত কোনো নতুন হরমোন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এই পদার্থটির নাম রাখলেন ইগ্‌নোজ (Ignose)। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল আনবিক সংকেতে ছয়টি কার্বনযুক্ত এই নতুন পদার্থটি আদতে একটি অ্যাসিড, তখন এর নাম রাখা হল হেক্সাইউরিক অ্যাসিড ($C_6H_8O_6$)। প্রায় বছর চারেক সময় লেগেছিল নিশ্চিত হতে যে, এই হেক্সাইউরিক অ্যাসিড-ই আসলে ভিটামিন সি, যার অভাবের কারণেই বিগত কয়েক শতক ধরে সমুদ্র অভিযানকারী নাবিকরা আক্রান্ত হতেন মারাত্মক স্কার্ভি রোগে। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দেওয়া যেতেই পারে যে, Vitamin C নামটিতে C অক্ষরটি আসলে নির্দেশ করে যে, তৃতীয় ভিটামিন হিসাবে গবেষকরা একে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থটির রসায়নিক গঠন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পেতে চাইলেন বিজ্ঞানীরা। আজকালকার দিনে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অবলম্বনে খুব অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ যৌগ থেকেই সঠিক আনবিক গঠন জেনে ফেলা সম্ভব হলেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। দরকার হত প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ কেলাসের। স্যুজান-গিয়োজি দেখলেন হাঙ্গেরিতে প্রতিদিনের রান্নায় যে লঙ্কা ব্যবহৃত হয় তাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা তা পৃথক করাও যায় তুলনামূলক সহজ উপায়ে। অন্যদিকে বিভিন্ন ফলের রসে ভিটামিন সি থাকলেও সেখানে একাধিক শর্করার (সুগার) উপস্থিতির জন্য বিশুদ্ধ ভিটামিন সি আলাদা করা কষ্টকর। এক সপ্তাহের মধ্যেই লঙ্কা থেকে প্রায় এক কিলোগ্রামের মতো বিশুদ্ধ ভিটামিন সি-র কেলাস তৈরি করে ফেললেন স্যুজান-গিয়োজি। সেই কেলাস নিয়ে গবেষণা করে বারমিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নরম্যান হাওয়ার্থ বের করে ফেললেন ভিটামিন সি-র আনবিক গঠন। হেক্সাইউরিক অ্যাসিড বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হল অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড হিসাবে। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩৭ সালে স্যুজান-গিয়োজি পেলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্মানীয় নোবেল পুরস্কার। আর হাওয়ার্থ নোবেল পুরস্কার পেলেন রসায়নে।

কুকুর, বেড়াল, প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীদেহের যকৃতে সহজেই গ্লুকোজ থেকে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয় বলে এদের খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি না থাকলেও চলে। কয়েকটি জৈবরাসায়নিক ধাপে গ্লুকোজ থেকে ভিটামিন সি সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি এদের যকৃতে সম্পন্ন হয়। এই পর্যায়ে প্রথমে গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড প্রয়োজনীয় উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিজারিত হয়ে গুলোনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। তারপর গুলোনিক অ্যাসিড ল্যাক্টোনেজ উৎসেচকের সাহায্যে অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। তবে মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শিম্পাজি, গিনিপিগ এবং ভারতীয় ফলাহারী বাদুর, মোটামুটিভাবে এই কয়েকটি প্রাণীর খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি থাকা আবশ্যিক। কারণ দীর্ঘ সময়ের প্রাকৃতিক অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত প্রাণীর জিন-এ এমন কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, ভিটামিন সি সংশ্লেষণের শেষ ধাপটি আর এদের দেহে ঘটে ওঠে না।

কোলাজেন নামক প্রোটিন তৈরিতে ভিটামিন সি-র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেশীর সংযোজন কলা (tissue)-য় কোলাজেনের অনুপস্থিতিতে পেশি দুর্বল ও নরম হয়ে স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা হারায়। ফলে মাড়ি আলগা হয়ে দাঁত পড়ে যাওয়া এবং দেহের বিভিন্ন পেশী ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে ওঠার মতো স্কার্ভির লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে স্নায়ুবিজ্ঞান থেকে শুরু করে পুষ্টিবিজ্ঞান, ক্যান্সার, এন্ডোক্রিনোলজি, ইমিউনোলজি প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরাও দেশের বিভিন্ন জটিল জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াতে ভিটামিন সি-র কার্যকারিতা খুঁজে পাচ্ছেন। তাছাড়া ক্যাটেকোলামিন (catecholamine), এল-কারনিটিন (L-carnitine), কোলেস্টেরল (cholesterol), বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড, এবং পেপটাইড গঠিত কিছু হরমোন (peptide hormones) সংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে ভিটামিন সি।

একটি মাঝারি সাইজের কমলালেবু থেকে প্রায় ৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা মোটামুটিভাবে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার সমান। তবে গবেষকগণ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় ষাট মিলিগ্রাম করে ভিটামিন সি থাকার কথা সুপারিশ করলেও এ নিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। তাছাড়া দেশ-কাল ভেদে এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থটির RDA (Recommended Daily Allowance)-এর পরিমাণও পাল্টে যায়। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং জীবনের শেষ পর্যায়ে ভিটামিন সি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে এই নিয়ে বেশ কতগুলি গবেষণাপত্রও লিখেছিলেন এই প্রবাদপ্রতিম রসায়নবিদ। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী ওষুধ হিসাবে হাই ডোজ অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড গ্রহণ করলে জ্বর-ঠাণ্ডা লাগা ও ক্যান্সারের মতো অসুখকেও প্রতিহত করা সম্ভব।

তবে সমসাময়িক চিকিৎসাশাস্ত্র পাউলিং-এর এই তত্ত্বকে মান্যতা দেন নি। যদিও বার্ধক্য বা অন্যান্য অসুস্থতা এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশী মাত্রায় ভিটামিন সি গ্রহণের পরামর্শ ডাক্তারবাবুরা দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে দৈনিক ১৫০ মিলিগ্রাম অ্যাস্করবিক অ্যাসিড গ্রহণকে স্যাচুরেশন লেভেল হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত ভিটামিন সি কোনো কাজে না আসায় জলে দ্রবীভূত অবস্থায় মূত্রের সাথে দেহ থেকে নির্গত হয়।

গোটা পৃথিবীতে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টনের বেশী ভিটামিন সি শিল্পোৎপাদন করা হয়। কয়েকটি সহজ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ থেকে এই বিপুল পরিমাণ ভিটামিন সি শিল্পোৎপাদন করা হয়। তবে এর বেশির ভাগটাই ব্যবহৃত হয় খাবার সংরক্ষক হিসাবে। অ্যাস্করবিক অ্যাসিডের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ধর্ম দীর্ঘ সময় ধরে খাবারকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সক্রিয় মুক্তমূলক (free radical) ধ্বংস করে শরীরকে সুস্থ ও তরতাজা রাখে। DNA মিউটেশন রোধে এর কার্যকরী ভূমিকার কথা মাথায় রেখে অনেকে একে অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট হিসাবেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। দেহে উৎপন্ন Reactive oxygen species (ROS) দ্রুত বিনষ্ট করে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা (Cardiovascular diseases) থেকে শরীরকে মুক্ত রাখে। এমনকি স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভিটামিন সি। গুরুত্বপূর্ণ এই পদার্থটি আবিষ্কারের পর নয় দশকের বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত প্রাণীদেহে এর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে জেনে ওঠা সম্ভব হয় নি।

ওষুধের আন্তঃক্রিয়া

তপন দাস

মানুষের জীবনশৈলী থেকে শুরু করে খাদ্যাভাব, খাদ্যাভাস বা খাদ্যের গুনমানের উপর ভিত্তি করে এবং প্রকৃতি-পরিবেশ, সংক্রমণ, প্রতিষেধক ক্ষমতা বয়স্কতা সবকিছু মিলে যে ভারসাম্য তার অভাবে রোগ সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ডাক্তারের অভাব এখনো লক্ষণীয়। চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন পাঠক্রমে পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় ডাক্তারের অভাব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। মানুষ তাই নিজেদের কে সুস্থ রাখার তাগিদে বাজার থেকে নিজেরাই ওষুধ কিনতে শুরু করেছে। বিশেষ কয়েকটি ওষুধ ছাড়া ওষুধের দোকানদারও অনেক সময় আর্থিক মুনাফার লোভে বা কখনো বাধ্য হয়ে ওষুধ দিয়ে দেন। ফলে অনভিজ্ঞতা বা অল্প অভিজ্ঞ চিকিৎসার শিকার হন অনেক মানুষ। অনেক সময় রোগী নিজে বা ওষুধ সরবরাহকারী ব্যক্তি রোগের বা রোগীর ইতিহাস নিয়ে সচেতন থাকেন না। ফলে একটি ওষুধের সাথে আরেকটি ওষুধের, ওষুধের সাথে খাদ্যের অথবা ওষুধের সাথে রোগের আন্তঃক্রিয়ার ফলে রোগী উপসমের থেকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই ওষুধের আন্তঃক্রিয়া কিভাবে হয় তা কয়েকটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে—

ধরা যাক এক ব্যক্তি ডাইজোক্সিনের সাথে এরিথ্রোমাইসিনের মতো অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলো। তাহলে তার বিপত্তি নিশ্চিত। কারণ এই অ্যান্টিবায়োটিক লিভার এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে ডাইজোক্সিনকে ভেঙে দিয়ে তার বিষক্রিয়া বাড়িয়ে তোলে। আমাদের পাড়ার অমলকাকু বরাবরই হাঁপানির রোগী হওয়ায় সালবিউটামল নিয়ে থাকেন। হঠাৎই একদিন পড়ে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেলেন। ডাক্তার না দেখিয়ে আইবুপ্রুফেন কিনে খেলেন। ফলাফল প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেন। অর্থাৎ বোঝাই গেল এই দুই ওষুধের বন্ধুত্বের কথা। ওষুধের দোকানে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক দম্পতির গলায় শুনতে পেলাম ওরাল কন্ট্রাসেপটিভের কাজ না করার কথা। ডাক্তারবাবু তাদেরকে কাজ না করার একটি কারণ হিসেবে বলেছেন সঙ্গে গৃহীত অ্যান্টিবায়োটিক ওরাল কন্ট্রাসেপটিভের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে। আবার আজকাল কজনই বা প্রোকোডিনের মতো কফ সিরাপ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কেনেন। কেউ যদি এই প্রোকোডিনের সাথে ব্যাথানাশক কোডেইন নিয়ে থাকেন তাহলে তার সেডেটিভ ক্রিয়া বা ঝিমুনি ভাব বেড়ে যেতে পারে। আবার অ্যাসপিরিন (যা অ্যান্টি প্লেটলেট) ওয়ারফেরিন বা হেপারিনের সাথে গ্রহণ করলে রক্তক্ষরনের প্রবণতা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আইসোনিয়াজাইডের সাথে বহুল প্রচলিত প্যারাসিটামল একসাথে নিলে লিভারের উপর প্রচণ্ড আঘাত আনতে পারে। এইতো গেল ওষুধের সাথে ওষুধের আন্তঃক্রিয়ার কথা। এছাড়াও রয়েছে ওষুধের সাথে খাবারের এবং ওষুধের সাথে রোগের আন্তঃক্রিয়ার গল্প।

ছোট বেলায় পড়েছিলাম, ওষুধ খেয়ে নাও সেরে যাবে রোগ, পথ্যটা ভালো দেখে সাথে করো যোগ। সত্যিই তাই ওষুধের সাথে পথ্য অথবা খাদ্যের নিবিড় সম্পর্ক। আপনার খাদ্য তালিকায় যা আছে, তার সাথে আপনার গৃহীত ওষুধের সম্পর্ক ভালো নাও হতে পারে। কিন্তু ওষুধ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী থেকে তার পুষ্টি গুনকে শোষণ করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার ধুমপান করেন বা অ্যালকোহল সেবন করেন এমন ব্যক্তিদের মেট্রোনিডাজোলের মতো ওষুধ সেবনে মাথা ধরা, বমিভাব অথবা চামড়ায় ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করা যায়। ডায়াবেটিক রোগীদের প্রথমে হাইপার পরে হাইপোগ্লাইসিমিক ক্রিয়া অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় অ্যালকোহল। তাই বলা হয় এইসব ওষুধ সেবন কালে অ্যালকোহল পুরোপুরি বন্ধ রাখা উচিত। চা, কফি ও চকলেটে প্রাপ্ত ক্যাফিন অ্যাসমার ওষুধ থিওফাইলিনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে সক্ষম। ওয়ারফেরিন সেবনকারী ব্যক্তির ব্রোকোলী, বাধাকপির মতো সব্জি বর্জন করা

উচিত কারণ এইসব সব্জিতে থাকে প্রচুর ভিটামিন K যা ওয়ারফেরিন এর প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার (দুগ্ধজাত) এর সাথে অ্যান্টিবায়োটিক টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন বা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এরা ক্যালসিয়ামের সাথে বিক্রিয়ায় অদ্রাব্য পদার্থ উৎপন্ন করে যা সহজে ক্ষুদ্রান্ত বা বৃহদন্তে শোষিত হতে পারে না ফলে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনোঅ্যামিন অক্সিডেজ ইনহিবিটর আছে এমন খাবার উচ্চ রক্ত চাপের মানুষ গ্রহণ করলে বিপদে পরে যেতে পারেন। তাই ওষুধের সাথে জেনে বুঝে খাবারটা নেওয়া উচিত।

তৃতীয় আন্তঃক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ওষুধের সাথে রোগের। আসলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে চল্লিশ উর্ধ্ব একটি মানুষ একাধিক রোগে ভোগেন। তাই ডাক্তার বাবু যখন একটি নির্দিষ্ট রোগের প্রেসক্রিপশন লেখেন তখন উনি রোগীর অসুখ ও ওষুধের ইতিহাসটা ভালো করে বোঝেন। যেমন উচ্চ রক্ত চাপের ব্যক্তিকে ন্যাসক্লিয়ার (সিউডোএফিডেফ্রিন) লেখেন না। আবার ইকোস্পিরিন লেখার আগে রোগীর সোডিয়াম পটাশিয়ামের অবস্থানটা জেনে নেন। প্রেগনেন্ট মহিলা, শিশু ও বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে ডাক্তার বাবুরা একটু বেশীই গুরত্ব দিয়ে থাকেন। একটি ওষুধের পরিমাণ অর্থাৎ ডোজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঠিক তেমনি খাদ্যপানীয়, ব্যক্তির রোগের ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে অল্প জেনেই নিজের ডাক্তারি নিজে করাটা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই বলা যায় জীবন আপনার, সিদ্ধান্ত ও আপনার।

অসম এন.আর.সি. একনজরে

৩.৩ কোটি আবেদনকারী। ৩.১১ কোটির অন্তর্ভুক্তি। ১৯.০৭ লক্ষ বাতিল। এর পুরোটাই বাংলাভাষী। ১১ লক্ষের কিছু বেশী বাঙালী হিন্দু। আট লক্ষের মত বাঙালী মুসলমান।

ভারতের সংবিধান প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ আন্তরিকভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, জনপ্রজাতন্ত্রী দেশ; এবং যেখানে দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার সুরক্ষিত থাকবে : সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস ও ধর্মাচারণের স্বাধীনতা সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগের সমতা, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করতে সৌভ্রাতৃত্ব। আজ ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৯ গণপরিষদের এই সংবিধান আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করছি এবং একে রক্ষা করার জন্য নিজেদেরকে অর্পণ করছি।

সূত্র : গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)

১৯১৯-র নোবেল পুরস্কার

- অর্থনীতিতে জনমুখী পদক্ষেপের ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পদ্ধতি হিসাবে 'র‍্যান্ডাম কন্ট্রোল ট্রায়াল' ব্যবহার করে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এসথার ডাফলো ও মাইকেল ক্রেমার
- ইথিওপিয়া ও এরিট্রিয়ার মধ্যে ২০ বছরের যুদ্ধ মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কারিগর ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন
- প্রান্তবাসীদের কাহিনীকার পোল্যাণ্ডের তোকারচুক ও অস্ট্রিয়ার পিটার হান্টকে সাহিত্যে ২০১৮ ও '১৯-র নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল
- ভৌত বিশ্বতত্ত্বে তাত্ত্বিক আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন জেমস্ পিপলস্, মাইকেল মেয়া ও ডিডিয়ে কেলজ
- লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নির্মাণের জন্য রসায়নে নোবেল পেলেন জন গুডেনাফ, এম. স্ট্যানলি হুইটিংহাম এবং আকিরা ইয়োশিনো
- চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন উইলিয়াম জে. কেলিন, প্রেগ এন. সিমেনজা ও পিটার জে. র‍্যাটক্লিফ কোষের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা নিয়ে গবেষণনার জন্য

ধলভূম—ভালো পাহাড় এবং বৃক্ষনাথ

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

মন আনচান। হঠাৎই এলো আহ্বান ‘‘যাবেন নাকি ভালোপাহাড়।’’ সম্পাদকের আমন্ত্রণ। যাত্রাসঙ্গী হবেন তিনি। এমন আবাহন কী উপেক্ষা করা যায়? তাই না করার কোনও কারণই নেই। মাত্র একদিনের সময়ের ফাঁকে যোগাড়যন্ত্র সাড়া। যোগাড়ের আর আছে কী? আপনি আর কোপনি। শুধু ভালোপাহাড়ের সাথে জুড়ে দিলাম ঝাড়খণ্ডের ধলভূমগড়কেও।

ধলভূমগড় স্টেশন

মহা-অমানিশার রাত সদ্য পাড় করা ভোর। সম্পাদকের সাথে মিলনস্থল সেই চিরপরিচিত হাওড়া স্টেশনে বড়ঘড়ির তলা। সত্যি এই ঘড়ি যে কত লক্ষ-কোটি মানুষকে কাঁটায় কাঁটায় মেলায়! আমরাও মিললাম একেবারে ঠিক সময়ে। কিন্তু আমরা মিললে কী হবে আমাদের লৌহ শকট মেলে কই? প্রতীক্ষারত যাত্রীরা সব একে একে টা-টা বাই-বাই। কিন্তু আমাদের শকটের আর দেখা নাই। সম্পাদকের ধৈর্য্য কমছে। বারবার Enquiry ঘোরাঘুরি। কিন্তু কোনো ঘোষণা নেই। অবশেষে এল শকট। বেশী দেরী করেনি। এই মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা। তা হোক গাড়ি ছাড়ার পর

সুবর্ণরেনু সুবর্ণরেখা

জানলার ধারে কানের পাশে মিষ্টি হাওয়ার কানাকানি। বেশ একটা মন ভাল করে দেওয়া ভাব। ধীরে ধীরে পুবের মেটে মাটি দূরে ফেলে পশ্চিমের লাল মাটির কাঁকড়, পাথর, ঢেলা ঢিপির সরে সরে যাওয়া। আম-জাম-জারুল পেরিয়ে শাল, সেগুন, মহুয়ার সড়সড়ানি। আর কামরার মধ্যে ধলা সঙ্গীদের বদলে কালা আদমিদের আপনত্বের বুনোট বাঁধতে বাঁধতেই শকট এসে থামল ধলভূম গড়ে।

সে সব কোন ছেলেবেলার কথা। তখন ৩০ আপ বম্বে এক্সপ্রেস এক মিনিটের জন্য এসে দাঁড়াতো এই সূয্যিডোবা ইস্টিশানে। ট্রেনের সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমেও মাটি পাওয়া যেতনা পায়ের তলায়। অগত্যা লাফ মোরাম বিছানো ইস্টিশনের প্ল্যাটফরমে। তারপরই হুম হুম করে কালো ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে দুপাশের অন্ধকারটাকে আরো খানিকটা কালো করে দিয়ে দূরে চলে যেত ট্রেন। সেই সিল্যুইড ছবির ফ্রেমটা আজও ধরা আছে মনের মাঝে। দুগ্‌গাকাকা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো আমাদের মামাঘরে নিয়ে যাবে বলে। সেই দূরে সুবর্ণরেখা পেড়িয়ে জোনাক জ্বলা, মাদলে বোল তোলা মামাঘর, আসনবনি গ্রাম।

ধলভূমগড় রানওয়ে

সে সব কবে চুকে বুকে গেছে। সে মামাঘরও আর নেই। খালি রয়ে গেছে মন কেমন করা স্মৃতি। তবুও কোথায় যেন ধলভূমগড়ে আজও আমায় মনে রেখেছে। এই স্টেশনে নামলেই যেন ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা। মনের বয়স বাড়ে কই? সম্পাদকের সাথে এতসব সাত-পাঁচ বকম-বকমের মাঝেই একটা রাত কাটানোর মতো পান্থশালা খুঁজে নেওয়া। হাতে সময় কোথায়, দিনমণি যে ডুবুডুবু। সুবর্ণরেখার গলানো সোনা যে সম্পাদককে দেখাতে হবে। আর দেরী করলে সে সোনা ডুব দেবে নিকষ অন্ধকারে।

অতয়েব ছুট, ছুট, ছোট একটা গাড়ি ধরে ছুট। নদীপাড়ে গোকলো ঘাটে। কিন্তু ছুটলেই কি আর পৌঁছানো যায়? বাঁধঘুটু গ্রাম যে ‘গরুখাঁটিয়া’ পরবে সেজেগুজে বসে আছে। তার দুয়ারে আলপনা। গোবর নিকানো দাওয়া আমাদের চলা থামিয়ে দিল।

পথে নামতেই আদিনিবাসি আপণত্ব। বাবুঘরের মানুষদের ওরা এখনো পর করে দেয়নি যে। তাই দু-দণ্ড থামা, সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়া। ফেরার পথে বসব কথা দিয়ে আবার ছুট।

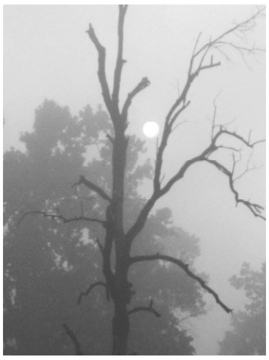

মায়াবী চাঁদ, ধলভূমগড়

প্রিয় নদী সুবর্ণরেখা, তোমার সঙ্গে আবারও দেখা। তার জল তখন সূয্যি ডোবা সোনা রঙে রাঙ্গা। কিন্তু সেও যেন বড় ভাল নেই। সভ্যতার ইট-লোহা-সিমেন্টের বেড়াজালে সে ক্রমশঃ বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। হুই ইখানে, উখানে, সিখানে পাকা পুল হচ্ছে। ডাম্পার-মিক্সারের ঝনঝনানি। নদী যেন বলে উঠল ''আমি ভাল নাই রে। এ জঙ্গল মহাল শহর বনতে লেগেছে রে বাপা।'' আমার দেখায় দুঃখ লেগে থাকলেও সম্পাদকের সাথে তার প্রথম দেখা। তার দেখায় সৃষ্টিসুখ। নদীও খুসি এমন একটা মরমী বন্ধু পেয়ে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। এবার আস্তানায় ফিরতে হবে, কিন্তু অন্য পথে। 'বাঁধঘুটু' অপেক্ষা করলেও সময় নেই হাতে। কালই ছেড়ে যেতে হবে ধলভূমগড়। তাই আঁধারে আঁধারেই রাজবাড়ি দর্শন।

দুয়ারসিনি

না, হাতিশালে হাতি নেই, ঘোড়াশালে নেই ঘোড়া। আছে কিছু পুরানো মন্দির। পঞ্চের কারু কাজ করা। কালাপাহাড়ের গল্পে ঘেরা, কষ্টি পাথরে গড়া বিশালাক্ষী, শ্যাম রায় ও অন্যান্য মন্দির। বলির থান, মশাল জ্বালিয়ে আরতি সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা গা-ছমছমে ভাব। এই রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণী। নর বলিতে যিনি তুষ্ট হতেন। এসব কথা হাওয়ায় ভাসে। মনে পড়ে বিভূতি ভূষণের 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ'। কথকথার কথক ঠাকুর তিনি ডেরা বেঁধেছিলেন পরের স্টেশন ঘাটশিলাতেই।

আলো নয়। অন্ধকারই যেন মন ভরিয়ে দিল ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদক ও তস্য ক্ষুদ্র অনুগামির। বাতাসে হালকা হিমের পরশ গায়ে নিয়ে এবার ফিরে আসা রাতের আশ্রয়ে।

পরদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথেই পথে নামা। এবার পদব্রজেই সম্পাদককে নিয়ে যাওয়া একটা বিশেষ জায়গায়। তা হল পরিত্যক্ত ধলভূমগড় বিমানঘাঁটি। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিনীরা বানিয়েছিল এই ঘাঁটি। সেটা ১৯৪২ সাল। কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে বিশাল এক রানওয়ে। না বাড়ি-ঘর কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু রানওয়ের বিস্তার আর তার সাফ-সুতরো চেহারাটা অবাক করে দেয়। রানওয়ের পরতে পরতে জমা কুয়াশা আর তার সীমানার দুধারে নিঃশব্দে প্রহর গোনা শাল-সেগুনের জঙ্গল ইতিহাসের গন্ধ বয়ে আনে। যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

ভালোপাহাড়ের সৃষ্টি

ইতিহাসের পথ বেয়েই রানওয়েব বরাবর দুজনের পথ চলা। মাঝে মাঝেই কুয়াশা ফুঁড়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে আশে-পাশের গ্রামের দু-একজন মানুষ। আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে!

একসময় কুয়াশা কাটিয়ে রোদ উঠল। দিনের প্রথম আলোয় ঝলমল করে উঠল বিশ্বযুদ্ধের এরোড্রোম। চোখ টানে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে পড়ে থাকা কালো কালো বড় বড় পাথরের ঢিপি। উঠে এলাম সেখানে। চোখ গেল জুড়িয়ে। আদিবাসীদের পুজোর থান। পাহাড় পুজো করে তারা এখানে। না কোনও মন্দির তারা বানায়নি। কেবল একটুখানি জায়গা ডাল-পালা-ছোট পাথর দিয়ে ঘেরা। সেখানে টেরাকোটার ঘোড়া, হাতি, ঘণ্টা, মানুষ পুতুল। আর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে ভোরের আলো গায়ে মেখে শিশির ধোওয়া কয়েকটা লাল ফুটফুটে শালুক-পদ্ম। সামনের দুটো পাথরের বুকে জমেছে বেশ কিছুটা জল, সেখানেই দল মেলেছে পদ্মকলি। মারাং বুরু নিজেই নিজের পুজোর ব্যবস্থা করেছেন। না, পুষ্পাঞ্জলী নয়, শালুক-কমলকে দৃষ্টি-সাক্ষী রেখে আমরাও দিলাম মানসাঞ্জলি।

আবার ডেরায় ফেরা। ব্যাগ-পত্তর গুছিয়ে নেওয়া। রওনা দেওয়া ঝাড়খণ্ডের সীমা পেরিয়ে বঙ্গভূমের পুরুলিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত দুয়ারসিনি, বান্দোয়ান, ভালোপাহাড়। ধলভূমগড় থেকে বাসযোগে গালুডি। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় চমৎকার রাজপথ। এক ঘণ্টার আগেই পৌঁছে যাওয়া। গালুডি থেকে অটোবাহনে 'ভালোপাহাড়'। সারথি রণজিৎ ভকত এক্কেবারে ভালমানুষ। একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন গালুডি ড্যাম। সুবর্ণরেখা সেখানে জলে একেবারে টইটম্বুর।

কমলদার মজলিস

"এই পথ যদি না শেষ হয়..." সত্যিই এমনটাই লাগছিল ভালোপাহাড় যাওয়ার পথটাকে। দুপাশে ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড় কখনো কাছে আসছে, আবার কখনো বা দূরে সরে যাচ্ছে। পথের দু পাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পাকা ধান হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জল ধারা আর বালি চিকচিকে ঝোড়া। ভেড়া-ছাগল আর গরু নিয়ে বাগালির পথ পাড় হয়ে যাওয়া। হাস-মুরগির দলের হঠাৎ হঠাৎ তরতর করে ছুটে পালিয়ে যাওয়া। এসবের মাঝেই হঠাৎ ঝাড়খণ্ডের সীমানা শেষ। সিংভূম পার করে মানভূম পুরুলিয়ায় ঢুকে পড়া। পথ কিন্তু আর তেমন নয় তবে সংযোজন প্রিয়দর্শিনী দুয়ারসিনি নদী। লুকোচুরি খেলতে লাগল আমাদের সাথে। কখনো ডানদিকে তো কখনো আবার বাঁদিকে। পথে পড়ল দুয়ারসিনি দেবীর মন্দির। মন্দিরের স্থাপত্যে কিছুটা উৎকল প্রভাব। মন্দিরের সন্নিকটেই দাঁড়িয়ে মাওবাদী আতঙ্কের স্মৃতি নিয়ে একটা পরিত্যক্ত অতিথি নিবাস।

চা-পানের বিরতি নিয়ে ফের চলা শুরু। কিছু পরেই অটো এসে থামল 'ভালোপাহাড়'-এর সামনে। নীল রঙের মস্ত লোহার গেট। গায়ে স্টিল প্লেট দিয়ে লেখা 'ভালোপাহাড়'। কিন্তু পাহাড় কোথায়? গোটা এলাকাটা একাট টাঁড় মত জায়গা। এই জায়গা দেখার জন্য এতদিনের মন আনচান! বেশ একটু মন খারাপ নিয়েই সম্পাদকের পিছু পিছু গেট খুলে ভিতরে ঢোকা। আর তখনই, হ্যাঁ ঠিক তখনই তিন-তিনটি মরাল গলা খুলে আমাদের বলল "স্বাগতম"। তাদের সঙ্গী বেশ কয়েকটা পাতিহাস নানারঙের ঢেউ তুলে আমাদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। তাদের সম্মিলিত কলতান যেন বলতে লাগল "এতদিন আসনি কেন? ছিলে কোথায়?" একটা আত্মভিমানী 'সন্ন্যাসী' মোরগ অবশ্য আমাদের তেমন পাত্তা দিল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তখনই অনুভব করলাম এ 'ভালোপাহাড়' মাটি-পাথরের পাহাড় নয়, ভালবাসার পাহাড়।

ভালোপাহাড়-এর প্রাণপুরুষ শ্রীকমল চক্রবর্তী মহাশয় সংস্থার কাজে গেছেন টাটানগরে। ফিরতে বেলা হবে। অতিথি সৎকারে এগিয়ে এলেন 2nd-in-command জয়তি দেবী। জয়তি চক্রবর্তী। ম্যাডাম, এক লহমায় একেবারে কাছের মানুষ। এক লহমা মানে এক লহমাই। ভালোবাসার আর এক সংযোজন। শহুরে সংকোচ গেল ঘুচে। চা-পান হতেই বাগান দর্শন। না বাগান তো নয়, এ তপোবন। যা নেই ভান্ডে তা নেই ভূভান্ডে। সমগ্র ভারত তো বটেই লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, য়ুরোপ তাদের পাদপ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে এই তপোবনে। আমি চিরদিনই লেখাপড়ায় লাস্টবেঞ্চার। ম্যাডাম এক এক করে আমাদের সাথে পরিচয় করাচ্ছেন বৃক্ষ-বনস্পতির। আমি প্রায় সাথে সাথেই ভুলে যাচ্ছি। যাহোক সম্পাদক মশাইকে দেখে একটু ভরসা পেলাম। তিনি মনে হল কিছুটা তাল রাখতে পারছেন। আমার মনে রাখার কোনও দায় নেই দিব্যি মাথা নেড়ে যাচ্ছি। তবে মনে রাখলাম শুভ আর ভোলাকে। এরা একেপেয়ে নয়, চারপেয়ে। দুটি ষণ্ড, একজায়গায় হলেই বাধায় বিষম কান্ড। শিঙাশিঙি, ঢুঁসো ঢুঁসি আর পরিণতিতে রক্তারক্তি। ম্যাডামের সাথে দেখলাম তাদের বড় অভিমানের বাঁধন। বড় নিবিড় সে বন্ধন।

তপোবনের মাঝেই দুটি শান্ত দীঘল দিঘি। মনের সব আগল সেখানে নিশ্চিন্তে খুলে ফেলা যায়। অবগাহনে দূর হয়ে যায় মনের সব ব্যথা। ভেসে আসে নাম না জানা, কিংবা কবেকার বোনা ধানের সুবাস। গাছ-গাছালির ছায়ায় আর পাখ-পাখালির পাখায় সত্যি হয়ে ওঠে সুকুমারের 'হ-য-ব-র-ল'। "বয়স কত হলো? তের, সেটা বাড়তি না কমতি?" সত্যি; বয়স এখানে কেবল বাড়ে না কমেও যায়।

১০০ বিঘার ও বেশী জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে 'ভালোপাহাড়'। সব কি আর দেখা যায়। তাই বেড়িয়ে এলাম তপোবন ছেড়ে। কিন্তু দেখার শেষ হল কই! মানুষ সেও তো প্রকৃতিরই অংশ। বিশেষতঃ

ভালোপাহাড়ের পটভূমি

আদিম অধিবাসীরা। কমলবাবু দায়িত্ব নিয়েছেন প্রায় ২০০ আদিবাসি কাচ্চা-বাচ্চা। দুটো বড় বড় বিল্ডিং-এ স্কুল বানিয়েছেন। দিয়েছেন খেলার মাঠ, কালি-কলম-কেতাব, বেশ-ভেষ, পুষ্টি-পানীয়-শিক্ষা। শুধু এখানেই নয় শেষ। দু-দুটো বাড়ির নীচে গাড়িশালায় গাড়ি।

আশপাশের গ্রাম থেকে বাচ্চাদের নিয়ে আসে, দিয়ে আসে। এ যেন এক রূপকথা। কেমনে সত্যি হল তা। সত্যি করল সহায়তা, ভালো মনের মানুষদের ভালো পাহাড়কে সহায়তা। আর এখানেই কমলবাবুর মানসাধার। যে আধারকে ভরসা করেন ভালোমনেরা। প্রাণ থেকে মহাপ্রাণ হয়ে উঠেছেন কমলবাবু বনস্পতিদের ভালবেশে। সেই ভালবাসার পরশ পেতেই ভালমনের মানুষরা তীর্থযাত্রা করতে আসে এই 'ভালোপাহাড়ে'। জয় বাবা বৃক্ষনাথ। হ্যাঁ এটাই কমলবাবুর মন্ত্র, ভালোপাহাড়ের মন্ত্র, জীবন বেদের মন্ত্র। যে বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃক্ষনাথ সকল দেবতাদের মধ্যে একমাত্র সত্য। যিনি সদা যুগিয়ে চলেন বেঁচে থাকার রসদ।

ঘাটশিলা স্টেশন

মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। চমৎকার অতিথিশালা। ছোট্ট করে একটু গা এলিয়ে নেওয়ার লোভ সামলানো দায়। তারপর আবার একটা সুয্যিডোবার মাঠ পেরিয়ে সাঁঝের হাট। হাট থেকে ফিরে এসে চা-পকৌড়া সহযোগে মুখোমুখি হলেন কমল চক্রবর্তী মহাশয়। ৭৪ বছর বয়সটা যেন নেহাৎই একটা সংখ্যা। একরাশ সাদা-চুল দাড়ি গোঁফের ফাঁকে চিরনবীন চোখ আর চির তরুণ হাসি। পাঞ্জা লড়লে পেরে উঠব বলে মনে হয়না। না কোনও পরিচয় পর্ব নেই, একেবারে সরাসরি আড্ডা, জমাটি আড্ডা। হবে নাই বা কেন? কাদের সাথে আড্ডা দিয়েছেন ইনি! সুনীল, শক্তি, সন্দীপন, সমরেশ, বুদ্ধদেব, সুভাষ এমন অনেক নাম। কাজের কোন দিকটা যে ধরবো তা ধরতাইয়ে আসেনা। লেখক, সম্পাদক, নাট্যকার, সমাজসেবী, আদিবাসী বন্ধু, অরণ্যপ্রেমী, বৃক্ষ-আরাধক,...। কোনটা যে প্রধান পরিচয় তার ভাবনা কুল কিনারাহীন। আদতে ছিলেন টেলকোর ইঞ্জিনিয়ার। বাদ দিলাম সে সব। আড্ডায় বড়-ছোট হয়না। তবে এটা বুঝলাম তাঁর সাথে আড্ডা দেওয়ার দেহে অক্সিজেন বাড়ছে মনটাও বলবান হচ্ছে। রাত বাড়ছে বাড়ুক। আলো জ্বলছে জ্বলুক। আড্ডার শেষ পাতে বিদ্যাসাগর চর্চা। সে চর্চা এমন জায়গায় পৌঁছাল যে মনে হল খর্বকায় ধুতি-চাদর পড়া মানুষটা বুঝি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু একটা সময় তো দাঁড়ি টানতেই হয়। দাঁড়িটা টানলেন জয়তি ম্যাম। এ মানুষটিও বড় কম যান না। টাটা কোম্পানির কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে, কলিকাতার নাগরিকতাকে দূরে সরিয়ে দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে এই ভেবে গুরু মানলেন কমলাবাবুকে। বুকে করে আগলাচ্ছেন কমলবাবুর 'ভালোপাহাড়'কে।

পরদিন সকাল হলো একটু সকাল-সকালই। কারণ আজ আবার নাগরিকতায় ফিরে যাওয়া। আমরা তো আর 'গাছবুড়া' হতে পারলাম না। কাল রাতে কে যেন কমলবাবুকে 'গাছবুড়া' বলে সম্বোধন করেছিল। কাল যখন আমি ওনার পরিচয় পেতে হন্যে হচ্ছিলাম, তখন শুনে মনে হয়েছিল এটাই ওনার সার্থক পরিচিতি। ১০০ বিঘা জমির ওপর প্রায় দশ লক্ষ গাছ-গাছালির সেবক উনি। জয়বাবা বৃক্ষনাথের পূজারী।

আজিকে প্রভাতে রবির করে ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ সেই 'গাছবুড়া' আর তাঁর পুরানো আঁকি বুকি মুদ্রিত সাময়িকি গুলো নিয়ে মেতে উঠলেন আমার সম্পাদক। কত বই, কত লেখা, উনি লিখেছেন আবার ওনাকে নিয়েও লেখা হয়েছে বই। এমন কী NCERT-র পাঠ্যবইতেও স্থান পেয়েছে গুরু-শিষ্যার সাধনা।

এবার বিদায় নেবার পালা। আবার ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা থেকে ট্রেন ধরা। চমক দিলেন জয়তি ম্যাম। তিনিও আমাদের সহযাত্রী একদম মহানগরী পর্যন্ত। দুপুরের খাওয়া সকাল সকাল খাইয়ে তারই রথে সওয়ার করলেন আমাদের।

কিছু মানুষ থাকে যাদের ছেড়ে যেতে মন চায়না। কোথায় কখন যেন ভারি হয়ে ওঠে মনটা। তেমনই একজন মানুষ 'গাছবুড়া', কমল চক্রবর্তী। তবু ছেড়ে যেতে হয় পুনরাগমণের ভাবনা নিয়ে। জয় বাবা বৃক্ষনাথ। জয় হোক তোমার।

কি ভাবছেন? মনটাকে একটু সবুজ করতে যাবেন নাকি ভালোপাহাড়। যোগাযোগ করুন তাহলে শ্রী কমল চক্রবর্তীর সাথে।

শ্রী কমল চক্রবর্তী
'ভালোপাহাড়'
পোঃ লতা; কুইঞ্চা, বান্দোয়ান
জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন : ৭২৩১২৯
ফোন : ৯৪৭৪৪৬২২৩৮

ভারতের মুসলমান জনসংখ্য (২০১১ জনগণনা) : প্রকৃত চিত্র

মোট : ১২১.০৯ কোটি; হিন্দু : ৯৬.৬৩ কোটি (৭৯.৮%) মুসলমান : ১৭.২২ কোটি (১৪.২%)

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৫১-'৬১ : ৩২.৪%	১৯৮১-'৯১ : ৩২.৮%
১৯৬১-'৭১ : ৩০.৯%	১৯৯১-২০০১ : ২৯.৫%
১৯৭১-'৮১ : ৩০.৭%	২০০১-২০১১ : ২৪.৬%

জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর রয়েছে এই উত্তরবঙ্গ

রাজা রাউথ

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চল

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চল উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের অংশবিশেষ। এই অঞ্চলকে মূলতঃ চারটি পাহাড় শৃঙ্খলার মধ্যে ভাগ করা যথা—

(১) সিঙ্গালিলা রেঞ্জ

(২) দার্জিলিং কার্শিয়াং রেঞ্জ

(৩) চোল রেঞ্জ

(৪) বক্সা-জয়ন্তী রেঞ্জ।

এর মধ্যে, সিঙ্গালিলা রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল—'সান্দাকফু' যার উচ্চতা ৩৬৩৬ মি. (প্রায় ১১,৯২৯ ফুট)। বস্তুতঃ পক্ষে, এটিই হল পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু জায়গা।

দার্জিলিং-কার্শিয়াং রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল 'টাইগার হিল' যার উচ্চতা ২৬০০ মি. (প্রায় ৮৫৩০ ফুট)।

চোল রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল 'দেওলো হিল' যার উচ্চতা ১৭০৪ মি. (প্রায় ৫৫৯০ ফুট)

উপরের তিনটি শৃঙ্গই দার্জিলিং হেলায় অবস্থিত।

অপরপক্ষে, বক্সা-জয়ন্তী রেঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল 'বক্সা হিল' যার উচ্চতা ১৪০০ মি. (প্রায় ৪৫৯৩ ফুট)।

দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, মিরিক, ঘুম, সোনাদা, কার্শিয়াং প্রভৃতি হল এখানকার কিছু শৈল শহর।

কয়েকটি খেয়ালী নদনদী

উত্তরবঙ্গকে নদীমাতৃক অঞ্চল বলা হলে খুব ভুল হবে না। উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ নদীরই উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের কোনওনা অংশ। যার ফলে, অধিকাংশ নদীই খরস্রোতা এবং সারা বছর নদীগুলোতে পর্যাপ্ত জল থাকে না। বরফ গলা জলেই পুষ্ট।

মহানন্দা : মহানন্দা একটি ট্রান্স বাউন্ডারী নদী যা একাধিক রাষ্ট্রের সীমানা স্পর্শ করে প্রবাহিত হয়। নদীটির উৎপত্তি পূর্ব-কার্শিয়াং-এর চিমলির নিকটবর্তী 'মহালদিরাম' পাহাড় (উচ্চতা—৬৯০০ ফুট)। পরে মহানন্দা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে প্রায় সব মিলে ৩২৪ কি. মি. ভারতে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাকি ৩৬ কি. মি. বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা/পদ্মায় মিলিত হয়েছে।

তিস্তা : উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় ট্রান্স বাউন্ডারী নদী। নদীটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ৩০৯ কি. মি. (মতান্তরে ৪৩০ কি. মি.)। তিস্তার উৎপত্তি নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও আধুনিক নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, এর উৎপত্তি উত্তর সিকিমের ৫৩৩০ মি. (১৭,৪৮৭ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত 'সো-লামো' নামক হ্রদ। বাংলাদেশে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর সাথে মিশে গেছে।

তোর্ষা : দক্ষিণ তিব্বতের ৭৬৫ মি. উচুঁ 'চিম্বে উপত্যকা' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই নদীও ট্রান্স বাউন্ডারী নদী। তিব্বত, ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে মোট ৯১ কি. মি. পথ প্রবাহিত। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে মিশে গেছে।

মন্তব্য : জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, মুজনাই, কালজানি, মুর্তি, ধরলা, মেচ, চেল, ডায়না, সুতুঙ্গা, সিংমারি, গদাধর মেচি, নাগর, টাঙ্গন, কুলিক, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, ফুলহার, পাগলা, কালিন্দ্রী প্রভৃতি অন্যান্য নদী।

উত্তরবঙ্গের অরণ্য সম্পদ

সারা উত্তরবঙ্গে আনুমানিক মোট ৩১০৬ বর্গ কি. মি. বনভূমি আছে যার অধিকাংশ অর্থাৎ ৩০৭৪ বর্গ কি. মি. দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের অধীনে।

উত্তরবঙ্গের অরণ্য এলাকায় মোটামুটি ৫-৬টি প্রধান বস্তুতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় যথা—

* উচ্চপার্বত্য এলাকায়—ওক্-রডোডেনড্রন, জুনিপার-হেমলকের দুর্ভেদ্য অরণ্য

* মধ্য পার্বত্য এলাকায়—উপক্রান্তীয়, আদ্র পর্ণমোচী সহ নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য

* নিম্নপার্বত্য এলাকা ও পাদদেশে—মিশ্র শালজঙ্গল

* নদীচর বা প্লাবন ভূমিতে—খয়ের-শিরিষ-শিমূলের জঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজরা উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে নিয়মবদ্ধ, পরিকল্পনা মাফিক বৈজ্ঞানিক বন পরিচালনা ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হন।

উত্তরবঙ্গের অরণ্যের অধিকাংশ অংশই তরাই ও ডুয়ার্সের সমতলভূমিতে অবস্থিত। চা-বাগান বসানোর প্রয়োজনে বহু মধ্য পার্বত্য এলাকা ও অন্যান্য এলাকার অরণ্যই একরকম ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া রাস্তাঘাট, সেনা ছাউনি প্রভৃতির প্রয়োজনে বহু অরণ্য কাটা হয়েছে। সমতলের প্রায় ৩৫ ভাগ এবং পাহাড়ী অঞ্চলের প্রায় ৭০ ভাগ রোপিত অরণ্য। ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী রোপিত ও প্রাকৃতিক অরণ্যকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা—তরাই (মেচি ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল); পশ্চিম ডুয়ার্স (তিস্তা ও তোর্ষার মধ্যবর্তী অঞ্চল); পূর্ব ডুয়ার্স (তোর্ষা ও সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) এবং পার্বত্য অঞ্চল (কার্শিয়াং; কালিম্পং ও দার্জিলিং-এর পাহাড়ী অঞ্চল)।

উত্তরবঙ্গের প্রধান বনাঞ্চল

উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলকে প্রধান ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(১) সমতল শাল অরণ্য : তরাই-এর লালটং, শালুগাড়া, বাগডোগরা, শুকনা; পশ্চিম ডুয়ার্সের—মোরাঘাট, টুন্ডু, আপালচাঁদ; পূর্ব-ডুয়ার্সের—চিলাপাতা, রাজাভাতখাওয়া, দমনপুর প্রভৃতি অঞ্চল

এর মধ্যে পরে যা যথাক্রমে কার্শিয়াং বণ্যপ্রাণী-১, বৈকুণ্ঠপুর, জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী-২, কোচবিহার এবং বক্সা ব্যাঘ্রবন বনবিভাগের অন্তর্গত।

(২) খয়ের-শিশু বা চর বনাঞ্চল : তরাই-এর সেভক; পশ্চিম ডুয়ার্সের—পানা, রায়ডাক, জয়ন্তী প্রভৃতি অঞ্চল-এর মধ্যে পরে যা জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী-১, কোচবিহার ও বক্সা বনবিভাগের অন্তর্গত।

(৩) ভেজা মিশ্র শাল এবং আদ্র পর্ণমোচী অরণ্য : তরাইয়ের শালুগোড়া, বাগডোগরা, শুকনা, মহানন্দা; পশ্চিম ডুয়ার্সের—আদালচন্দ্র, মোরাঘাট, গরুমারা, চাপড়ামারি; পূর্ব ডুয়ার্সের—চিলাপাতা, রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, বক্সা, নিম্তি প্রভৃতি অঞ্চল পড়ে যা কার্শিয়াং; জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী বিভাগ ১ ও ২, কোচবিহার ও বক্সা বিভাগের অধীনে।

(৪) মধ্য ও নিম্ন পার্বত্য অরণ্য : তরাই-এর কালিঝোড়া-লাটপাঞ্চার, পানিঘাটা; পশ্চিম ডুয়ার্সের—চেল, নোয়াম, জলঢাকা, সামসিং, নেওড়াভ্যালি; পূর্ব ডুয়ার্সের রায়মাটাং, বক্সা, ভুটানঘাট প্রভৃতি অঞ্চল এর মধ্যে পরে যা কার্শিয়াং বন্যপ্রাণী-১, কালিম্পং, বক্সা ও জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী-২ বন বিভাগের অধীনে।

(৫) ভেজা পার্বত্য অরণ্য-নাতিশীতোষ্ণ : পার্বত্য অঞ্চলে—সিংগালিলা জাতীয় উদ্যান (আলুবাড়ি, রেনক এলাকা), লাভা, রিম্বিক, সেঞ্চল প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত যা কালিম্পং বন্যপ্রাণী- ১ ও ২ এবং দার্জিলিং বনবিভাগের আত্ততায়।

(৬) রডোডেনড্রেন অরণ্য : পার্বত্য অঞ্চলে সিংগালিলা জাতীয় উদ্যান, নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের জোড় পোখ্রী, টংলু, ঘুম প্রভৃতি অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে যা দার্জিলিং বন্যপ্রাণী ১ ও ২ বনবিভাগের অধীনে।

তবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার উত্তরের চারটি জেলা বাদে বাকি তিনটি জেলার ভূপ্রকৃতি মূলতঃ গাঙ্গেয় সমভূমি।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান :

স্বাধীন ভারতে ১৯৮০ সালের পর উত্তরবঙ্গের পঞ্চাশ শতাংশ বনভূমিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে, উত্তরবঙ্গে ৪টি জাতীয় উদ্যান, ১টি ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা (Tiger Project) এবং ৫টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জ প্রথমে একটি পাখিরালয় হিসেবেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এটিকে অভয়ারণ্য হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯৮৫ সালে। এটিকে কুলিক পক্ষীনিবাস নামেও ডাকা হয়। ব্যাপ্তি ১.৩ বর্গ কি.মি.. এখানে কদম, জারুল, শিশু, সেগুন, খয়ের, হিজল গাছ বেশি করে দেখা যায়।

অভয়ারণ্য সৃষ্টির ফলে স্থানীয় কিছু বন্যপ্রাণী যথা শেয়াল, খেঁকশেয়াল, খরগোশ, বনবিড়াল প্রভৃতি আশ্রয় পেয়েছে। এখানে বিভিন্ন রকমের মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়—যে কারণে জলা পাখিদের আদর্শ স্থান। কুলিক নদী ও তৎসংলগ্ন জলাভূমি পাখিদের আকর্ষণের মূল জায়গা। জুন মাস নাগাদ প্রতিবছর এই অভয়ারণ্যটিতে বিভিন্ন প্রকার পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে। স্থানীয় পরিযায়ীরাও এখানে ভিড় জমায়। শামুকখোল, অন্যান্য বক, পানকৌড়ি, বাজকা, সারস, বারহেডেড গুজ প্রভৃতি হল কিছু উল্লেখযোগ্য পাখী।

মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

১৯৪৯ সালে প্রথম সরকারীভাবে মহানন্দা বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত বনকে অভয়ারণ্য-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই সময় বনাঞ্চলটির মোট আয়তন ছিল ১২৭ বর্গ. কি.মি.। বর্তমানে প্রায় ২১০ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে এর ব্যাপ্তি। ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২, অনুযায়ী এটিকে পুনরায় ১৯৭৬ সালে পুর্নঘোষিত করা হয়। ‘অভয়ারণ্য’ হিসেবে।

তিস্তা ও মহানন্দা এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অভয়ারণ্যটি অবস্থিত। এই বনাঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগ প্রায় পার্বত্যভূমি। হিমালয়ের ১৫০ মি. (= প্রায় ৪৯২ ফুট) থেকে ১৩০০ মি. (=৪২৬৫ ফুট) উচ্চতাযুক্ত পাহাড়ী ঢালে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যটির প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অপরূপ।

এই অভয়ারণ্যটি বন ও বণ্যপ্রাণী প্রাচুর্য্যে ও বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

শাল, খয়ের, শিশু, শিমুল, শিরিষ, লালি, চিলৌনি, চিকরাশি, উদাল, পিটালি, বহেরা, আমন, টুন, চাঁপ, মিঠা প্রভৃতির সারিসারি গাছ অভয়ারণ্যটিতে অন্য মাত্রা যোগ করে।

৮০০ মি. (= প্রায় ২৬২৪ ফুট)-এর উপর দিকটা আঙ্গারে, উটিশ, ফার্ন ও এপিফাইট জাতীয় উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের দেখা মেলে।

প্রাণীদের মধ্যে সেরু (পাহাড়ী ছাগল জাতীয় প্রাণী), হিমালয়ের কালো ভালুক, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর। সম্বর হরিণ, কাকর হরিণ, চিতল হরিণ, অসমীয়া বানর, সজারু, গোসাপ, হাতি ও ডোরাকাটা বাঘ উল্লেখযোগ্য। পাখির বৈচিত্র্যে এই অভয়ারণ্যটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বর্ষা ও শীতে বহু পাখির আনাগোনা এখানে।

জোড়পুখরি স্যালাম্যান্ডার অভয়ারণ্য

স্যালাম্যান্ডার গিরগিটির মত লেজযুক্ত উভয়চর। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রাণীটির কিছু প্রজাতি আজও বেঁচে রয়েছে সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে।

সারা এশিয়া মহাদেশে এর একটিমাত্র প্রজাতি ‘হিমালয়ান নিউট (Tylototriton verucossus)’ পাওয়া যায় দার্জিলিং জেলার এই

অভয়ারণ্যে। ১৯৮৫ সালে সরকারীভাবে অভয়ারণ্যের মর্যাদা পায় এই বনাঞ্চলটি। জোড়া হ্রদ শুদ্ধ পুরো অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন ৪ হেক্টর মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অভয়ারণ্য এটি।

সেঞ্চল বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

সেঞ্চল প্রাকৃতিক ও রোপিত এই দুই রকমের অরণ্যের সমষ্টি। ১৯৯২ সালে ইংরেজরা প্রথম এই অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ শুরু করে। এই অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন ৩৮ বর্গ কি.মি.। ১৯৭৬ সালে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়।

হিমালয়ের কোলে ৮০০ ফুট উচ্চতায় 'টাইগার হিল' পর্যন্ত এই অরণ্যের বিস্তৃতি। এই অভয়ারণ্যের ২০০০-২৪০০ মি. উচ্চতার মধ্যে ঘন ওক গাছ, কাপাসী, কাটুস, কাওলা, চাঁপা, বাঁশ ও বিভিন্ন প্রকার অর্কিড ও ফার্ন পাওয়া যায়। ২৪০০ মি.-এর অধিক উচ্চতায় পিপলিং, ঊটিন, ধূপি, চাপ এবং সর্বপরি, রডোডেনড্রন জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এখানে কাকর হরিণ, বুনোশুয়োর, ঘুরল, সেরু, পাহাড়ী কালো ভালুক, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, চিতাবিড়াল, অসমীয়া বানর, শেয়াল বিভিন্ন প্রাণী দেখা যায়।

চাপড়ামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ এই অরণ্যকে সংরক্ষিত বন-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে 'অভয়ারণ্য' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এর আয়তন মাত্র ৯.৬০ বর্গ কি.মি.। মূর্তি নদীর ধারে অভয়ারণ্যটি অবস্থিত।

এই অভয়ারণ্যটি মূলতঃ শুষ্ক মিশ্রজাতীয় বন। এখানে, লালি, চিলৌনি, কাঞ্চন, বহেড়া, পারারী, কাওলা প্রভৃতি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

এছাড়া হাতি, বুনোশুয়োর, সাম্বার, কাকর হরিণ, গাউর, চিতাবাঘ প্রভৃতি সাধারণভাবে দেখা যেতে পারে এখানে।

ব্যাঘ্র প্রকল্প

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের ২য় এবং উত্তরবঙ্গের একমাত্র ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা হল এই বক্সা বাঘবন। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় এই বনাঞ্চলটি অবস্থিত। বর্তমানে এর আয়তন ৭৫৯ বর্গ কি.মি.। ১৯৮২-৮৩ সালে সরকারিভাবে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বনভূমির ৩১৫ বর্গ কি.মি. কোর এলাকার ১১৭ বর্গ কি.মি. এলাকাকে জাতীয় উদ্যান এবং বাকি অংশকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ১৯৮৬ সালে ঘোষণা করা হয়। বনভূমিটি পাহাড়ের ঢালে (অধিকাংশ) এবং সমতলভূমি ('ভাবর' ও 'তরাই') জুড়ে অবস্থিত।

অরণ্যের মাঝখানে অনেকগুলি নদী বয়ে গেছে যাদের মধ্যে পানা, ডিমা, রায়ডাক, সংকোশ, বালা, গাবুর, জয়ন্তী ও বাসরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে চিলৌনি, চিকরাশি, বহেড়া, সিধা, চুন, লালি, লাগুনে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ভূমি বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়। যেমন—নদীভিত্তিক অঞ্চলে খয়ের, শিশু, শিমূল, শিরিষ প্রভৃতি এবং পার্বত্য অঞ্চলে কাটুস্, মান্দালে, লামপাতি, কিম্বু, পানি সাজ, গোকুল প্রভৃতি। এখানে বেশকিছু প্রাচীন ঐতিহ্যময়, বিরল প্রকৃতির উদ্ভিদ দেখা যায়।

বন্যপ্রাণীদের মধ্যে এখানে চিতাবাঘ, বনবিড়াল, বুনোকুকুর, দু-একটি ডোরাকাটা বাঘ, গাউর, চিতল হরিণ, ভালুক, বুনো ছাগল, সম্বর, কাকর হরিণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে স্থানীয় পর্যায়ের পাখি ছাড়াও বহু পরিযায়ী পাখি দেখা যায়।

জাতীয় উদ্যান

সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান

মাত্র ৭৯ বর্গ কি.মি. বনাঞ্চলকে ঘিরে ১৯৮৬ সালে এই অঞ্চলটিকে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া হয়। পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ী কোলে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলে এই জাতীয় উদ্যান অবস্থিত।

সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যান

বনাঞ্চলটি দক্ষিণ রিম্বিক, সান্দাকফু, গিরি এবং ফালুটের বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩০০ মি. (=৭৫৪৫ ফুট) থেকে ৩৬৫০ মিটার = (১১৯৭৫ ফুট) পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৭-১০^{0}C থাকে। এখানে ৩০০০ মি. (=৯৮৪২ ফুট) উচ্চতা থেকে শীতকালে তুষারপাত হয়। 'ছোট রঙ্গিত' ও 'রামমাম' এখানকার প্রধান দুটি নদী।

এখানে ওক্, হেমলক্, রুপালি দেওদার, ফার, বার্চ, রডোডেনড্রন, জুনিপার প্রভৃতি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। রডোডেনড্রন ও জুনিপারের বাহারি ফুলের জন্য এই জাতীয় উদ্যান বিশ্ববিখ্যাত। এখানে আনুমানিক ৭০টি প্রজাতির স্তন্যপায়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বিরল স্তন্যপায়ী প্রাণিটি হল 'লাল পান্ডা'। এই মুহূর্তে বিশ্বের যে কয়েকটি পকেট এলাকাতে এদের দেখা যায় তার মধ্যে এই উদ্যান একটি।

নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান

জাতীয় উদ্যানটি সিকিম ও ভুটান সংলগ্ন 'নেওড়া' নদীর উপত্যকায় পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পূর্ব কালিম্পং মহকুমার অন্তর্গত। ১৯৮৬ সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা লাভ করে। এই উদ্যানটি

৩৫০ মি. থেকে ৩১৭০ মি. পর্যন্ত উচ্চতাযুক্ত। মোট আয়তন ৮৮ বর্গ কি. মি.। এখানে শুষ্ক মিশ্রবন, আর্দ্র মিশ্রবন, মধ্য পার্বত্য বন, উচ্চ পার্বত্য বন, সরলবর্গীয় বন ও রডোডেনড্রন-এর বন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল দেখা যায়।

প্রাণীদের মধ্যে লাল পাণ্ডা, চিতাবাঘ, বাঘ, মেঘলাচিতা, বিভিন্ন বিড়াল জাতীয় প্রাণী, কাকর হরিণ সম্বর, ঘুরল, সেরু, গাউর ও বিভিন্ন প্রকার পাখি এখানে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে কম অব্যবহৃত অরণ্য এটি। এই অঞ্চলের নৈসর্গিক জৈববৈচিত্র্য সারা বিশ্বে সমাদৃত।

নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান

গরুমারা জাতীয় উদ্যান

এই বনাঞ্চলটি ১৯৪৯ সালে প্রথমবার এবং ১৯৭৬ সালে দ্বিতীয়বার অভয়ারণ্যের মর্যাদা পায়। এই উদ্যানটি মাত্র ৮৯.৯৯ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্রধান দুটি নদী 'জলঢাকা' ও 'মূর্তি'। ১৯৯৫ সালে বনাঞ্চলটিকে 'জাতীয় উদ্যান'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানে শতকরা ২০ ভাগ অংশ তৃণভূমি যার মধ্যে উলুঘাস, নলখাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শাল, চিলৌনি, বহেড়া, জিওল, ওদাল, চিকরাশি, জাম, কাটুস্, সিধা প্রভৃতি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য।

সারা পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ছাড়া এখানেই ভারতীয় একশৃঙ্গি গন্ডার পাওয়া যায়। ২০১০ সালে, সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থার নিরিখে 'ভারত সেরা' জাতীয় উদ্যান নির্বাচিত হয়েছে এই বনাঞ্চলটি।

গরুমারা জাতীয় উদ্যান

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

১৯৭৬ সালে মোট প্রায় ১১৬ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে এর আয়তন বেড়ে ২১৬ বর্গ কি.মি. হয়েছে। বনাঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন অনেকটা ওল্টানো ইংরেজি অক্ষর 'V'-এর মত। এই অভয়ারণ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি বড় নদী যথাক্রমে 'তোর্ষা' ও 'মালঙ্গী' আছে। এখানে শুষ্কমিশ্র, আর্দ্র মিশ্র, ও শালবনের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে মূলতঃ শিতখয়ের, শিরিস, ছাতিম, পিটালি প্রভৃতি বৃক্ষজাতীয় গাছপালা চোখে পরে। এখানে, শতকরা ৩০ ভাগ ঘাসবন। এই ঘাসগুলো উচ্চতা অনেকসময় এতটা পর্যন্ত হবে যার মধ্যে একখানা আস্ত হাতিও এই ঘাসবনে হারিয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গে একশৃঙ্গি গন্ডারের জন্য জগৎ বিখ্যাত আছে এই জাতীয় উদ্যানটি। এছাড়া, ভারতীয় বাইসন, চিতাবাঘ, সাম্বার, হাতি, পাড়া হরিণ, কাঁকর হরিণ, চিতল হরিণ, শ্লথ ভালুক ও বিলুপ্তপ্রায় বেঙ্গল ফ্লোরিকেন প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

জয়ন্তীর জঙ্গল

সবুজ চাদরে ঘেরা চা-বাগান

ইংরেজ আগমনের পূর্বে উত্তরবঙ্গে চা-বাগানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৭১ সালের মধ্যে ৩০০০ ফুট থেকে ৭০০০ ফুট উচ্চতা যুক্ত পার্বত্য বনভূমি সাফ করে গড়ে তোলা হয় চা-বাগান। ১৮৭৪ সালে ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রথম 'গজলডোবা' চা-বাগান গঠন করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে, বনাঞ্চল ধ্বংস করেই চা-বাগানগুলো গড়ে ওঠে। বর্তমানে ছোট বড় মিলে প্রায় দুশো'র উপরে চা-বাগান রয়েছে পুরো উত্তরবঙ্গে। চা-বাগানগুলো গড়ে ওঠায়, আপন মনে গড়ে ওঠে চা-বাগানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জৈববৈচিত্র্য। চা-বাগানের বিভিন্ন নালা ও ক্যানেল বর্তমানে (বন লাগোয়া অঞ্চলগুলোতে) চিতাবাঘের প্রসব ও পরবর্তী শিশুর পরিচর্যার জন্য আদর্শ জায়গা। বহু ময়ূর ও অন্যান্য পাখির খাদ্যের জোগান দেয় এই চা-বলয়।

শস্যশ্যামলা সমতল ভূভাগ

উত্তরবঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল। ফলে, এখানে ভূ-ভাগের একটা বড় অংশ পাললিক ও উর্বর দোঁয়াশ মাটি দ্বারা গঠিত। ধান, গম, পাট, তামাক, বিভিন্ন শাকসবজি প্রভৃতি এখানকার নিজস্ব ঘরানার ফসল। যদিও বর্তমানে অধিকাংশ ঘন চা-বাগিচা ফসল দখল করে রেখেছে এখানে। অনেক জায়গায় ভুট্টা, আনারস, ওষধির চাষ হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ জৈববৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে যুগ যুগ ধরে। তবে বর্তমানে অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ, বিশেষ করে

পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দরুন এবং কিছু দুষ্টচক্রের সক্রিয়তার কারণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখানকার জৈববৈচিত্র্য। অবৈধভাবে বনাঞ্চল ঘেঁষা এলাকা দখল করে নিচ্ছে এরা। অবৈধভাবে বনাঞ্চল এলাকাগুলোকে গোচারণভূমিতে পরিণত করতে পিছপা হয় না এরা। জাতীয় উদ্যানের মত সংবেদনশীল বনাঞ্চলগুলোতে তাঁদের গবাদি পশু অবৈধভাবে প্রবেশ করে গবাদি পশুর সংক্রামক রোগভোগ বন্য জন্তুদের ছড়াতে সাহায্য করে এরা। বনাঞ্চল গুলোতে খাদ্যের অভাব ঘটছে। বনাঞ্চলের বড় পশু বিশেষ করে হাতি, বাইসন প্রভৃতির চলাচলের পথ বা 'করিডর' অনেক ক্ষেত্রে রোধ করে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন ইকো টুরিজমের নামে লজ, আবাসিকস্থল প্রভৃতি। বন্যপ্রাণী মানুষের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে এখানে। রেল পথ, সড়ক পথ ও সেনা ছাউনির নামে বহু বনাঞ্চল কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। রেল পথ ও সড়ক পথে বহু বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটে প্রতিবছর এবং ফি-বছর এটি ক্রমশ বেড়ে চলছে।

বিশ্বের অন্যতম আদিম জৈব বৈচিত্র্য বাঁচাতে হলে সরকারী, বেসরকারী এবং সাধারণ সৎমানসিকতা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের চিঠি

জয়দেব গুপ্ত

৪ই জুলাই ২০৫০

হে আমার পিতামহ/প্রপিতামহ,

আমি সম্পর্কে আপনাদের নাতি অথবা পুতি। এই ২০৫০ সালে বসে আমি আপনাদের এই চিঠি লিখছি বিশেষ কারণে।

আপনারা এ কোন পৃথিবী রেখে গেছেন আমাদের জন্যে? ভুল বললাম। পৃথিবী রেখে যাননি; বলা উচিৎ, পৃথিবীটাকে প্রায় ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসে আমাদের জন্যে বেঁচে থাকাটা কঠিন করে দিয়ে গেছেন। জানেন, আমরা এখন আমাদের প্রয়োজনীয় পানীয় জল পাইনা। আপনারা ভূগর্ভস্থ জল তুলে জলের স্তরটাকে একদম শূন্য করে দিয়েছেন। মাত্র দেড়শ বছরে আপনারা মাটির নিচের জল শেষ করেছেন। বৃষ্টির জল, আমাদের ব্যবহার করা জল আবার ভূগর্ভেই ফিরে যাওয়ার কথা। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর আদি কালে পৃথিবীতে যত জল ছিল আজও ঠিক ততটাই জল পৃথিবীতে আছে। কিন্তু অভাব হয়েছে পানীয় জলের। সমুদ্রের জল পান করা যায়না। কিন্তু প্রকৃতি তার সঙ্গে মিষ্টির জলের ব্যবস্থাও রেখেছিল। পাহাড়ের বরফ গলা জল নদী বেয়ে আসতো। সেই জল পানযোগ্য ছিল। আপনারা সেই নদীর জলকে এতটাই দুষিত করেছেন যে এখন পানযোগ্য তো দূরের কথা, এখন সেই জলে হাত দিলেও হাতে সংক্রমণ হয়। নদীমাতৃক দেশ নাম দিয়ে যে নদীকে আপনারা মা বলতেন, তাকেই আপনারা বিষবৎ বানিয়েছেন। তাছাড়া নদীর মধ্যে এতো নোংরা ফেলেছেন যে নদীর জল বহন ক্ষমতাও কমে গেছে। অনেক নদী মজে গেছে, মরে গেছে। ব্যবহার করা জল আবার ভূগর্ভেই ফিরে যাওয়ার কথা। এটাই স্বাভাবিক জলচক্র। কিন্তু আপনারা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবে এই চক্রটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে ভূগর্ভস্থ জল আপনারা শুধু তুলেছেন, কিন্তু ব্যবহৃত জল মাটিতে ফিরে যাওয়ার পথগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন।

আপনারা কি জানেন, আমাদের এখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গাছপালা এই পৃথিবীর অক্সিজেন-কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে। আপনারাও জানতেন। তবু আপনারা আপনাদের লোভের কারণে গাছপালা বন জঙ্গল কেটে ধ্বংস করেছেন। ফলে বাতাসের এই ভারসাম্য ধীরে ধীরে সংকট মাত্রা (Critical level)-এ পৌঁছেছিল। তবু আপনারা থামেননি। গাছপালা বন জঙ্গল কাটতেই থেকেছেন। ফলে বাতাসের ভারসাম্য সংকট মাত্রার নীচে নেমে গেছে। আর এটাও আপনারা জানতেন, একবার এই মাত্রা সংকট সীমার নীচে নেমে গেলে, তা ধীরে ধীরে আরও সংকটময় অবস্থায় পৌঁছবে। আর কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেলে সেটা ভূ-উষ্ণায়ণের কারণ হবে। আপনারা জানতেন। জানতেন, আপনাদের নাতি পুতিরা এই উষ্ণ পৃথিবীতে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস প্রশ্বাস জনিত কারণে কষ্ট পাবে। আমাদের এখন সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকতে হয়। বহু মানুষ নিঃশ্বাসের কষ্টে ভোগেন।

মহম্মদ বাজারে জঙ্গল কেটে পাথর খাদান

তাছাড়া গাছপালা কেটে ফেললে, তা মেঘ বৃষ্টিকে টেনে আনতে পারে না, ফলে খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু তবুও...

আপনাদের পিতা পিতামহরা হাতে থলি নিয়ে দোকান বাজার যেতেন। আপনারা খালি হাতে যাওয়া অভ্যেস করেছিলেন। আপনারা জানতেন প্লাস্টিক ব্যাগ সহজলভ্য, দোকানদার সেটা দেবে। তাই ক্ষয়হীন আবর্জনা হিসাবে আপনারা যথেষ্ট প্লাস্টিক ব্যাগ এনেছেন, যেখানে সেখানে ফেলে দিয়েছেন। মাত্র পনেরো

কুড়ি বছরের মধ্যে নালা, নর্দমা, মাঠ, ময়দান, খাল বিল, নদী এমনকি সমুদ্রকেও আপনারা প্লাস্টিকে ভরে দিয়েছেন। চাষের মাঠ, জলের কুয়ো, নদী সমুদ্রে এখন জলজ প্রাণীর থেকে প্লাস্টিক বেশী। আপনারা এটাও জানতেন। জেনেও এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করেছেন।

আপনারা শুধু ধর্ম আর রাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডায় ব্যস্ত থেকেছেন। অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার আঁকড়ে ধরেছেন। বিজ্ঞান, পরিবেশ নামক বিষয়গুলোকে অবজ্ঞা, অবহেলা করেছেন। আর তার ফল আমরা ভুগছি।

বক্রেশ্বর ও কোপাই মিলিত কুঁয়ে এখন

এই মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে কোটিকোটি নক্ষত্র আছে। সেই সব নক্ষত্রের কোটি কোটি গ্রহের মধ্যে মাত্র অল্প সংখ্যক গ্রহেই প্রাণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আবার বলি সম্ভাবনা মাত্র—এখনও অবধি শুধু আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব জানা যায়নি। অর্থাৎ আমাদের জানা মহাবিশ্বের একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণ আছে বলে প্রমাণিত, সেই একমাত্র প্রাণময় পৃথিবীকে আপনারা জেনে বুঝে ধ্বংস করেছেন।

এছাড়াও আপনারা আরও একটা মহান (!!!) কাজ করেছেন। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে যত জ্বালানী সঞ্চিত হয়েছিল, আপনারা মাত্র দু-তিনশ বছরে সেটা শেষ করে দিয়েছেন। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস—সব উড়িয়ে দিয়েছেন, ফুরিয়ে দিয়েছেন। যখনই কেউ আপনাদের সে কথা বলতে গেছেন, আপনারা বলেছেন ''বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় কিছু একটা উপায় বার করবেন''—আর সেটা বলেই আত্মসান্ত্বনা সহ আপনারা আপনাদের ঠাকুরঘরে কিম্বা মন্দিরে গিয়ে নিজেদের সুখে থাকার জন্য প্রার্থনা করেছেন। বিজ্ঞানীদের ওপর পৃথিবীকে ভালো রাখার দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নিজেরা ঠাকুরের নাম করে পৃথিবীকে বরবাদ করেছেন।

জানিনা, পৃথিবীতে আর কতদিন প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে। হয়তো বেশী দিন নয়। তবু যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে আপনাদের দোষারোপ করে যাব।

কারণ আপনারাই পৃথিবীকে নির্বংশ করেছেন।

প্রণাম জানাবো না কারণ আপনারা প্রণম্য নন।

ইতি আপনাদের একজন উত্তরপুরুষ।

সবুজ গ্রহটাকে বাঁচতে দাও

অমিতাভ সেনগুপ্ত

(**প্রসঙ্গ :** অসমে প্রত্যহ পাহাড় চুরি যাচ্ছে। বুলডোজার তিল তিল করে পাহাড়কে কেকের মতো কেটে নিচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর রক্তপাতহীন অহিংস করুণ দৃশ্য। উত্তর-পূর্বের সত্তাকে হত্যা করা হচ্ছে। বিগত ২৫ বছরে ব্রহ্মপুত্র নদের ৯৯৬ কোটি কিউবিক মিটার জল হ্রাস পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হবে ১.৯৩ লাখ বর্গকিলোমিটার লুইতের অববাহিকা। 'রি-এসেসমেন্ট অব ওয়াটার এ্যাভেলিবিলিটি ইন ইণ্ডিয়া যুজিং স্পেস ইনপুটস' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই পর্যবেক্ষণটি অনুধাবন করে ইসরোর ন্যাশানাল রিমোট সেন্সর সেন্টার।)

এই অফুরান সবুজ
প্রতিদিন ফুরিয়ে যায়
বুলডোজারের গুপ্ত হত্যায়
লুইতের পাড়ে;
সবুজ গ্রহটাকে
ধূসর মলাট হতে দিও না
যার ভিতরে শুধু জমে থাকবে
কিছু পুরানো উদ্ধত ইতিহাস
পরিহাস করবে
মূর্খের জয়ের দম্ভকে
পদানত করেছে প্রকৃতিকে
প্রতিদিন,
সবুজ মানুষরা
হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন
সোনা আর ইস্পাতে তৈরী
রোবটদের প্রতিযোগিতা
সবুজ মানুষরা
হারিয়ে যাচ্ছে।
লুইতের স্রোতে
পানসী কি আর বইবে না।

শেষ হয়ে যাচ্ছে বীরভূমের নদী আর জঙ্গল

বিবর্তন ভট্টাচার্য

বীরভূমের নদী আর জঙ্গলগুলো কেমন আছে তা দেখার জন্য গণদেবতাতে এক্সপ্রেসে ব্যান্ডেল থেকে সাঁইথিয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম সবুজমঞ্চের বন্ধুদের সাথে। আসলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সারা রাজ্যের সব জেলাতে নদী বাঁচানো আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া। বীরভূমে আয়েশার আহ্বানেই আমাদের যাত্রা। মহম্মদবাজার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ওদের অরগানাইজেশন। ওরা বীরভূমে পরিবেশ-সম্মেলনের উদ্যোক্তা। সবুজমঞ্চ তার সহায়ক মাত্র। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাঁইথিয়া থেকে যাত্রা শুরু হবে। সাঁইথিয়া স্টেশনে ওরা আমাদের রিসিভ করবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। দুটো টাটাসুমো গাড়িতে রওনা হলাম বীরভূমের মজে যাওয়া নদী আর জঙ্গল দেখতে, যা ভবিষ্যতে আর থাকবে না।

পরিকল্পনা—আমরা বীরভূমের মোট ৬টি মজে যাওয়া নদী দেখব। ময়ূরাক্ষী, অজয়, দ্বারকা, কানা, কোপাই, ব্রাহ্মণী। ময়ূরাক্ষী দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। ময়ূরাক্ষী ব্রিজে উঠতেই দূর থেকে দেখা গেল ট্রলিতে করে বালি তোলার দৃশ্য। ক্যামেরা জুম করে ছবি তুললাম। সরকারি নির্দেশ আছে বালি তোলা যাবে না। কিন্তু অবাধে বালি তোলা চলছে। ময়ূরাক্ষীর পাশে গিয়ে তো অবাক। নদীর মধ্যে দিয়ে মোটর সাইকেল, গাড়ি অবাধে চলছে। নদীর পাড় থেকে যে অঞ্চলে বালি চুরি হয়েছে সেখানে বড়ো গভীর খাত। আর তার পাশে প্রচুর কাশফুল ফুটেছে। অজয় আর ময়ূরাক্ষীর বালি পশ্চিমবঙ্গের সেরা বালি। মোটা দানার বালি। আসলে নদী থেকে বালি তুললে নদীর যে মৃত্যু হয় তা আর বিশেষজ্ঞদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। দামোদর তার প্রধান প্রমাণ। এছাড়া অজয়ের অবস্থাও তথৈবচ।

মনখারাপ নিয়ে এগিয়ে চললাম কানার পাশ দিয়ে চরিচার জঙ্গলের অবস্থা দেখতে। জঙ্গলের গভীরতা নেই। মাঝখান দিয়ে বড়ো পিচরাস্তা ঝাড়খন্ডের দিকে চলে গিয়েছে। প্রচুর গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে উন্নয়নের নামে। পাশাপাশি গাছ লাগানো হচ্ছে না তা দেখলেই বোঝা যাবে। এছাড়া জামশেদপুরের কাছে দলমার জঙ্গলে হেলিকপ্টার সার্ভে শুরু হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা হবে। উচ্ছেদ হতে হবে প্রচুর আদিবাসী গ্রামকে। জঙ্গলে বসবাসকারী প্রাণীকূল হেলিকপ্টারের আওয়াজে অতিষ্ঠ। হাতির দল সমভূমিতে ধান খেতে চলে আসছে শুধু খাবারের অভাবে নয়, এই ভয়ংকর আওয়াজে আর রাতে হেলিকপ্টার থেকে আলো ফেলাতে। বিরক্ত হাতির দল সমভূমিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরদোর ভেঙে ফেলছে। সবাই সব জানে কিন্তু একটা চোরা ভয় মানুষকে ভীত করে রেখেছে। প্রতিবাদ করলেই উন্নয়নবিরোধী তকমা। তা পরবর্তীতে রাষ্ট্রদ্রোহিতাও হতে পারে।

এই বর্ষাতেও কোপাই আর দ্বারকার অবস্থা প্রায় ড্রেনের মতো। তারাপীঠে সবাই পুজো দিতে গিয়ে আগে পুণ্যস্থান করতেন এই দ্বারকায়। কিন্তু এখন এই ড্রেনের জলে স্নান করবে কে। আমি বুঝি না, হিন্দুদের কাছে নদী যদি মা হয়, কিংবা সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে এই পবিত্র জলের প্রয়োজন হয়, তাতে কীভাবে ময়লা ফেলেন এই মানুষেরাই। বাড়ির কুকুর, গরু, ছাগল মারা গেছে, চল নদীতে ফেলে আসি। আধপোড়া মানুষের দেহও নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। আর এই জল দিয়েই চরণঅমৃত তৈরি হয় পুজোর। বিয়ের সময় জলসাজতে যায় মানুষ এই নদীর পাড়ে।

এরপর চললাম দেওচা, পাঁচামি, দেওয়ানগঞ্জের পাথরখাদান দেখতে। যেখানে ছোটোবেলায় জঙ্গল দেখতে আসতাম সেখানে কালো পাথর আর ধুলোয় বাতাস ভারী। চারিদিকে কুয়াশার মতো। বড়ো বড়ো ডাম্পার পাথর নিয়ে চলেছে শহরে। বড়ো বড়ো ইমারত আর রাস্তা তৈরি হবে। কোথায় জঙ্গল, কোথায় সবুজ, সব ভ্যানিশ। এই পণ্যায়িত ব্যবস্থাতে প্রকৃতি এখন পণ্য। জল, জঙ্গল, মাটির তলার সমস্ত কিছু এখন পণ্য। আমি ছোটোবেলায় দেখা দেওচা-পাঁচামিকে মেলাতে পারছিলাম না। ওই অঞ্চলের বহু আদিবাসী শ্রমিক আমার বন্ধু। এঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আসেন সিলিকোসিস চিকিৎসার জন্য, তাই চেনা পরিচয়। ওঁরা বললেন, 'আরও সুখবর আছে, আমাদের এই গ্রামগুলোর তলায় কয়লা পাওয়া গেছে, যার গুণমান পৃথিবীর অন্যান্য কয়লাকে হার মানাবে। তাই আর সিলিকোসিসের ভয় নেই, কিন্তু আমরা কোথায় যাব তার ঠিক নেই। ওপেন কাস্ট মাইনিং হবে এখানে। বড়ো বড়ো গর্ত তৈরি হবে। কোনো বাড়ি-ঘর এখানে থাকবে না। মাইলের পর মাইল জঙ্গল সাফ হবে।' আর, মহাশ্বেতা দেবী তো মারা গেছেন, তাই আর হয়তো 'অরণ্যের অধিকার' লেখা হবে না। আদিবাসীদের নিয়ে রাজনীতি হয়, প্রকৃত আদিবাসীদের নিয়ে ভাবনা কই?

আমি ২০১৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রবিবারের 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে জানতে পারি, লোকাতে খোলামুখ কয়লাখনি হবে। এবং সরকারকে গ্রামবাসীরা ন্যায্যমূল্যে জমি দিতে ইচ্ছুক তাও জানি। এরপর আরও ভালো করে আরও জানবার চেষ্টা করি। দেওচা-পাঁচামি দেওয়ানগঞ্জ-হরিণশিঙ্ঘা বীরভূম কোলফিল্ড তৈরি হবে। বীরভূমে দেওচা-পাঁচামিতে ৯.৭ স্কোয়ার কিমি আর দেওয়ানগঞ্জ-হরিণশিঙ্গাতে ২.৬ স্কোয়ার কিমি জমিতে খোলামুখ কয়লাখনি তৈরি হবে। ১৫১৫৬.৬০ মেট্রিক টন কয়লা পাওয়া যাবে, যা ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা কয়লার গুণমানের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। যা আমাদের বিদ্যুৎ তৈরি ও শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হবে।

কিন্তু যে হাজার হাজার গাছ ও বনভূমি শেষ হয়ে যাবে, প্রচুর জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাবে, প্রায় দশ হাজার আদিবাসীর বাসস্থান

অনিশ্চিত হবে, তার কী হবে? নয়াচর ও নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব তৈরির সময়, অভী দত্তমজুমদার, গুরুপ্রসাদ কর সহ আমরা অনেকে প্রতিবাদ করেছিলাম। আসলে বাতাসে উত্তাপ বাড়ছে, বাতাসে কার্বন এমিশন বেড়েই চলেছে। জলসংকট, খাদ্যসংকট আরও বাড়বে। সেই সময় এই প্রকৃতি নিধনকে ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

ওপেন কাস্ট মাইন করতে মাটির তলায় ডিনামাইট চার্জ করতে হয়। পাশেই কবিগুরুর তৈরি শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতনে প্রকৃত শান্তি বজায় থাকবে তো?

ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরির সময় নদী-বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য এই বাঁধের বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তিনি বড়ো বাঁধের বিপদ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তখন তাঁকে বিভিন্ন ভাবে অপমান করা হয়। আজ আমরা বুঝতে পারছি এই ব্যারেজের খারাপ দিকটা।

যা করতে হবে তা প্রকৃতি ও মানুষকে বাঁচিয়ে করতে হবে। কারণ সভ্যতা দাঁড়িয়ে থাকে এই দুটির ওপর। উন্নয়ন কার জন্য, তা ভাববার সময় এসেছে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটি পাকাসড়ক উন্নয়নের মাপকাঠি নয়। সেই গ্রামের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন। অর্থ তার মাপকাঠি হতে পারে না।

তাই আমরা যারা প্রকৃতি, মানুষ ও এই পৃথিবীকে ভালোবাসি, তাদের আবেদন—আর পৃথিবী গরম হওয়ার মতো ব্যবস্থা যেন না নেওয়া হয়। যা ক্ষতি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে বাতাসে কার্বন এমিশন কী করে কম করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(কৃতজ্ঞতা : সময় একুশ শতক)

বিপদের নাম পঙ্গপাল

গত দু'বছর রাজস্থান এবং গুজরাটে পঙ্গপালের ঝাঁক কৃষিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

কী খায়?

ওড়ার পথে যা কিছু সবুজ। একটি পূর্ণাঙ্গ মরু পঙ্গপাল প্রতিদিন ২ গ্রাম খাবার খায়। পঙ্গপাল ঝাঁকের বিস্তার এক বর্গ কিলোমিটার হলে, তাতে ৪ কোটি পঙ্গপাল থাকতে পারে। তারা যা খাবে, তা ৩৫,০০০ মানুষের একদিনের খাবারের সমান।

কত ডিম পাড়ে?

মাটির নীচে একটি 'এগ পড'-এ ৯৫-১৫৮টি ডিম পাড়ে সলিটারি লোকাস্ট। গ্রেগরিয়াস লোকাস্ট পাড়ে প্রায় ৮০টি ডিম। ৬-১১ দিনের ফারাকে জীবদ্দশায় (৩-৫ মাস) তিন বার ডিম পাড়তে পারে পঙ্গপাল। এক বর্গমিটার এলাকায় ১,০০০টি 'এগ পড'ও পাওয়া গিয়েছে।

কত দ্রুত ও কত দূর উড়তে পারে?

বাতাসের অভিমুখের উপর নির্ভর করে গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৬-১৯ কিলোমিটার। একটি পঙ্গপাল ঝাঁক দিনে ৫-১৩০ কিলোমিটার বা তারও বেশি উড়তে পারে। ১৯৮৮ সালে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ৫,০০০ কিলোমিটার পথ ১০ দিন পার করেছিল পঙ্গপালরা।

কত বড় ঝাঁক?

এক বর্গ কিলোমিটারের কমও হতে পারে, আবার কয়েকশো বর্গ কিলোমিটারও হতে পারে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪-৮ কোটি পঙ্গপাল থাকতে পারে।

তথ্য : লোকাস্ট ওয়াচ, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস

দিল্লি নির্বাচনের ফলাফল (মোট আসন ৭০)

	২০১৫	২০২০*
	আসন সংখ্যা (প্রাপ্ত ভোট)	আসন সংখ্যা (প্রাপ্ত ভোট)
আম আদমি পার্টি	৬৭ (৫৪.৩%)	৬২ (৫৩.৫৮%)
বিজেপি	০৩ (৩২.৩%)	০৮ (৩৮.৫০%)
কংগ্রেস	০০ (৯.৭%)	০০ (৪.২৬%)

*১০টি মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত আসনে আম আদমি পার্টির জয় ও প্রাপ্ত ভোটের হার ৬১.৯২%

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা : তিনটি ঐতিহাসিক বিতর্ক

সুরেশ কুণ্ডু

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনার দুটো দিক ছিল—শিক্ষাপ্রসার ও শিক্ষাসংস্কার। এই দুটো কাজ একসাথে করেছেন, এমন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ইতিহাসে বিরল। এদিক থেকে তিনি এক ঐতিহাসিক অবদানের কৃতিত্ব পেতে পারেন। এটা বিশ্বের প্রেক্ষিতেও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান। অথচ এই অবদানে ভারতের অদ্বিতীয় থাকতে গিয়ে তিনি তিনটি আক্রমণের মুখে পড়েন। 'আক্রমণ' শব্দটির বদলে আমি দুটো সৌজন্য-শব্দ ব্যবহার করেছি। শব্দ দুটো হল, 'ঐতিহাসিক বিতর্ক'।

বিতর্ক এক : প্রথম বিতর্কটা 'বর্ণপরিচয়' বইটা নিয়ে। এটা লেখা ও প্রকাশের আগেই শিশুশিক্ষার অন্য বই ছিল। বিদ্যাসাগরের মতে সেসব বই লেখার ধরণ, ভাষার প্রকাশভঙ্গী এবং অন্যান্য দিক থেকে তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। পাঠশালায় পড়ানো চাণক্য শ্লোক তাঁর অপছন্দ ছিল। যেসব প্রবাদ পড়ানো হত সেগুলো ভ্রান্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে অশ্লীল ছিল। অপ্রয়োজনীয়ভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে টেনে আনা হত শিশুশিক্ষায়। এসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বহু পাঠশালা পরিদর্শনে গিয়ে।

এমন একটা প্রেক্ষিতে তিনি 'বর্ণপরিচয়' লিখেছিলেন। বিবেচনায় রাখলেন শিক্ষার বয়স, গ্রহণক্ষমতা, তার রুচি, পছন্দ-অপছন্দের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো। ভাষাটা ছিল খুবই সহজ-সরল। টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত বাক্যের মতো ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করলেন। শিশুমনের উপযোগী শব্দ বাছাই করলেন তিনি। দুটো খণ্ডে লিখলেন বইটা। প্রথম ভাগে নানা অক্ষর দিয়ে অবিমিশ্র থেকে শুরু করে মিশ্রবর্ণ জোড়া দিলেন। দ্বিতীয় ভাগ লিখলেন সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটাতে।

এসব নিয়ে বিতর্ক তেমন জোর পায়নি। আক্রমণের কারণটা ছিল বর্ণপরিচয়ের পাতায় ঈশ্বর বা ধর্ম কথার অনুপস্থিতি। আক্রমণের আদলে অভিযোগ উঠল, বিদ্যাসাগর 'নিরীশ্বরবাদী নৈতিকতা' এবং 'ঘৃণ্য বস্তুবাদ' প্রচার করছেন। একই সময়ে দুটো ধর্মবাদী সম্প্রদায় আক্রমণে নামল, বেশ মারমুখী বিতর্কের কণ্ঠস্বরে।

অথচ এটা যে একটা ঐতিহাসিক অবদান সেটা বললেন জার্মান প্রাচ্যবিদগণ। এঁদের প্রধান মুখপাত্র আলব্রেশ্‌ট্ ভেবের (Albrecht Weber) বললেন, এটা বিশ্বে একটা অনন্য নজির। শিক্ষা থেকে ধর্মকে পৃথক করার এক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস। এই অবদানের জন্যেই জার্মান প্রাচ্য সমিতি ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ওই সমিতির সদস্য করে নেয়।

বিতর্ক দুই : এ বিতর্কটা উঠেছিল 'বোধোদয়' প্রকাশের পরে। শিশুশিক্ষার পাঁচটি ভাগ করে লেখা হয়েছিল পাঁচখানা বই। এর প্রথম তিনটি ভাগ লিখেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। চতুর্থ ভাগ 'বোধোদয়' লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন পঞ্চম ভাগ। প্রথম তিন ভাগের বিষয় ছিল বর্ণমালা, বানান ও পঠনশিক্ষা সহায়ক। 'বোধোদয়' লেখা হয় সাধারণ জ্ঞানের বিষয়, বই হিসাবে। পঞ্চম ভাগ 'নীতিবোধ' শিক্ষার বই। 'বোধোদয়' ইংরেজি বইপত্র থেকে সংকলিত। কোনো বিশেষ বইয়ের অনুবাদ নয়। এর প্রথম লেখাটা ছিল 'পদার্থ' নিয়ে পরিচয়। শেষ লেখাটা হল শিল্প-বাণিজ্য-সমাজ। এবং এই বইটিতে স্বাভাবিক নিয়মে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ছিল না। তাই অভিযোগ উঠল, সাধারণ-জ্ঞানের বইয়ে ঈশ্বর থাকবে না কেন? 'পদার্থ' থাকবে অথচ 'ঈশ্বর' থাকবে না, তা কেন হবে? তার মানেটা হল বস্তুবাদী 'পদার্থ' থাকলে ভাববাদী 'ঈশ্বর'কেও রাখতে হবে। পণ্ডিত সরকার এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও বেজায় বিরোধিতা প্রবলতম হয়ে উঠে সরকারি হুমকিও সম্ভবত উঠেছিল যে, আলোচ্য বইটিতে ঈশ্বর-এর জায়গা না থাকলে বইটি সরকারি তরফে কেনা হবে না। পরের একটা সংস্করণ থেকে বইটিতে থাকল কিন্তু কেমন হল তাঁর স্থান? প্রথমে 'পদার্থ'-ই থাকল। তার নীচে 'ঈশ্বর'।

বিতর্ক তিন : ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। এই তারিখেই সংস্কৃত কাদের পড়ানো হবে সেটা নিয়ে বিদ্যাসাগর একটা রিপোর্ট দিলেন। এটি বেনারস অধ্যক্ষ ড. ব্যালেন্টাইনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন নিয়ে একটি উত্তর। সেই রিপোর্টে বিদ্যাসাগর লিখলেন, ''কতগুলি কারণে সংস্কৃত..... সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন পড়তে হয়—নইলে বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন কোনো মতদ্বৈত নেই।... সংস্কৃতে যখন এগুলি পড়াতেই হবে তখন তাদের জন্য প্রতিষেধক রূপে ইংরাজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বাইবেল এমন দর্শন নয়। কারণ ইউরোপেও এখন একে খাঁটি দর্শন বলে স্বীকৃতি দেয় না। ঐ দর্শনটাও ড. ব্যালেন্টাইন কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়াতে বলেছিলেন। ভারতীয় দর্শনের অহিতকর প্রভাব কাটাতে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পড়াতে হলে 'লজিক' এবং ডেভিড হিউমের 'ট্রীটিজ' পড়াতে হবে। সেই সাথে বিদ্যাসাগর সম্পাদিত গ্রন্থে এটি ছাপার আগেই তিনি এটি পাঠ্যক্রমে ঢোকাতে চেয়েছিলেন। দর্শনের এদেশে প্রথম চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের আলোচনার সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে।

সংস্কৃত কলেজে দর্শনের পঠনপাঠন নিয়ে বিদ্যাসাগরের অবস্থান নিতে হয়েছিল ড. ব্যালেন্টাইনের বিরোধিতা করে। বিশেষ দরবারে এটির অবস্থান নিয়ে উষ্ণ বিতর্ক হয়েছে। এখন যখন শিক্ষায় ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছে তখন বিদ্যাসাগর প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। শিশুশিক্ষা থেকে প্রতিটি স্তরে আলোচিত হোক বিদ্যাসাগরের অবদান ও অবস্থান। জন্মের শুরু থেকে হোক বিদ্যাসাগর-চর্চা।

[সংক্ষেপিত, কৃতজ্ঞতা : বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা]

বাঙালির এক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব অক্ষয়কুমার

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাঙালি ভদ্রলোকদের বিশাল বিস্মরণগুলির মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত হলেন অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কোন একটি লেখাতেও অক্ষয়কুমারের উল্লেখ আদৌ কোথাও আছে কিনা তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। মুহম্মদ সাইদুল ইসলাম বহু যত্নে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র উদ্ধৃতি আবিষ্কার করেছেন: ''আমাদের বাল্যকালে আমরা একটু নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল।'' লেখক যদিও এই উদ্ধৃতির কোনো উৎস নির্দেশ করেন নি, তবু একটা বিষয় মনের মধ্যে ঘোরপাক খায়, রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি পড়ার পরেও মন থেকে কতকগুলো খটকা দূর হয় না। ১৮৮৬-তে অক্ষমকুমারের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ নীরব। আশ্চর্যের ব্যাপার, 'রবি-জীবনী'র ঐ বছরের 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশেও অক্ষয় দত্তর মৃত্যুসংবাদ অনুল্লেখিত'।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অক্ষয়কুমারের মতো মানুষের কি এতটাই অনুল্লেখ প্রাপ্য? এই নীরবতার কারণ কী? পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'ব্রাহ্ম' কিন্তু বিজ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমারের তীব্র সংঘাত বেধেছিল বলে? অক্ষয়কুমার শেষ বয়সে 'অজ্ঞেয়বাদী' (কার্যত নাস্তিক) হয়ে গিয়েছিলেন বলে?'

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য অক্ষয় দত্তের প্রতি তাঁর ঋণের কথা সশ্রদ্ধ ভাষায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের রচনাতে কোথাও অক্ষয়কুমারের উল্লেখ আছে বলে জানি না। অথচ বিবেকানন্দ যেসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন—যথা ষড়্‌দর্শনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, অন্যান্য মতের সাপেক্ষে বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠতা, বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচার, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের বেদ-বিরোধিতা ইত্যাদি—তাতে, অন্তত খণ্ডনের প্রয়োজনেও অক্ষয়কুমারের প্রসঙ্গ তোলাটা খুব স্বাভাবিক ছিল। বিবেকানন্দের সবচেয়ে সক্রিয় মননচর্চার যুগেইই তো *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)। ঐ বই প্রকাশের পর প্রায় কুড়ি বছর তিনি জীবিত ছিলেন, তাই বহু-আলোচিত ঐ বইয়ের খবর তিনি রাখতেন না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কিন্তু বিষয়টি আগাগোড়াই এতটা দুঃখজনক নয়। যারা চেনার তাঁরা তাঁকে ঠিক চিনেছেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলি, বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক জন এন্ডার্সন...ছাত্রদের বলেন, ''Akshaykumar is Indianising European science''.[৫] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেছিলেন, ''তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৌতুহল অক্ষয়বাবুর সংস্পর্শে আসিয়াই জাগে।'' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমারকে তাঁর 'সাহিত্যগুরু' বলে মানতেন, বহু রচনায় গুরুর কাছে ঋণ অকুণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। তাঁর কথায়, ''অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।'' শিবনাথ শাস্ত্রীও মোটের ওপর সেই কথাই বলেছেন। ব্রাহ্ম-বিরোধী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভূমিকায় অক্ষয় দত্তের প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করে গেছেন :

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছেন—

''চিন্তাশীল ও আলোকপ্রাপ্ত জনমণ্ডলীর এক সুবৃহৎ অংশ যে কী উদগ্র আগ্রহে সেই সুবিখ্যাত পত্রে [তত্ত্ববোধিনীতে] প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের গভীর উপদেশপূর্ণ রচনাগুলি অন্তরে গ্রহণ করিত, তাহা সঠিকভাবে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বঙ্গদেশের সর্বত্র লোকে ঐ কাগজের প্রতিটি সংখ্যার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিত। সেই চুপচাপ, রোগজীর্ণ, কিন্তু অক্লান্তকর্মী মানুষটি তাঁহার ডেস্কের সামনে বসিয়া বেশ কয়েকটি বছর ধরিয়া বাঙালিদের মতামতকে, তাহাদের চিন্তাগত অবস্থানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। (১৯০৭)

কাব্যগ্রন্থটি পিতামহকে উৎসর্গকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরব স্থল
আমার পূজাপাদ পিতামহ,
স্বর্গীয় মহাত্ম্য
অক্ষয়কুমার দত্তের
স্মরণীয় নামে,...
আমার সাহিত্য-চেষ্টার ফলস্বরূপ,
এই সামান্য কবিতাগ্রন্থ,
ভক্তির সহিত উৎসর্গীকৃত হইল।

আবার অন্যত্র পিতামহের উদ্দেশে তিনি যে-শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ—

যে আদর্শ জ্ঞানযোগী। হে জিজ্ঞাসু তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর;

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যা বলেছেন সে-ও এক ধরনের অনিচ্ছা-প্রশস্তিতে পরিণত হয়েছে—অক্ষয়কুমার নানা বিজ্ঞান ও ইতিহাসের চর্চা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীইস্ট্‌ ও এনসাইক্লোপিডিস্ট্‌দের মত শাস্ত্রের অভ্রান্ততা,

অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি যাহা কিছু যুক্তির কষ্টিপাথরে কষা যায় না তাহাকে বাদ দিয়া বসিয়াছিলেন।...ব্রহ্মতত্ত্বের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব তাঁহার রচনায় ফুটিত বেশি।—তাঁহার লেখার ধুয়ো তাঁহার একটি বুলিতে ধরা যায়—''ব্রহ্মাণ্ড কি আশ্চর্য কাণ্ড!'

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি অক্ষয়কুমারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন আলোকপাত করেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত

''অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিজ্ঞান-পাগল মানুষ; আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একরোখা উৎসাহের মাশুল হিসেবে তাঁকে কার্যত একঘরে হতে হয়েছিল, হারাতে হয়েছিল চাকরি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে যাতে আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে বেমানান বলে তাচ্ছিল্য করা না হয়, তার জন্য অক্ষয়কুমার তাঁর জীবনসায়াহ্নে ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার মূল খুঁজতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা এবং তাঁর অকাল প্রয়াণের ফলে সে অনুসন্ধান অসমাপ্ত থেকে যায়।'' অসিত কুমার ভট্টাচার্য অক্ষয়কুমারকে ভারতে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদের পথিকৃৎ রূপে বর্ণনা করে ১৯৬২ সালে লন্ডনের The Rationalist Annual-এ Akkhay Dutt, Pioneer of Indian Rationalism নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন।

ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান*-এ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩) সবিস্তারে অক্ষয় দত্তের বিজ্ঞানরচনার চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে তাঁর বইটি যতটা বিবরণধর্মী ততটা বিশ্লেষণধর্মী নয়। নবেন্দু সেন তাঁর প্রসিদ্ধ গবেষণা-গ্রন্থ *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত* ও *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*-এ (১৯৭১) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে প্রকৃত পথিকৃতের মর্যাদা যে অক্ষয় দত্তেরই প্রাপ্য, এ কথা তিনি যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসকার দীপক কুমার তাঁর *Science and the Raj* (1997) বইতে লিখেছেন, অক্ষয়কুমারই প্রথম ভারতীয় যিনি বেকন-চর্চার অপরিহার্যতার কথা বলেন।

গোপাল হালদার বলেছেন, ''দেবেন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর ব্রাহ্মপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদ ও সেকিউলার পথেই চলতে থাকেন। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে অক্ষয়কুমার আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে নিরীশ্বরবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পক্ষ নেন। তিনি এমনকি কৃষকের হাতে জমি তুলে দিয়ে সামাজিক ও কৃষি-সংস্কারের পক্ষে কথা বলেন।''

১৯৭৭ সালে অশোক সেন লেখেন :

''তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের দৃঢ় সহযোগী। তাঁর যুক্তিগুলি ছিল অনেক বেশি সেকিউলার ধাঁচের, শাস্ত্রীয় খুঁটিনাটির ধার তিনি বড়ো একটা ধারতেন না।''

এই অক্ষয়কুমার দত্তের সুকঠিন ব্যক্তিত্বের বাইরেও আরও যে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর দিক আছে, সেগুলির মধ্যে তাঁর অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি পত্রিকা প্রকাশের দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশুদ্ধ ঐতিহ্য রেখে গেছেন আমাদের কাছে। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনীর প্রথম প্রকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ বাঙালী সমাজের ব্যতিক্রম।

সারাজীবন তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা করেছেন, বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির চর্চা করেছেন, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে। সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব কবি হিসাবে। 'অনঙ্গমোহন' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

তাঁর গদ্যরচনার সূত্রপাত হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় আকস্মিকভাবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান মনীষার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাতে ভাবের সাযুজ্য যেমন ঘটেছে তেমনি ভাব বিরূপতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টতা অর্জন করতে পেরেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিনত ভাবাদর্শ তিনি সব সময়ে মেনে চলতেন না।

দেবেন্দ্রনাথের বেদ-উপনিষদের প্রতি গভীর নিষ্ঠা তিনি মানতে পারেননি। বৈদিক সাহিত্য মানুষের রচিত, সুতরাং অভ্রান্ত নয়, সর্বথা গ্রহণীয়ও নয়—এরকম কথাও তিনি বলেছিলেন।

পাশ্চাত্য পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রমাণমূলক বাস্তব দর্শনবিদ্যার প্রতি তিনি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। তাই সব দিক থেকে তিনি ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানবাদী ঊনবিংশ শতাব্দীর সার্থক প্রতীক পুরুষ।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত গ্রন্থাবলী মূলত বুদ্ধিনির্ভর ও মননাশ্রয়ী। তিনি কিছু স্কুলপাঠ্য জাতীয় গ্রন্থ রচনা করে শিক্ষার্থীর মনে বুদ্ধি ও যুক্তির পারম্পর্যকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'ভূগোল' গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত এবং তত্ত্ববোধিনীর পাঠশালার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে রচিত এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে অক্ষয় কুমারের বিপুল জ্ঞানস্পৃহা, তথ্যানুসন্ধান ও বৈচিত্র্যানুসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

‘পদার্থবিদ্যা’ (১৮৫৬) গ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। বিজ্ঞানের গূঢ় বস্তুজ্ঞান ও তাত্ত্বিক জ্ঞানকে নতুনভাবে পরিবেশন করে পরিভাষার প্রণালীবদ্ধ প্রকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটিকে সজ্জিত করেছেন। ‘ধর্মনীতি’ গ্রন্থটি রচনায় জর্জ কুম্বেরের Moral Philosophy নামক গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে জর্জ কুম্বেরের বস্তুময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও মধ্যযুগীয় বিশ্বাসকে তিনি একইসঙ্গে গ্রহণ করেননি। প্রাকৃতিক বিধান-ই যে ভগবত ভক্তির ভিত্তি তা তিনি এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

‘চারুপাঠ’ গ্রন্থের তিনখণ্ডে স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ এবং স্বদেশানুরাগ প্রকাশের উপযোগী কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ গ্রন্থটি জর্জ কুম্বের এর ‘The Constitution of Man Considered in Relation to eternal object’ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’ বইটি যে সময়কার শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত তরুণ মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল—শুধু চিন্তাজগৎকে নয়, সরাসরি জীবনযাত্রাকেই প্রভাবিত করেছিল, আদর্শ হয়ে উঠেছিল material force বিবাহ ও নারীপুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে। তাঁর কিছু কিছু প্রস্তাব তো সামাজিক অর্থে বৈপ্লবিক। যেমন, ১) বিবাহের আগে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ-পরিচয় করে নেবে। ২) সাবালক ও সাবালিকা না হলে বিবাহ করা চলবে না। কারণ অতি অল্প বয়সে জাত সন্তান অনেক সময়েই শরীরে ও মনে পূর্ণবিকশিত হয় না। তাছাড়া বালক/বালিকা বয়সে সন্তান হওয়ার অর্থ, নিজের সংসার চালানোর ক্ষমতা অর্জন করার আগেই পিতা বা মাতা হওয়া। অতএব শিক্ষাদীক্ষার মারফত নিজেকে তৈরি করবার আগেই কোনো রকমে টাকা রোজগারের রাস্তা দেখতে হয়। ফলে শিক্ষাদীক্ষাও হয় না, উপরন্তু দারিদ্র্যও ঘোচে না সারা জীবন। আগেই লক্ষ্য করেছি, ছাত্র অবস্থায় কন্যা-সন্তানের পিতা হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি নিজের সম্বন্ধে এই আক্ষেপই করেছিলেন। ৩) স্বামী-স্ত্রী বয়সের মধ্যে বেশি ফারাক যেন না থাকে, নইলে মনের মিল হওয়া সম্ভব নয়। ৪) বৃদ্ধস্য বালিকা ভার্যা গ্রহণ বালিকাটির দিক থেকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং তা পাপ। ৫) নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ অনুচিত। এই ব্যাপারে তিনি প্রাচীন হিন্দু মতামতকে সমর্থন করেছিলেন, কেননা তা বিজ্ঞানসম্মত। ৬) পাত্র-পাত্রীর দৈহিক ও মানবিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। শুধু অপরিণত দেহই নয়, অপরিণত মনও বিবাহের অনুপযোগী। এই ধরনের বিবাহ সচরাচর সুখের হয় না। ৭) স্বামী-স্ত্রীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক রুচির মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। ৮) বহুবিবাহ পাপ। ৯) বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ ন্যায় ও নীতিসঙ্গত। ১০) সংসারে স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। পরস্পরকে সুখী করা উভয়েরই দায়িত্ব। ১১) দাম্পত্যে বিশ্বাসভঙ্গ ঘোর অন্যায়। ১২) মনোভঙ্গি, স্বভাব, রুচি, নীতিবোধ প্রভৃতির সংঘাত, এবং দাম্পত্য বিশ্বাসভঙ্গ হেতু যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অসমাধেয় রূপে তিক্ত হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য। এ ধরনের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত ও সমাজস্বীকৃত হওয়া উচিত।

‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা। উইলসনের ‘Essays and lectures on the religion of the Hindus’ অবলম্বনে রচিত হলেও লেখক এতে অনেক বিষয় যোগ করেছেন। এটি বাঙালীর গবেষণামূলক সাহিত্যের এক প্রধান নিদর্শন। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—“বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় সত্যই তা Masterpiece.”

‘প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার’ (১৯০১) নামক গ্রন্থটিকে তিনি তার গাম্ভীর্য, ওজস্বিতা অথচ সহজবোধ্য গুণে এই গ্রন্থটিকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন।

‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণনা’, ‘কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা’, ‘বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা’ প্রভৃতি বীক্ষণমূলক প্রবন্ধ-গ্রন্থ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। আজ তাঁর জন্মজয়ন্তীর দ্বিশতবর্ষ উদযাপনের কালে এই সকল গ্রন্থ পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে তাঁকে আমরা নতুন করে চিনতে পারি।

স্বাধীনতার চুয়াত্তর বছর পরেও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি হলো না

বরুণ দাস

নিবন্ধের শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়তো-বা ভ্রু কুঁচকাবেন। জোর গলায় হয়তো বা বলেই ফেলবেন সরকারের সমালোচনা করাই যাদের বদ-অভ্যেস, তাদের চোখে তো ভালো কিছুই পড়ে না। রাজ্যের নানা প্রান্তে কতো স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হয়েছে, শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধে বেড়েছে—‘সমালোচনা’র জবাবে উচ্চারিত কথাগুলো যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা নয়। তবে আংশিক সত্য। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বেড়েছে নিঃসন্দেহে। আর্থিক দিক থেকে তাঁরা একটা সম্মানজনক অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন, একথাও সত্যি। ‘বিয়ের বাজার’-এ এক সময় যাঁদের কোনও গুরুত্বই ছিলনা, তাঁরা এখন অনেকটাই গুরুত্ব পাচ্ছেন। কন্যাপক্ষ শিক্ষকপাত্র পেলে বর্তে যাচ্ছেন।

সামাজিক গুরুত্বের সঙ্গে আর্থিক গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষক মহলে স্বভাবতই এখন খুশির হাওয়া। এই কৃতীত্ব অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের। একই সঙ্গে একথাও বলতে হয়, শিক্ষার সঙ্গে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ ঘটিয়ে বাম আমলের সরকার শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিতও করেছেন। যার কু-প্রভাব আজও সমান গতিতে প্রবহমান। এবং আগামী দিনেও এই কু-প্রভাব থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের সম্ভবতঃ মুক্তি নেই।

যাক সেসব অপ্রিয় কথন। এ নিয়ে অন্যত্র না-হয় আলোচনা করা যাবে। এবার আসা যাক বর্তমান সরকারের প্রসঙ্গে। এদের দাবি, 'পরিবর্তনের আমল'-এ অনেক বেশি স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে। সুতরাং আগের সরকারের থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি অনেক বেশি ঘটেছে। এই কথাগুলোও ভিত্তিহীন নয়। তবে বর্তমান সরকারের কথাগুলোও আংশিক সত্য। পুরোটা নয় একথা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য, রাজ্যে এখন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০টি। শিক্ষাবিভাগের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১-র রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের আগে এ রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২টি। অর্থাৎ বাড়তি ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে এই আমলে। সংখ্যাটা কোনওভাবেই হেলাফেলা করার মতো নয়। মাত্র আট-ন' বছরের শাসনকালে এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি করতেই পারে।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের আমলে যেখানে মাত্র ২-৩টি বিশ্ববিদ্যালয় (গৌড়বঙ্গ, বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) তৈরি হয়েছে, সেখানে পরিবর্তনের আমলে ১৮টি। এরপরও কেউ যদি এই সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে গাফিলতি কিম্বা ধ্যান না-দেওয়ার কোনও অভিযোগ তোলেন, তাকে স্রেফ 'নিন্দুক' বলে দেগে দেওয়াটাই স্বাভাবিক। এই নিবন্ধকের বিরুদ্ধেও তেমন 'অভিযোগ' আনাই যায়।

কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখলে আদৌ কোনও অভিযোগ আনা যায় কি? শিক্ষাজগতের সঙ্গে যাঁরা বিভিন্নভাবে যুক্ত আছেন, এমন রাজনীতি-নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের অভিমত কিন্তু অন্য কথা বলে। কি সেই অন্য কথা? রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়—সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পরিকাঠামোগত তেমন কোনও উন্নতি আদৌ হয়নি।

পরিকাঠামো বলতে কি বুঝি আমরা? সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ক্লাসকক্ষ, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ এবং যাঁরা পড়ানোর দায়িত্বে আছেন, তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার (এটা বামফ্রন্ট সরকারের অবদান) ফলে প্রয়োজনীয় সময় দিতে না পারা—ইত্যাদি সমস্যা মুখ্য। এছাড়া রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত কারণে অনাকাঙ্খিত রেষারেষি তথা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তো আছেই।

সম্প্রতি রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন আচার্য-রাজ্যপাল। ওই বৈঠকে রাজভবনের নির্দেশ মতো তথ্য-পরিসংখ্যান সমেত রিপোর্ট পেশ করার প্রস্তুতি-পর্বেই হিমশিম অবস্থা হয়েছিল উপাচার্যদের। কারণ ওই রিপোর্টে থাকার কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ও কর্মকান্ডের তথ্য। রিপোর্টের খসড়া তৈরি করতে গিয়েই বিপাকে পড়েছিলেন তারা।

কেমন সেই বিপাক? বিষয়টা একবার খতিয়ে দেখা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ও কর্মকান্ডের তথ্য রেজিস্টার এবং পরীক্ষা নিয়ামকের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ পদও দীর্ঘকাল ধরে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে শূন্য। এছাড়া বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক সহ অশিক্ষক কর্মীর অনেক পদও ফাঁকা।

এর ফলে সবচেয়ে সমস্যায় পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত পড়ুয়ারা। অথচ এই সময়েই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের এনরোলমেন্ট ৭.১২ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ২০.৩৬ লক্ষ। সচেতন পাঠক একবার ভাবুন তো, কি ভয়ানক কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি ওই নথিভুক্ত নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীদের। পঠনপাঠনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা থেকে সময়মত পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশ না-হওয়া নিয়ে তারা দারুন আতান্তরে।

রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরে বারবার দরবার করেও এই সমস্যার কোনও সমাধান-সূত্র মিলছে না বলে অনেক উপাচার্যদেরই অভিযোগ। মোটের ওপর 'গোটা ব্যবস্থাটাই চলছে জোড়াতালি দিয়ে'—এমন গুরুতর অভিযোগও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক উপাচার্যের। তাঁরা কার্যতঃ ঢাল-তলোয়ারহীন 'নিধিরাম সর্দার।' আচার্য-রাজ্যপাল বৈঠকে না-ডাকলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষাঙ্গনের এমন কঙ্কালসার-চেহারাটা প্রকাশ্যে আসতো না।

উল্লেখ্য, বাম আমলে বারাসত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হওয়ার পর দেড়শো বছরের ঐতিহ্যবাহী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার কিছুটা হালকা হলেও সেখানের পরিস্থিতি খুব একটা আশানুরূপ নয়। মহানগরের এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে ১৪১টি কলেজ। অথচ এখানে স্থায়ী কোনও পরীক্ষা নিয়ামক নেই, ডিনরাও অস্থায়ী, ডেপুটি রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করছেন এক অধ্যাপক।

এখানেই শেষ নয়। সমস্যা আরও আছে। যেমন কলা ও এডুকেশন বিভাগের সচিব যে দু'জন অধ্যাপক তাদের কেউ-ই সেই শাখার নন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী রেজিস্ট্রার নেই। যাদবপুরেও রয়েছে ধোঁয়াশা। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক এবং আইসি নেই। ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষা নিয়ামক ও ফিনান্স অফিসার নেই। সর্বত্রই শুধু নেই আর নেই।

এই সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যেই গত দু' বছরে রাজ্যের ১০টি

জেলায় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে বিল পাশ হয়েছে। কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটিও গড়া হয়েছে বলে উচ্চশিক্ষা দপ্তর-সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু আপশোসের বিষয় এই যে, কোনও ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি বড়জোর একবার মাত্র বৈঠকে বসেছে। কোথাও আবার বৈঠকও হয়নি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, খাস উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকেই নাকি 'ধীরে চলার বার্তা' এসেছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সেই অমোঘ বার্তা বা পরামর্শ (পড়ুন নির্দেশ) উপেক্ষা করার কোনও সৎ-সাহস দেখাতে পারবেন কি কমিটির সদস্য-উপাচার্যরা। জোর দিয়েই বলা যায়, অবশ্যই পারবেন না। কারণ তেমন শিরদাঁড়া টান করা ব্যক্তিত্ব ক'জন আছেন। মোটের ওপর অধিকাংশই তো 'জো-হুজুর' গোত্রের।

চলতি বছর অর্থাৎ ২০২০-তে পঠনপাঠন শুরুর অপেক্ষায় জেলার যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি—বোলপুরে বিশ্ববাংলা, ঝাড়গ্রামে ঝাড়গ্রাম, হুগলিতে রানি রাসমণি গ্রিন, পূর্ব মেদিনীপুরে মহাত্মা গান্ধী, দার্জিলিংয়ের মংপুতে গ্রিন ফিল্ড, আলিপুরদুয়ারে আলিপুরদুয়ার, বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর, বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ায় হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ এবং নদিয়ার কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়।

ঠিক কিভাবে চলছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি? ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টিচার্স ট্রেনিং এডুকেশন প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডব্লুবিইউটিটিইপিএ)এর উপাচার্যকে অস্থায়ীভাবে সামলাতে হচ্ছে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও। এদিকে ডব্লুবিইউটিটিইপিএ-র আওতায় রয়েছে সোয়া চারশোরও বেশি বিএড কলেজ। প্রচুর পড়ুয়া। অথচ ডব্লুবিইউটিটিইপিএ-র নেই স্থায়ী রেজিস্ট্রার বা পরীক্ষা নিয়ামক।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কথায়, বিজ্ঞপ্তি দিয়েও মেলেনি যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও আধিকারিক। কারণ নিয়োগ-বিধি মানতে হলে ওই পদে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ বছরের বেশি প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কাউকে চাই। অন্যদিকে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং পরীক্ষা নিয়ামক নেই। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কয়েক মাস আগে ইস্তফা দিয়েছেন। সেখানেও কোনও রেজিস্ট্রার, কলেজ পরিদর্শক (আইসি) এবং ফিনান্স অফিসার নেই। সবাই কেবল ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। পরীক্ষা নিয়ামকও রয়েছেন প্রবেশনারি হয়ে। বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার এবং আইসি (কলেজ পরিদর্শক) নেই। কাজ চালাচ্ছেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার। আচার্য-রাজ্যপালের ডাকে উপাচার্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি তৈরি করতে গিয়ে এমন 'নেই'-এর সন্ধান পেয়েছেন উপাচার্যরা।

এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার মান বজায় রাখা সত্যিই কি সম্ভব? অথচ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দাপট ও দম্ভ কিছুমাত্র কম নয়। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সার্বিক পরিস্থিতি হলো—কোথাও উপাচার্য আছেন তো রেজিস্ট্রার নেই, কোথাও আবার রেজিস্ট্রার আছেন তো উপাচার্য নেই। কোথাও আবার পরীক্ষা নিয়ামকের পদ শূন্য। বিভাগীয় প্রধান কিম্বা আইসি নেই। নেই ফিনান্স অফিসার কিম্বা প্রয়োজনীয় অধ্যাপক।

উপরন্তু অনেক কলেজ-ইউনিভার্সিটি জুড়েই চলেছে দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিকটু দাপট ও দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য দেখানোর নোংরা খেলা। ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতা-নেত্রীদের সীমাহীন তান্ডব। এঁদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কতিপয় উপাচার্য-অধ্যাপক। শিক্ষাঙ্গনে নেমে এসেছে ক্লাব-রাজনীতি। আলোচনা সভা কিংবা সমাবর্তন উৎসব ঘিরে দলীয় রাজনীতির মতন প্রকট।

এই প্রেক্ষাপটে সিপিআই(এম)এর প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক তথা দলের শিক্ষা-সেলের 'দেখভাল' করা মাননীয় কমরেড অনিল বিশ্বাস (যিনি দলে 'চাণক্য' হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন) বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন, 'দ্যাখ ক্যামন লাগে।' একদিকে সরকারি ব্যর্থতা তো অন্যদিকে শাসকদলের দাদাগিরি—দুইয়ে মিলে এমন সঙ্কট তৈরি হয়েছে শিক্ষাজগতে যা কখনই কাম্য ছিল না; কিন্তু কে শোনে কার কথা।

সদস্য সংকটে ওয়েবকুটা

সনাতন মুর্মু

ওয়েবকুটার (ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ এণ্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) সদস্য সংখ্যায় কি টান পড়েছে? কিছুদিন আগে সংগঠনের সভাপতি কেশব ভট্টাচার্য শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে রাজ্যে নিযুক্ত সব আংশিক ও অতিথি কলেজ শিক্ষকদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার কলেজে ঢোকার সময় যে বেতন (৫৭,৭০০ টাকা) পেয়ে থাকেন তা দেওয়ার কথা বলেছেন। ওয়েবকুটার তরফে আংশিক ও অতিথি কলেজ শিক্ষকদের প্রতি এই দরদ দেখে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক আংশিক ও অতিথি শিক্ষক মন্তব্য করেছেন এই সংগঠনটি ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু সংগঠনে পরিণত হতে চলেছে। তাঁদের অভিযোগ এক আধবার কাগজে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া এই সংগঠন আংশিক ও অতিথি কলেজ শিক্ষকদের জন্য আজ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই করেনি। তাছাড়া গতবছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘোষণা করেছিলেন যে সব আংশিক ও অতিথি কলেজ শিক্ষকদের তিনি যথাযথ মর্যাদায় সাম্মানিক দেবেন ও সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং জানুয়ারি ২০২০ থেকে তাঁদের স্যাক্ট-১ এবং স্যাক্ট-২ (স্টেট এডেড কলেজটিচার-১ ও ২ ক্যাটেগরি) আওতায় এনে ন্যূনতম ২০,০০০/- এবং সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ টাকা বেতন দেবেন সেই সময়ও ওয়েবকুটা চুপ ছিল।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর গত বছর ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ জয়েন্ট সেক্রেটারির তরফে এক মেমো (মেমো নং ২০৮১-এডুকেশন (সি এস)/১০ এম-৮৩/ ২০১৯) জারির পরে ১৩ জানুয়ারি ২০২০ কেশব ভট্টাচার্য উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীকে ওই চিঠি দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপাচার্যরা

স্মর্তব্য সরকার পোষিত কলেজগুলিতে শিক্ষকদের এখন দুটি সংগঠন আছে। প্রথমটি ওয়েবকুটা ও দ্বিতীয়টি ওয়েবকুপা। প্রথমটি দীর্ঘদিনের এবং বাম ও কংগ্রেস প্রভাবিত সংগঠন ও দ্বিতীয়টি শাসকদলের প্রভাবিত এবং পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৈরি হয়েছে। এতদিন ধারে ও ভারে প্রথম সংগঠনটিই বৃহত্তর ছিল। বর্তমানে প্রথম সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ৭ হাজারের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় সংগঠনটির ১,৫০০ থেকে ২,০০০ সদস্য। রাজ্যের এখন আংশিক সময়ের কলেজ শিক্ষক আছেন ৫,৫০০ এবং অতিথি শিক্ষক প্রায় ৮,৫০০। সুতরাং সংখ্যার বিচারে অতিথি ও আংশিক মিললে স্থায়ী শিক্ষকদের তুলনায় তাঁরা সংখ্যায় দ্বিগুণ। যাঁরা স্যাক্ট-১ এবং স্যাক্ট-২ এর আওতায় আসছেন তাঁরাই আগামী দিনে টিচার্স কাউন্সিল, কলেজ পরিচালন সমিতি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক রাজকর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পরিচালনা করবেন। এই আতঙ্কেই কি কেশববাবুরা এত দরদ দেখাচ্ছেন? ওয়েবকুটা উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে আরও দাবি করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ (ইউ জি সি) অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষক যোগ্যতা মানে উত্তীর্ণ তাঁদের আলাদা ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে এবং সিনিয়রিটি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ীও তাঁদের ইনসেন্টিভ দিতে হবে। দিনের উল্লেখ না থাকলেও সপ্তাহে এই সমস্ত কলেজ শিক্ষকদের (স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২) ১৫ ঘন্টা ক্লাস নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পলিসি অনুযায়ীই বদলির বিষয়টি করতে হবে এবং এঁদের ক্ষেত্রেও ৬৫ বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ দিতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অদ্ভুতভাবে লাইব্রেরিয়ানদের আর্থিক সুযোগ সুবিধার বিষয়ে কেশববাবুরা নীরব। অতীতেও কলেজে কলেজে আংশিক সময়ের শিক্ষকদের হয়ে ওয়েবকুটার প্রতিনিধিদের কোনও কথা বলতে দেখা যায় নি।

উল্লেখ্য, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯-এর পর উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মেমো অনুযায়ী স্যাক্ট-১-এ তাঁরাই পড়বেন যাঁরা জি সি যোগ্যতা মানে উত্তীর্ণ। অর্থাৎ নেট, স্লেট, পিএইচডি ও এম ফিল যাঁদের আছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা দশ বছরের কম পড়িয়েছেন তাঁরা পাবেন ৩১,০০০ টাকা প্রতিমাসে এবং যাঁরা দশ বছরের অধিক পড়াচ্ছেন তাঁরা পাবেন ৩৫,০০০ টাকা। স্যাক্ট-২ হলেন তাঁরা যাঁদের ইউজিসি যোগ্যতামান নেই। মেমো অনুযায়ী এঁরা পাবেন ২০,০০০ ও ২৫,০০০ টাকা যথাক্রমে দশ বছরের কম ও দশ বছরের বেশি সময় কাজ করলে। প্রতি বছর জুলাই মাস থেকে এঁরা তিন শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্টও পাবেন এবং ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি করার পর এককালীন অনুদান ৫ লক্ষ টাকা পাবেন কিন্তু ন্যূনতম ১০ বছর কাজ করলেই তবে তা পাওয়া যায়। মন্দের ভাল এই সরকার তাও এই সমস্ত শিক্ষকদের কিছুটা মর্যাদা অন্তত দিচ্ছে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এঁদের ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিল। বেতন ছিল ৮,০০০ ও ১০,০০০ টাকা প্রতি মাস (১০ বছরের কম ও ১০ বছরের বেশি কাজ করলে) এবং অবসরের সময় পাবেন এককালীন এক লক্ষ টাকা ভাতা। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সেখানকার আংশিক সময়ের শিক্ষকদের ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের (স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের) এ সকল দিয়েছে। এই বঙ্গেই বহু ইউ জি সি যোগ্যতা মানে থাকা আংশিক সময়ের শিক্ষক ৪০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন এবং অবসর নিয়েছেন চরম বঞ্চনাকে সঙ্গী করে। এঁদের নিয়ে ওয়েবকুটা কোনদিন কিছু বলে নি। আর এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আংশিক সময়ের শিক্ষকদের জঙ্গি আন্দোলনের চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছিল তাঁদের ন্যূনতম স্বীকৃতি দিতে। শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে বামফ্রন্ট সরকার জেলায় জেলায় বহু কলেজ স্থাপন করেছিল। কিন্তু এসব করতে গিয়ে তারা পরিকাঠামো বা শিক্ষাদানে কারা নিযুক্ত থাকবে সেসব কিছুই ঠিক করে নি। ফলে উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের তারা নিয়োগ করে গিয়েছে ওই সমস্ত পরিকাঠামোহীন কলেজগুলিতে। একজনও পূর্ণ সময়ের কলেজ শিক্ষক ছিল না এমন বহু কলেজে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা পড়েছে। মনে পড়ে যাচ্ছে আব্দুল রেজ্জাক মোল্লার মদতে তৈরি হওয়া জীবনতলা কলেজের দায়িত্ব সামলেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক। রেজ্জাক মোল্লা তখন ছিলেন বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিআই(এম) এর মন্ত্রী। একইভাবে কান্তি গাঙ্গুলি, তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী, রায়দীঘিতে কলেজ খুলেছিলেন এবং সেখানে বহু বিভাগ সামলেছেন আংশিক সময়ের শিক্ষকরা। এমনকি কলেজ ইনচার্জ হিসাবেও কাজ করেছেন বহু আংশিক সময়ের শিক্ষক। এসব তথ্য ওয়েবকুটার কাছেও ছিল বা আছে। কিন্তু তারা সত্যিই কি কিছু করেছে? মনে পড়ে যাচ্ছে ২০১৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক শিক্ষকের এক লক্ষ টাকা এককালীন গ্রাচুয়িটি পেতে দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা। এককালে সক্রিয় ওয়েবকুটার সদস্য পরিবর্তনের সরকারের আমলে জার্সি পাল্টে কলেজের ক্ষমতা

কুক্ষিগত করে সর্বোচ্চ পদে (প্রিন্সিপ্যাল) পৌঁছানো অধ্যাপকের এই প্রশ্নে বাধ সাধার ঘটনা। দীর্ঘ দু বছর লড়াই করে (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে যোগাযোগ করলে অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীকে নোট দিয়ে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সেটি মঞ্জুর করতে বি পি আই কে নির্দেশ দেন। এই বেদনাবিধুর দিনলিপির কথা জানিয়েছেন সেই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। অবসরপ্রাপ্ত সেই শিক্ষকের যা যোগ্যতা ছিল এই কলেজের বহু পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের তা ছিল না।

প্রথমদিকে ওয়েবকুটা আংশিক সময়ের শিক্ষকদের সংগঠনের সভ্য করত না। বামফ্রন্ট সরকার যখন তাঁদের ন্যূনতম মর্যাদা দিচ্ছে সেই সময়ও তারা তার বিরোধিতা করে গিয়েছে। অথচ তারা কলেজের পঠনপাঠন ছাড়াও অন্যান্য দায়িত্বপালন (পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন, ছাত্রসংসদ নির্ধারণের সুষ্ঠু সম্পাদনে অংশগ্রহণ, কলেজ স্পোর্টসের পরিচালনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার পরিচালনা ও অংশগ্রহণ, কলেজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ) সব করেছেন। ওয়েবকুটা প্রথমে কৌলিন্য হারানোর ভয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষকদের সদস্যপদ না দিলেও পরে সংগঠন সংঘ্যালঘু হয়ে উঠবে এই আশংকায় সদস্যপদ দেওয়া শুরু করলে তাঁরা তখন নিজেদের সংগঠন তৈরি করে নিয়েছে। সংগঠনের আজীবন সদস্যপদেও বিভাজন রাখা হয়েছে, সদস্য স্থায়ী বা পূর্ণ সময়ের, কোন মর্যাদার এবং আংশিক সময়ে আজীবন সদস্য কিনা! আশ্চর্য হতে হয় অতিথি অধ্যাপক যাঁরা পরিবর্তনের সরকারের জমানায় নিয়োগ পেয়েছেন তাঁদের জন্যও ওয়েবকুটার দরদ দেখে! নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া ছাড়া যাঁরা কোন বৃহত্তর সংগ্রাম বা আন্দোলন করেন না তাঁদের অতিথি ও আংশিক সময়ের শিক্ষকদের জন্য মায়াকান্না দেখে তাজ্জব হতে হয় বলে জানালেন সরকারি কলেজে কর্তব্যরত এক আংশিক সময়ের শিক্ষক। এতদিন করেননি বলে করতে পারবেন না তা নয়। কিন্তু এঁদের উদ্দেশ্য সাধু নয়।

অন্যভাবেও সংগঠন এখন সংকটে। যে সমস্ত অধ্যাপকরা পিএইচডি ও এমফিল থাকা সত্ত্বেও ইনক্রিমেন্ট এতদিন ধরে পান নি পরিবর্তনের সরকার প্রভাবিত কলেজ টিচারদের সংগঠন ওয়েবকুপা তাঁদের বলেছে যে তাঁরা ওই সংগঠন করলে ইনক্রিমেন্ট সহজে হয়ে যাবে কিন্তু ওয়েবকুটা করলে প্রমোশন বন্ধই থাকবে—জানালেন ওয়েকুটার এক সদস্য। এমতাবস্থায় ওয়েবকুটার সংগঠন ধরে রাখা সত্যি বেশ কঠিন। মুখ্যমন্ত্রী আংশিক ও অতিথি অধ্যাপকদের স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২ করলে তাঁদের পে-প্রোটেকশন দেবেন বলেছিলেন, মেমোতেও তাই বলা আছে। অবস্থা যাইহোক ওয়েবকুটার চালাকি ধরা পড়ে যাচ্ছে তাই নতুন শিক্ষকরা আর এই সংগঠনের সদস্যপদ নিতে ইচ্ছুক নয়। শুধু তাই নয় পুরনো শিক্ষকরাও ওয়েবকুটার সদস্যপদ ছেড়ে দিচ্ছেন বলে জানালেন সরকার পোষিত এক কলেজের পূর্ণসময়ের স্থায়ী শিক্ষক। উভয় সংকটে পড়া ওয়েবকুটা সংগঠন কিভাবে ধরে রাখে সেটিই এখন প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। ওদিকে কলেজে কলেজে বহু অতিথি শিক্ষককে প্রিন্সিপ্যালরা নির্দিষ্ট সময়ের (সরকারি ঘোষণা মাফিক সময়ের পরে) পরেও ঢুকিয়েছেন বলে অভিযোগ। সরকারি তরফে চার আমলার (এরা সকলেই সহকারি ডি পি আই) দ্বারা ইন্টারভিউ করানো হবে বলে উচ্চশিক্ষা দফতর জানিয়েছে। সেখানে অরিজিন্যাল নথি যাচাই হবে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরই অ্যাপ্রোভাল লেটার দেওয়া হবে।

দলীয় আনুগত্য ছেড়ে এগিয়ে আসছে ছাত্রসমাজ

অনুপম কাঞ্জিলাল

একে এক নতুন উন্মেষ পর্ব বলেই চিহ্নিত করা যায়। এদেশের নাগরিক সমাজের মত এদেশের তাবৎ ছাত্র সমাজও একেবারে দলীয় আগ্রাসনে আটকে পড়েছিল। আমরা বার বার দেখেছি এদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলির চাপে ছাত্র সমাজ যেন শুধু মাত্র লেফট্-রাইট করে গেছে। দেশ-জাতির বৃহত্তম স্বার্থ যেন ভুলতেই বসেছিল ছাত্র সমাজ, যেন একটি কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলি হেলন বাদ দিয়ে ছাত্র সমাজের কোন কিছুই করার ছিল না। বাম ডান নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো যে ভাবে ছাত্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছিল তাতে ছাত্র সমাজ নিছক একটা রাজনৈতিক দলের ছোট শাখা ছাড়া কোন তাৎপর্য ধরে রাখার জায়গাতেই ছিল না। ছাত্র সমাজের এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তি ঘটেছে সম্প্রতি দেশের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও নতুন নাগরিকপঞ্জি আইন প্রয়োগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতায়। দেশের প্রবল পরাক্রমশালী কেন্দ্রীয় সরকারকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ছাত্র সমাজ। এদেশের ছাত্র সমাজের এই প্রতিবাদ মুখর চেহারা বাস্তবিকই এক নতুন উন্মেষ পর্বের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেশের ছাত্র সমাজকে। দেশের ছাত্র সমাজ যেভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা ছেড়ে জাতীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমে এসেছে, তাতে তাদের দলীয় পরিচয়ের গণ্ডি ভেঙে পড়ছে। এক অন্য ভূমিকায় উন্নীত হচ্ছে দেশের ছাত্র-সমাজ।

বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক যেভাবে গোটা দেশে উগ্র বিভাজনের বিষ ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, এবং সেই সূত্রে সবকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে যেরকম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছিল, তাতে এদেশের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখাটা একটা বড় প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এরকম একটা কঠিন সময়ে দেশের ছাত্র সমাজ যেভাবে সমস্ত দলীয় রাজনীতির পতাকা ছেড়ে, দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে আওয়াজ তুলে রাস্তায় নেমে এসেছে, তাতে ভরসা হয় কেন্দ্রীয় শাসক এক তরফা ভাবে কোন কিছু চাপিয়ে

দিতে পারবে না। দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সেখান থেকে বেনারস হয়ে এরাজ্যের যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি সর্বত্রই ছাত্ররা প্রতিবাদে উত্তাল। কেন্দ্রীয় শাসক দল এই ছাত্র প্রতিরোধে এতটাই বেসামাল যে তারা তাদের ছাত্র সংগঠন এভিবিপি-কে কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাস তৈরি করে ছাত্র-বিক্ষোভ সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের

ছাত্র আন্দোলন

ছাত্র শাখাকে দিয়ে শুধু নয়, কেন্দ্রীয় শাসক দল পুলিশকেও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, এই ছাত্র-বিক্ষোভকে দমন করতে। আর এটা করতে গিয়ে তারা বার বার নিজেদের অসহিষ্ণু করে এদেশের সংবিধান বিরোধী চরিত্র বেআব্রু করে তুলছে। বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় শাসক দল এই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেন্দ্রীয় শাসক দল ভেবেছিল, বিভাজনের যে খেলা তারা শুরু করেছে তার জোরে হিন্দুত্বকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে তুলে ধরা তাদের পক্ষে সহজ হবে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের স্বার্থেই তাই ছদ্ম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে খুব একটা লড়াই দিতে পারবে না, ফলে তার একতরফা জয় ছিনিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসক দলের এই অভিপ্রায়কে বানচাল করে দিয়েছে দেশের ছাত্র-সমাজ। এমন প্রতিরোধের বলয় তারা তৈরি করতে পেরেছে যার সামনে দাঁড়িয়ে বলা কঠিন যে এরা ভারত বিদ্বেষী। বলার চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু যে আন্দোলনের সামনে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত হয়, যে প্রতিবাদ মিছিলে 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে' গাওয়া হতে থাকে, যেখানে সংবিধান পড়ে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার অঙ্গীকার নেওয়া হয়, সেই ছাত্র সমাজের আন্দোলনকে দেশ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা যে বেশ কঠিন, তা বুঝতে পেরেই, কেন্দ্রীয় শাসক সম্প্রদায় অন্য পথ নিতে শুরু করে। সেই পথ হল প্রতিবাদী ছাত্রদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার পথ। এই কারণেই মুখ ঢেকে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে রড দিয়ে আঘাত করা হয়, জেএনইউয়ের প্রতিবাদী ছাত্রদের। তারপর প্রহৃত রক্তাক্ত ঐশী ঘোষদেরই দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে দিল্লির পুলিশ প্রশাসন। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢুকে ছাত্রদের উপর নির্মম অত্যাচার করে। দেশের কোণে কোণে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর শুরু হয়ে গেছে পুলিশি নজরদারি। কিন্তু তাতেও দমানো যায় নি প্রতিবাদী ছাত্রসমাজকে। ছাত্রদের উপর আক্রমণের ফলে আরও তেতে উঠেছে ছাত্র বিক্ষোভ। ঐশী ঘোষরা রক্তাক্ত হয়েও লড়াইয়ের রাস্তা থেকে একচুল নড়েনি। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রান্ত ছাত্রদের ধর্মীয় পরিচয়কে অগ্রাহ্য করে রুখে দাঁড়িয়েছেন ঝাড়খণ্ডের অনুজ্ঞা ঝাঁ। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বিভাজনের সব বিষকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আইনের, ছাত্রী বলে দিতে দ্বিধা করেন না, 'আমি নিজে হিন্দু, কিন্তু আমি মনে করি, আমার এখানকার মুসলিম বন্ধুদের রক্তের সঙ্গে আমার রক্তের কোন ফারাক নেই।' একই সঙ্গে অনুজ্ঞা ঝাঁ এটাও জানিয়ে দেন দেশের সংবিধানের আইনকে ভেঙে ফেলতে চাইছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। তারা ছাত্র সমাজের পক্ষে থেকে যে কোন মূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধানের রীতি ভাঙার অভিযানকে রুখে দেবেন বলে ঘোষণা করতে ভোলেন না অনুজ্ঞা। একই ভক্তি ও দৃঢ়তায় মাথায় সেলাই নিয়ে জেএনইউ-র ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ ঘোষণা করেন, তাঁর মাথায় পড়া প্রতিটি রডের আঘাত তিনি ফিরিয়ে দিতে চান, এদেশের সংবিধান নিয়ে আলোচনায় তর্কে ও যুক্তিতে। যে মেয়েটা মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে সংবিধানের পবিত্রতা নিয়ে তর্ক চায় আলোচনা চায়, সে সন্ত্রাসবাদী আর যারা মুখ ঢেকে তাকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করলো তারা দেশপ্রেমী, এ যুক্তি যে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, কেন্দ্রীয় শাসক দল বেশ বুঝতে পারছে। আর তা পাড়ছে বলেই তাদের রক্তচাপ বাড়ছে। দেশের ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় সরকারকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

হাতে হাত রেখে যে ছাত্র-সমাজ আজ প্রতিরোধের বলয় তৈরি করে সঙ্ঘর্ষে এগিয়ে আসছে, তারা এক নতুন সমন্বয় বোধের জন্ম দিচ্ছে। তাদের হাতে হাওয়ায় পতপত করে যে পতাকা উড়ছে তাতে মহান জাতীয়তাবাদী শহীদ রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খাঁন, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার প্রমুখের ছবি। সেই সমন্বয় বোধের তাড়নাতেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আবার হাতে হাত রেখে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে, ভেঙে পড়ছে ক্রমেই 'আমরা', 'ওরা'র দেওয়াল। অনেকদিন পর ছাত্র সমাজের এই উন্মেষ আবার দেশ-ও জাতির জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। জাতি বিপদে পড়লে ছাত্র সমাজকেই তো এগিয়ে আসতে হয় পরিত্রাতার ভূমিকায়। প্রত্যাশা করা যায় সেই ভূমিকাতেই বর্তমান ছাত্র সমাজকে দেখা যাবে।

শিক্ষাঙ্গনে ভূতের কীর্ত্তন

সোমা সেনগুপ্ত

শিরোনামটায় মনে হচ্ছে কোনো মজার প্রসঙ্গই হবে। হ্যাঁ, মজাই বটে, যেটা এই মুহূর্তে ঘটে চলেছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর সঙ্গে। ঠিক কিভাবে শুরু করলে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝানো যাবে তা নিজের কাছেই চিন্তার, কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির প্রবেশ এখন উভয়পক্ষেই, যারা শিক্ষাটা চালাচ্ছে আর যারা শিক্ষিত হতে চাইছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন কাগজের চল ছিল না কিন্তু শিক্ষার বিকাশ ছিল, তখন শ্রুতিই ছিল প্রধান মাধ্যম।

লোকপরম্পরায় শুনে শুনেই কত শ্লোক তখন শিখতে হোত ও মনে রাখতে হোত। অনেক পরে এল ভুর্জপত্র, তালপাতা ইত্যাদি যাতে সেইসময় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ কত কিছুই না লেখা হয়েছে। শিক্ষা মোটেও সহজসভ্য ছিল না, কিন্তু তাসত্ত্বেও মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, শিক্ষার আদর করেছে, শিক্ষিতকে সম্মান জানিয়েছে।

প্রাচীন যুগ থেকেই আমরা দেখে আসছি রাজা, মহারাজা সম্রাটের সভাকক্ষে বিভিন্ন কলায় পারদর্শীদের সাথে শিক্ষিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান মানুষদের কেমন মর্যাদা দেওয়া হোত। চাণক্যের একটি শ্লোকের মধ্যেই এই মর্ম নিহিত আছে,

''বিষত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে॥"

রাজনীতির পরিচালনা ক্ষেত্রেও এই বিদ্বান পন্ডিতদের সাহায্য নেওয়া হোত যার অন্যতম উদাহরণ চাণক্য নিজেই। সেইসময় আমরা পেয়েছি চরক, শুশ্রুত, আর্যভট্ট, কণাদ, নাগার্জুন, কালিদাস, গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং আরও অনেক অতিমেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের।

মুসলমান সম্রাটদের শাসনকালে, বিশেষত আকবর বাদশাহের রাজত্বে যেকালে শৌর্য-বীর্যে ভারতবর্ষ তুঙ্গে উঠেছিল তখনও বহু জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আলোকিত হোত সভাকক্ষ। ছিলেন লেখক আবুল ফজল। তিনি যে কতটা পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর রচিত 'আকবরনামা' থেকেই বোঝা যায়। সেখানে আকবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস এবং আকবরের রাজত্ব সম্পর্কে তিনটি ভাগে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া 'আইন-ই-আকবরী'-ও লিখেছিলেন আবুল ফজল।

ছিলেন রাজা বীরবল যিনি আকবরের দ্বারা তাঁরই মন্ত্রীসভায় নিযুক্ত হন প্রধান সভ্যসদ হিসেবে। যদিও তাঁর আসল নাম ছিল মহেশ দাস, কিন্তু চতুরতা ও বীরত্বের কারণে তিনি 'বীরবল' নামটি পান।

পরবর্তীকালে বৃটিশ আমলে রাজা রামমোহন রায়কে পাই সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের প্রধান হোতা হিসেবে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রথার সূত্রপাত করেন আইনের সাহায্যে। এনারা সেইসময় এই কাজগুলি এইজন্যই করতে পেরেছিলেন কারণ জ্ঞানের আলোকে ভালো-মন্দের ভেদাভেদ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সমাজের এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

এরপরে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁদের নাম লিখে শেষ করা যাবে না। এমন সব মনীষী স্ব স্ব শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে সমাজকে গৌরবান্বিত এবং শিক্ষার পাদস্পর্শে উন্নীত করেছিলেন। চিকিৎসক ডঃ নীলরতন সরকার, ডঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এঁরা তো তাদের শিক্ষাকে জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত করে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন।

এই প্রকৃত শিক্ষা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। এর কারণ এই নয় যে আমাদের জানার বা শেখার স্পৃহা চলে গিয়েছে। মুখ্য কারণ হল এই যে আমরা যেসকল রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি তারা যথার্থ শিক্ষিত নয় বলে। কিছুদিন আগে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের যে তথ্য বেরিয়েছিল তা যথেষ্ট ভয়াবহ। সেখানে বলা হয়েছিল, বাঁকুড়া জেলার প্রথম শ্রেণী পড়া ১৮% পড়ুয়া সংখ্যাই চেনে না, প্রথম শ্রেণীতে পড়েও অক্ষরজ্ঞান হচ্ছে না প্রায় ১৯% পড়ুয়ার, দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া প্রায় সাড়ে ১০% পড়ুয়ারও অক্ষরজ্ঞান হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, প্রথম শ্রেণীর মাত্র ৩৪.৫% পড়ুয়া ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চেনে। একটি প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষানুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ১৩.৯% শিশু দু সংখ্যার বিয়োগ করতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়া অর্ধেক পড়ুয়াই সাবলীলভাবে প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে পারছে না। শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে উঠছে অথচ না হচ্ছে অক্ষর জ্ঞান না শিখতে পারছে অঙ্কের প্রাথমিক ধাপ।

এক তো শিক্ষক নিয়োগই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, তার ওপর শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এমন সব কাজের যার সঙ্গে শিক্ষার কোনও সম্পর্কই নেই অথচ চাকরি টিকিয়ে রাখতে গেলে সেই সব অশিক্ষকমূলক কাজে তাঁদের মনোযোগ দিতে হচ্ছে। এতে শিক্ষা শুধুই ব্যাহত হচ্ছে। এর ওপর আছে পাশ-ফেল নিয়ে একেকরকম নির্দেশ, আবার রয়েছে বিভিন্ন রকম সহায়ক বই অপ্রয়োজনীয়ভাবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা।

সমস্ত বিষয়টা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় শিক্ষার পরিবেশ কেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। এই কারণগুলি যথেষ্ট চিন্তার—প্রথমত, শিক্ষিত হলে অশিক্ষিত মন্ত্রীত্বের দিকে আঙুল উঠবে। দ্বিতীয়ত, নিয়োগের ব্যবস্থা রাখতেই

হবে এবং সেটা হবে শিক্ষার মান অনুযায়ী। তৃতীয়ত, সেই দলদাস পাওয়া যাবে না যারা নির্বিচারে শুধু নির্দেশের অপেক্ষাতেই অপকর্ম করে যাবে। চতুর্থত, সবথেকে বড় কথা, জনগণ শিক্ষিত না হলে নিজেদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কোনো সম্যক জ্ঞানই থাকবে না এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা নিজেদেরকে জনগণের টাকায় ক্ষমতালোভী, স্বেচ্ছাচারী, মানবিকতাহীন শয়তানে রূপান্তরিত করে আমৃত্যু রাজত্ব চালিয়ে যাবে।

এদের এই সামান্য জ্ঞানটুকুও নেই যে এই অবস্থা চলতে থাকলে বহির্বিশ্ব থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়ার জন্য যোগ্যতার মানই ছুঁতে পারবে না, ক্রমশ একটি রাজ্যের তথা একটি দেশের পরিচয় হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে সময় লাগবে না।

আশার কথা একটাই, নতুন প্রজন্ম শিক্ষা চাইছে যদিও সেখানেও চলছে চোরাগোপ্তা আক্রমণ। তথাপি ছাত্রছাত্রীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া অতটা সহজ হচ্ছে না কারণ শিক্ষিত নাগরিক সমাজ এখন এই অত্যাচারিত ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থার ব্যতিক্রম, কিছু উন্নত পরিষেবা নিয়ে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত আপ সরকার এই সময়ের নিরিখে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে যা যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে। তারা তাদের বাজেটে ২৬% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছে যা ভারতের যেকোনো রাজ্যের থেকে অধিক। তাতে বেসরকারী স্কুলের থেকে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই সরকারী স্কুলের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে।

এ ব্যাপারে আপ সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া শিক্ষাদপ্তরকে একটি অত্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করেছেন। স্কুল পরিচালন সমিতিকে বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং তাদের প্রত্যেক বছর ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া যাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

আগে যেখানে বেসরকারী স্কুলে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পেতে শিক্ষার্থীদের প্রচুর ব্যয় করতে হোত সেখানে সরকারী স্কুলেই এখন শিক্ষার্থীরা সেগুলি অনেক কম ব্যয়ে নির্বাহ করতে পারছে আর তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ হয়েছে অনেক স্বচ্ছ। এতে একটা কথাই প্রমাণ হয়, দেশকে যদি সত্যিকারের প্রগতি এবং উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য থাকে তবে তাকে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব নয়।

সেক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে ভূতের কীর্তন তখনই বন্ধ হবে যখন প্রকৃত শিক্ষাদরদী কোন সংগঠনের দ্বারা সার্বভৌমিক, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, উন্নত চিন্তাধারার মাধ্যমে পরিচালিত হবার সুযোগ থাকবে। মানবসমাজের বিকাশের সাথে সাথে শিক্ষার সম্পর্ক সবসময়েই অবিচ্ছেদ্য। অতএব শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করাই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

ভারতের ২৯টি রাজ্যের ২০টিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ট

৯ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হিন্দু (লক্ষ)

	হিন্দু	ইসলাম	খ্রিস্টান	বৌদ্ধ	শিখ
● লাদাখ	১	৪৬	-	৫০	-
● মিজোরাম	২.৭৫	-	৮৭.১৬	৮.৫১	-
● লক্ষদ্বীপ	২.৭৭	৯৬.৫	-	-	-
● কাশ্মীর	৪	৯৫	-	-	০.৩৫
● নাগাল্যান্ড	৮.৭৪	-	৮৮.১	-	-
● মেঘালয়	১১.৫	-	৭৪.৫	-	-
● অরুণাচল প্রদেশ	২৯	-	৩০.২	১১.৭	-
● চণ্ডীগড়	৭.৮৩	০.৫	০.০৮	-	১.২৮
● মণিপুর	৪১.২	-	৪১.৩	-	-

- লকডাউনের অজুহাতে সমস্ত শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষাক্রম, পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেওয়া; শিক্ষাবর্ষ, পরীক্ষা, ফল প্রকাশ, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ প্রভৃতি পেছিয়ে দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে
- কোন শিক্ষাঙ্গনকে কোয়ারাইনটাইন কেন্দ্র বা সেফ হোম করতে দেওয়া চলবে না
- মাস্ক পরে, শারীরিক দূরত্ব ও অন্যান্য প্রতিষেধন বিধি মেনে এবং শিক্ষাঙ্গন নিয়মিত পরিশ্রুত করে অবিলম্বে পঠনপাঠন শুরু করতে হবে
- মাধ্যমিক স্তর থেকে অনলাইন ক্লাসের জন্য সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ট্যাব (ছোট ল্যাপটপ), ডঙ্গল এবং মাসিক ন্যূনতম টাকার রিচার্জের ব্যবস্থা করতে হবে।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে

দারিদ্র সীমা

জয়দেব গুপ্ত

আমি আর সনাতন ভারতবর্ষের এক প্রত্যন্ত গ্রামের আলপথ ধরে হাঁটছিলাম। দেখি উল্টো দিক থেকে একজন মানুষ হাতে এক ন্যাকড়ার পুঁটলিতে কিছু নিয়ে আসছে। খালি গা, পরনে তার কোমর থেকে হাঁটু অবধি একটা খাটো ধুতি।

সনাতন জিজ্ঞেস করল, আপনার হাতে ওটা কী?

—ইটা আমার বাচ্চার মড়া বটে।

—মড়া? মানে ডেডবডি? কী হয়েছিল?

—কী আর হব্যেক, খেতে না পেলে তো মর‍্যেই শান্তি গ বাবু।

—তোমার সন্তানের মৃতদেহ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—গোর দিব বট্যে। ই বিটাটা ত মইর‍্যেই গেছে।

—কী করে?

—খেতে দিতে লারলুম গ। ইটার আগেও ত দুইটা মইর্‌ছে।

—তুমি কী করো, বাচ্চাগুলোকে খেতে দিতে পারনা?

নিরন্ন চাষী

—হাতে বিটার মড়া ধরো হাস্যালেন গ বাবু। কী খেত্যে দিব? কাম লাই। কাজ লাই। পয়সা লাই। আমার বউটার বুকে দুধ লাই গ। কুথায় পাব্যে?—চিনির মিলে কাম করত্যাম ত। ত উটা ত বন্ধ লিলে। লকআউট। পেটে দানা আসবো কুথা থিকে? হ? হ? ই গাঁয়ের সকল্যেই ত হুথায় কাম করতো। ত মিলটাই উঠ্যে গেল। ই পোড়া জায়গায় ত কাম মিলে না। ত সব্যার ঘর‍্যেই ত বিটা বিটি মরছ্যে। ঘরে চাল শেষ হয়্যে গেল—ত কন্দটা, মুলটা খেয়ো কদিন বাঁচে গ?

—তোমার সব বাচ্চাই না খেতে পেয়ে মরে গেছে নাকি?

—তিনটে মরল্য। তবে সব বড়টা বেঁচ্যে রচ্ছ্যে। হুই যে পেরথমেই বিটি হল্য—তখন কলে কাম করত্যাম। তাই খেতো পেয়্যেছিল, বেঁচ্যে গেল।

—সে এখনও বেঁচে আছে?

—আছে বটে। এখন ত ডাগর হইছে। শুইনতে পাই খাই প'রে ভালই আছে গ। হুই যে বাবুরা উকে কিন্যে লে গেল। দুহাজার টাকা দিল্যে।

—কী বলছ? তোমার মেয়েকে বাবুরা কিনে নিয়ে গেছে?

—হ। হ। তাই বুলছি। দু হাজার টাকায় মেয়েটাকে বাবুদের কাছে বেচ্যে দিছি। তাই এখন তা ও খাই পর‍্যে ভালো আছে।

মানে বাবুরা তোমার ডাগর মেয়েকে কিনে নিল? তার মানে তো...

—কুন মানে লাই। মানে কী? কিনে লিয়ে গেছে ত বাবুরা উকে কাম কাজ কর‍্যাবে। জল তুলা, ঝাড়া পোঁছা, ঘরের কাম কাজ কর‍্যাবে। কিনে লিয়ে গেছ্যে তো বাবুরা উয়াকে ভোগে লিব্যে। লিব্যে ত লিব্যে। খেত্যে ত পাবে। বেঁচো ত থাকব্যে।

—না মানে বলতে চাইছি, কুমারী মেয়ে—

—বাবু রাখেন কথা। আপনারা ত ভদ্দরলোক। মেয়ে মানষের শুদ্ধি, অশুদ্ধি, অই, কি বলে গ, কুমারীত্ব, সতীত্ব—উ সব ভদ্দর লোকেদের কথা। আমাদের ঘরে উ সব লাই গ। আমাদের ঘরে বল্যে, বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাটাই আসল কথা। যেমন কর‍্যে হোক বেঁচে থাকা।

* * * *

দরিদ্র—যে সব মানুষের মাথাপিছু প্রতিদিনের আয় অর্থাৎ খরচ করার ক্ষমতা দারিদ্র সীমা রেখার নীচে, তাদেরই বলা হয় দরিদ্র।

দারিদ্র সীমা রেখা—আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে যে মানুষের মাথা পিছু একদিনের আয় ১.৯৫ ডলারের থেকে কম, তাদের দরিদ্র বলা হয়।

এবং এই হিসাবে ভারতবর্ষের ৬০ থেকে ৬৫% মানুষ দরিদ্র।

কিন্তু যদি কোন দেশের ৬০ থেকে ৬৫% মানুষ দরিদ্র হয়, সেক্ষেত্রে সেটা সেই দেশের নবাব বাদশাদের লজ্জার কারণ হয়। দারিদ্র্য হঠাৎ করে কমান যায় না। তাই অঙ্কের হিসাব বদলে দিতে হয়। তাই ভারতবর্ষে নবাব বাদশারা স্থির করলেন, বিদেশী মুদ্রার হিসেব নয়, ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র সীমা রেখার হিসেব হবে ভারতীয় মুদ্রায়। তাই নতুন হিসাব তৈরি হল—

গ্রামাঞ্চলে—৩২ টাকা। শহরাঞ্চলে—৪৭ টাকা।

তথ্য সূত্র—The expert committee set up by the Planning Commission under C. Rangarajan, former chairperson of Prime Minister's Economic Advisory Council,

	গ্রামীণ দরিদ্র (১০ লক্ষে)	শহরের দরিদ্র (১০ লক্ষে)	মোট দরিদ্র (১০ লক্ষে)	শতকরা হার
রঙ্গরাজন কমিটি	২৬০.৫	১০২.৫	৩৬৩	২৯.৫

বলা হল, যদি কোন মানুষের দিনপ্রতি মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা ৩২ টাকা/৪৭ টাকার কম হয়, তবেই তাকে দরিদ্র বলা হবে। সুতরাং নতুন হিসেবে মোট দরিদ্রের সংখ্যা কমে গেল। ৬০-৬৫% মানুষ

আর দরিদ্র রইল না। মাত্র ২০% মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে রইল। অঙ্কের হিসেবে গরীবী হটে গেল। সুতরাং অঙ্কের হিসেবে যদি জনপ্রতি একদিনের হিসেবে রোজগার ৩২ টাকা বা তার বেশী হয়, তাহলে সে আর গরীব নয়।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা জানায়, ৩২ টাকায় কোনক্রমে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়া যায় (যদি যায়), তার বেশী কিছু নয়। অর্থাৎ যারা শুধু খেতে পাচ্ছে, তারা দরিদ্র নয়। তাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাদের রোগ অসুখ হলে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই অঙ্গ আচ্ছাদনের। ঝড় বাদলে ঘরের চাল উড়ে গেলে, তা সারাবার প্রয়োজন নেই। নেই নেই.... আমাদের নবাব, বাদশাদের হিসেব মত—নেই, প্রয়োজন নেই।

এবার তাহলে আসি ২০% দরিদ্রদের কথায়। ২০% কে সংখ্যায় হিসাব করলে সেটা ২৭ কোটি মানুষ। হ্যাঁ, ঠিক তাই, ভারতবর্ষের ২৭ কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থাকে (সরকারি হিসাবে)। সুতরাং, প্রথমেই যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—সেটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতবর্ষে হাজার হাজার গ্রামে এই ঘটনা ঘটছে, ঘটে চলেছে। আর এই দারিদ্রের কারণেই ভারতবর্ষে প্রতিদিন (হ্যাঁ, প্রতিদিন) তিন হাজার শিশু অপুষ্টিতে অথবা অপুষ্টি জনিত কারণে মারা যায়।

PTI/Times of India (31st May 2018)-র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয়দের গড় আয় (per capita income) বছরে ১,১৩,০০০ টাকা। অর্থাৎ ভারতীয়দের মোট আয় ১,১৩, ০০০×১৩৪ কোটি টাকা। এই হিসাব পরবর্তী সারণীতে ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অসাম্য আমাদের দেশে দারিদ্রের মূল কারণ। ভারতবর্ষের মোট সম্পদের ৭৪% থাকে ১০% মানুষের আয়ত্বে। আর বাকিরা? সারণী নিচে দেওয়া হল—

ক্রেডিট সুইস গ্লোবাল ওয়েলথ ডেটাবেস

সামাজিক শ্রেণী %	সম্পদের অধিকার %	৫০-৫০
নীচের থেকে প্রথম ১০	০.২	
১০-২০	০.৪	
২০-৩০	০.৮	৪.৫% এর মালিক ৫০% জনসংখ্যা
৩০-৪০	১.৩	
৪০-৫০	১.৮	
৫০-৬০	২.৬	
৬০-৭০	৩০৮	৯৫.৫% এর মালিক ৫০% জনসংখ্যা
৭০-৮০	৫.৭	
৮০-৯০	৯.৪	
প্রথম ১০	৭৪	

তথ্য সূত্র—১) ভারতের জনসংখ্যার দরিদ্রতম ১০% অংশের কাছে রয়েছে জাতীয় আয়ের ০.২%। OXFAM জানিয়েছে ভারতে আয়ের বৈষম্য প্রকট হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যার ১% ধনকুবেরদের হাতে রয়েছে ৭৩% সম্পদ। ২০০৬-'১৫ দশকে সাধারণ শ্রমিকদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। ধনকুবেরদের সম্পত্তি বেড়েছে ছয়গুণের বেশী।

Business Today in Last Update: January 30, 2019। 16:50 IST

১] প্রথম ১% মানুষের কাছে আছে ৫৮% সম্পদ। পরবর্তী ২ থেকে ১০% মানুষের হাতে আছে ১৬% সম্পদ।

২] যোগ করলে, প্রথম ১০% মানুষ ৭৪% সম্পদের অধিকারী।

৩] প্রথম ৫০% মানুষের সম্পদের পরিমাণ ৪.৫%।

৪] আর বাকি ৫০% মানুষের সম্পদের পরিমাণ ৯৫.৫%।

৫] Oxfam-এর Report অনুযায়ী এই অসাম্য আরও বাড়ছে। অর্থাৎ ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্ররা আরও গরীব।

ভারতীয় অর্থনৈতিক শ্রেণী অনুযায়ী সারণী সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে ঐ সম্পদ সারণীকেই দেখানো হয়েছে। অবশ্য সম্পদ এবং আয় যে পরস্পরের প্রত্যক্ষ সমানুপাতিক, এটা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

এবার আমরা ঐ সারণী থেকেই আনুপাতিক হারে প্রত্যেক শ্রেণীর বার্ষিক ও দৈনিক আয়ে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। সহজ পাটিগণিতের সাহায্যেই এটা করা হয়েছে।

সামাজিক শ্রেণী %	সম্পদের মালিকানা %	৫০-৫০	প্রতি বার্ষিক আয় (টাকা)	প্রতিদিন জনপ্রতি আয় (টাকা)
শেষ ১০	০.২		২২৬০	৬.১৯
১০-২০	০.৪		৪৫২০	১২.৩৮
২০-৩০	০.৮	৫০% মানুষের হাতে ৪.৫%	৯০৪০	২৪.৭০
৩০-৪০	১.৩		১৪৬৯০	৪০.১০
৪০-৫০	১.৮		২০৩৪০	৫৫.৭২
৫০-৬০	২.৬		২৯৩৮০	৮০.৫০
৬০-৭০	৩.৮	৫০% মানুষের হাতে ৯৫.৫%	৪২৯৪০	১১৭.৬৪
৭০-৮০	৫.৭		৬৪৪১০	১৭৬.৫০
৮০-৯০	৯.৪		১০৬২২০	২৯১.০০
প্রথম ১০	৭৪		৮৯৬২০০	২২৯০.৯৫

যেমন, মোট আয়ের ০.২% সবচেয়ে দরিদ্রদের আয় হলে, ১০০% অর্থাৎ ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের গড় আয় বার্ষিক ২২৬০ টাকা। মাথাপিছু প্রতিদিনের আয় ৬ টাকা ১৯ পয়সা।

তারপরের সারিতে যারা আছে তাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৪৫২০ টাকা বা দৈনিক ১২ টাকা ৩৮ পয়সা। এইভাবেই প্রত্যেক শ্রেণীর আয় সারণীতে দেখানো আছে।

অবশ্য সরকারী তথ্যে এইভাবে দেখানো হয় না। সেখানে থেকে যেটা পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ—

Business Standard/New Delhi/08.01.2019

২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৮-'১৯ এ 'এন.ডি.এ.' সরকারের সময়ে জনপ্রতি বার্ষিক জাতীয় আয় ৪৫% বেড়েছে ২০১৪-'১৫তে যা ছিল ৮৬,৬৪৭ টাকা।

চার বছরের মধ্যে মানুষের গড় আয় ৪৫% বেড়েছে। নিন্দুকরা যাই বলুক, সরকারকে সাবাসি দিতেই হবে।

কিন্তু সরকার বাহাদুর, অঙ্ক যে অন্য কথা বলছে। ২০১৪-'১৫ তে যদি গড় আয় ৮৬৬৪৭ টাকা ছিল এবং তার বৃদ্ধি হয়েছে ৪৫%—এটা ধরে নিয়ে হিসাব করলে ২০১৮-১৯-এ মানুষের গড় আয় হয় ১,১৩,০০০ টাকা। তার মানে আমাদের ধরে নেওয়া ১,১৩,০০০ টাকা থেকে ১৫% বেশী।

ঠিক আছে না হয় আপনার হিসেবটাই রইল। আর সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গরীব মানুষের প্রতিদিনের রোজগার দাঁড়াল ৭ টাকা ১১ পয়সা। তারপরের ১০% মানুষের রোজগার হল ১৪ টাকা ২৩ পয়সা।

তারও পরের শ্রেণীর দিনপ্রতি মাথাপিছু রোজগার পৌছল ২৮ টাকা ২৩ পয়সায়।

কী কাণ্ড, তাতেও যে ভারতীয় গরীবদের সংখ্যাটা হয়ে গেল ৩০%।

হে মাননীয় সরকার বাহাদুর, একটু ঠিক করে ভেবে নিয়ে বলুন তো কোনটা ঠিক?

—ভারতের দারিদ্র সীমা রেখা ৩২ টাকা/৪৭ টাকা মাথাপিছু প্রতিদিন?

—ভারতের মাত্র ২০% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে?

—আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কি সত্যিই ৬০ থেকে ৬৫% ভারতীয় দরিদ্র?

—ভারত ভীষণ বেগে উন্নতি করছে?

সনাতন বলল : —Statistical Fallacy কাকে বলে?

আসলে ভারতবর্ষের মানুষের প্রধান সমস্যাগুলো হল—দারিদ্র ও অসাম্য, শিশু মৃত্যু, দুর্নীতি, কর্মহীনতা, শিক্ষার অভাব ও দিশাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ ও চিকিৎসার অভাব, দূষণ, নারী শিশু, দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, অপরাধ, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা প্রমুখ। যেগুলির উপর আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আব্রাহামের আরব সন্তান

নাসির আহমেদ

লেখাটি শুরু করা যাক শেষের কথা বলে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম অধ্যায় জেনেসিসের ষোড়শ অনুচ্ছেদে আব্রাহামের আরব সন্তান ইসমাইলের উল্লেখ আছে। ইহুদী, খৃষ্ট ও ইসলাম—এই তিন ধর্মের আদি পিতা আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের মিশরীয় স্ত্রী হাজেরার সন্তান ইসমাইলের জন্ম হয়েছিল মরুভূমি দেশ আরবে। ইসমাইলই ইসলাম ধর্মের প্রথম পুরুষ বলে মান্য। বাইবেলের নির্বাসে ইসমাইল তার দেশে কাটাবে যাযাবরের জীবন। সে থাকবে অন্যদের বিপরীতে। অন্যরা হবে তার বিরুদ্ধচারী। তবে সে পৃথিবীতে রেখে যাবে তার বৃহৎ, সমৃদ্ধ বংশধর, যারা ছড়িয়ে থাকবে পৃথিবীর সর্বত্র।

আরব সন্তানের দেশ—লিবিয়া, লেবানন, ইরাক, মিশর এবং অআরবীয় ইরানে আজ রাজনৈতিক ও আর্থিক অসন্তোষের তাপপ্রবাহ বইছে। এই সব দেশে তরুণ প্রজন্ম বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের নেতৃত্বে। তাদের দাবী গুলি তৃতীয় বিশ্বের আর পাঁচটা দেশের আন্দোলনের মতই : দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, রাজনৈতিক ও আর্থিক সংস্কার, বেকারত্বের বিস্ফোরণ ও লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার, শিক্ষা ও চিকিৎসায় বিশ্বমানের পরিকাঠামো—এই সব মৌল চাহিদা নিয়ে। কাফে, রেস্তোঁরা ও শহরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে উপচে পড়া ভিড় থেকে তরুণদের নেতৃত্বে ক্ষোভের উদগীরণ ঘটেছে তাদের দেশের সরকার ও মিলিটারির ভারী বুটের শব্দের বিরুদ্ধে। এই সব দেশগুলিতে প্রায় বিনা রক্তপাতে রাষ্ট্রপ্রধানরা কোথাও পদত্যাগ করেছে, কোথাও নমনীয় হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম আজ বুঝেছে পশ্চিমী বিশ্বের ক্ষমতার কাছে আরব

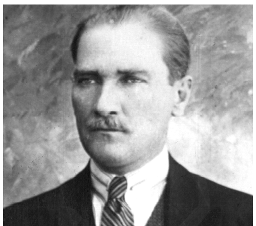

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক

দুনিয়ার অবদমিত থাকার গুহ্য তত্ত্ব। জেনে গেছে আরব দেশগুলির সরকার পুষ্ট অভিজাত ধনীরা কিভাবে ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্পোরেটের কারবারে বিনিয়োগ করে পশ্চিমে তথা আমেরিকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে আর নিজের দেশের কর্মহীন তরুণদের প্রতি উদাসীন হয়ে থেকেছে। প্রশ্ন জেগেছে পশ্চিমী বিশ্ব কি সত্যিই আরব বিশ্বে সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী গনতন্ত্র চায়? লক্ষণীয় এই যে আরব বিশ্বের তরুণ প্রজন্মের এমনতরো জিজ্ঞাসায় ধর্মের প্রসঙ্গ আদৌ সমস্যাকীর্ণ পৃথিবীর মানুষের আন্দোলন সর্বত্রই আজ এক সুতোয় বাঁধা। আজ থেকে উনিশ বছর আগে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দিনটি পাঠককে স্মরণ করানো দরকার—সে দিনের ঘটনা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় আজ ভুলে যেতে চাইবেন। নিউইয়র্ক শহরে ঐ দিন মুসলিম সন্ত্রাসবাদী হানার হিংস্রতা ও কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গ কোথাও আলোচিত হলে কুণ্ঠিত মুসলিম অসহায় বোধ করেন। কেউ বা করুণা প্রত্যাশী হয়ে আত্মরক্ষার যুক্তিও দেখান; বলেন পশ্চিমী দুনিয়ার আর্থিক ও বিদেশনীতি যেভাবে ইজরায়েলের আগ্রাসণকে অনৈতিকভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে, প্যালেস্টাইনিদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে—এটা মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম তথা আমেরিকার প্রতি ক্ষোভের অন্যতম কারণ। অবশ্যই এখন ক্ষোভের যৌক্তিকতা আছে। জার্মানিতে ইহুদি গণহত্যার বিরুদ্ধে মানবিক ঐক্য ইজরায়েলের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত করতে পেরেছে, কিন্তু স্বভূমিচ্যুত বিপন্ন প্যালেস্টনীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বের বিবেক তেমন জেগে ওঠেনি। পরিহাসের মত শোনালেও হিটলারের ইহুদী নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অপরাধীই ইজরায়েল যেন ফিলিস্তিনীয়দের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। বাহাত্তর বছর ধরে ফিরিস্তীনিয়দের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা, সামরিক অত্যাচার ও আর্থিক নিপীড়ন তাদের

সাহিত্য, কবিতা ও ইতিহাসে একটি বেদনার সুর বেজে উঠেছে—যে ইতিহাস নির্যাতিতের সমাধিক্ষেত্র।

দুই দশক আগে আরব ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনের উত্থান বিশেষত আরব দুনিয়ার আলস্যগর্বী, স্থিতিশীল ও আমেরিকার করুণা প্রত্যাশী রাজনৈতিক অবস্থানে প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল। পশ্চিমী বিশ্বের কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির কাছে দুশো বছরের অবদমনের বিরুদ্ধে ধর্মকে হাতিয়ার করে সন্ত্রাসী সহিংসতা বর্তমান শতকের সবচেয়ে আলোচিত ইতিহাস।

আরব বসন্ত, টিউনিসিয়া

কিছু বিশেষজ্ঞের মতে নয়-এগারোর ঘটনায় স্তম্ভিত পৃথিবীর ধারণা এই যে ইসলাম এক বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দর্শন যা বিশ্বের অন্য সভ্যতার প্রতি বৈরি মনোভাবাপন্ন। 'বিপন্ন' ইসলাম রক্ষার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের যেন এক 'আক্রান্তে'র রোষ। তাদের লক্ষ্য বৈরি সমাজ যা কিনা সাম্রাজ্যবাদী, ভোগলিপ্সু, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পশ্চিম মূল্যবোধ যেখানে মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে। অমুসলিম বিশ্বে মুসলিম জগত সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত ধারণা 'ইসলামের আঁতুরঘর' মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে : মধ্য এশিয়ার আরব দেশ গুলি গত পাঁচ দশকে তেল সম্পদে অপরিসীম বিত্তশালী হয়েছে, উদার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে, পূর্ব পশ্চিমের দরজা উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু তাদের সমাজ, অন্দরমহল ইসলামী অনুশাসনে আজও অবরুদ্ধ হয়ে আছে। একুশ শতকের মুক্ত বিশ্বে, প্রযুক্তির অভাবিত প্রগতির যুগে মুসলিম দুনিয়ায় আধুনিক ও শারিয়া আশ্রিত জীবনধারা বেমানানভাবে সহাবস্থান করে আছে।

মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক টমাস লিপম্যান তাঁর 'Understanding Islam' এর ভূমিকায় লিখেছেন, গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কোন সহিংস ঘটনার বিশ্লেষণে পশ্চিমী গণমাধ্যম এগুলি 'মুসলিম' বিশেষণ ব্যবহার করে গোল বাধিয়েছে বেশী। ফলত 'মুসলিম' নামের তকমা সন্দেহ ও অপবাদে চিহ্নিত হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, লেবাননে মুসলিম বামপন্থীদের যুক্ত ঘোষণা, ইরানে মুসলিম চরমপন্থীদের হুঁশিয়ারি, নাইজেরিয়ায় মুসলিম উগ্রবাদী ভক্তিবাদী দণ্ডের (cultist) বর্বরতা। 'মুসলিম' শব্দের অনাবশ্যক ব্যবহারে যে অবিবেচক সাংবাদিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণে মুসলিম দেশগুলিতে অনেক বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনকে মৌলবাদী সন্দেহে দেখা হয়েছে।

তবে লিপম্যানের বক্তব্যের সঙ্গে এক মত হয়েও বলা দরকার, ধর্মকে বর্ম করে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সহিংসতার ঘটনা ইতিহাসে কম নেই। খোদ ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক হ্যাব্সবার্গ রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের তিরিশ বছরের যুদ্ধে (১৬১৮-১৬৪৮) এক কোটিরও বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কোন যুদ্ধে এমন হত্যালীলা ইতিহাস দ্যাখেনি। ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসতত্ত্বে রাজনীতি ও অর্থনীতির হিসেব নিকেশের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে তাকে উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমে যে ভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল এমনটা মানুষ আগে দেখেনি। যে কোন সন্ত্রাসী যুদ্ধ আসলে স্নায়বিক। নয় এগারোয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের আগুন, মানুষের আর্তনাদ আজকের ছবির ভিডিও মনের পর্দায় মুহুর্মুহু ভেসে উঠে উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন মানুষের স্নায়ুকে বিকল করেছে বেশী। পৃথিবীতে সন্ত্রাসী আক্রমণ যত মানুষ নিহত হয়েছে তার সংখ্যা প্রচলিত যুদ্ধে মনুষ্য নিধনের সংখ্যার এক নগন্য অংশমাত্র। কিন্তু গণমাধ্যমের প্রচারে বর্তমান সময়ের সন্ত্রাসী ঘটনাগুলির অভিঘাত আধুনিক মানুষকে যেভাবে বিপন্ন করেছে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

ইসলামের অন্যতম তত্ত্ব জিহাদ বাংলায় নিত্য ব্যবহৃত 'জেদ' ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে নানা ব্যাখ্যায় আজ বিতর্কিত প্রসঙ্গ। হজরত মহম্মদের কাছে জিহাদ—যা আত্মিক সংগ্রাম এক সরল পথের অভিযান। পৌত্তলিক আরবজাতির চিত্তের মুক্তির জন্য একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জেদ। দুই সুপ্রতিষ্ঠিত—খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মের অনুগামীদের প্রতিবেশী হয়ে আরবদের পৌত্তলিক মনে হীনমন্যতার অসন্তোষকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। বদর, উহুদ ও পরিখার (Battle of Trench) যুদ্ধ ও হুদাইবিয়ার সন্ধি—এই সব কন্টকাকীর্ণ পথ ব্যক্তিগত নেতৃত্বে, জীবনের ঝুঁকির বিনিময়ে অতিক্রম করে অবশেষে মক্কা বিজয়ে মহম্মদ জিহাদের পূর্ণতা দিয়েছিলেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা হজরত আলিকে দুর্বলচিত্ততার অভিযোগে তাঁর অতিভক্ত সমর্থকরা হত্যা করার পর জিহাদ নিয়ে ইসলামে বিতর্কের শুরু হয়। আলি যেন শেক্সপীয়রের হ্যামলেট—ঘরের শত্রুদের চিনেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারেন না। সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম এমন 'অযোগ্য' খলিফা 'না থাকাই ভালো।' অতিভক্ত 'খারিজী' সম্প্রদায় হজরত আলির হত্যাকে ইসলাম রক্ষার জন্য জিহাদ ঘোষণা করে ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের (কলেমা, শাহাদ্য নামাজ, রোজা ও হজ্জ) সঙ্গে জিহাদকেও যুক্ত করে। পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মার (বিশ্বভ্রাতৃত্ব) সর্বাধিপতি খলিফারা এ ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। তাতে জিহাদের গুরুত্ব অবশ্য কমে যায়নি। তুরস্কের দোর্দন্ডপ্রতাপ অটোমান শাসকরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সাফল্যকে জিহাদের অনুপ্রেরণা মনে করতেন। তবে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে জিহাদের জাগরণ ঘটে বিশ শতকের প্রথম অর্ধে—উপমহাদেশের জামাত ইসলামি

নেতা মৌলানা মওদুদীর Pan Islam বা ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ আন্দোলনে নেতৃত্বেরই মাধ্যমে জিহাদকে অবলম্বন করে ইসলাম প্রত্যাবর্তন ছিল তার বাণী। অবশ্যই শুদ্ধি আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন উনিশ শতকের শিয়া তাত্ত্বিক জামালউদ্দিন আফগানী। এই পুনরুজ্জীবনবাদী ইসলামের অনুপ্রবেশ হয়েছে আঠারো শতকে—পশ্চিমী শক্তির উত্থানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। ব্যবসায় বড়ো পুঁজির বিনিয়োগ, উন্নত প্রযুক্তির চাষ আবাদ, বিজ্ঞান অনুপ্রাণিত সমাজ চেতনা, গণতন্ত্রের প্রসার ও স্বাভাবিক বিবর্তনে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের শক্তিতে পশ্চিম ইসলামকে অনেক পিছনে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে ঐ শতকেই ইউরোপের দেশগুলি হারিয়ে বিজিত অটোমান সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে গেছে। বাকি দুই বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য—ভারতের মুঘল ও ইরানের সাফাবিদও তখন পতনের মুখে। আঠারো শতকে তিন সাম্রাজ্য পতনের তীব্র অভিঘাতে ইসলামি বিশ্বের অস্তিত্ব সংকটকে বৃদ্ধি করেছিল। মধ্যযুগ থেকে দুই কৃষিনির্ভর—পশ্চিমী ও ইসলামি সভ্যতার শক্তির ভারসাম্য শিল্প বিপ্লবের কারণে ছেদ হয়ে গেল ঐ শতকে। উত্থিত হল অজেয় পশ্চিম—আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন স্তরে। পশ্চিমের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সমান্তরালে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতা অর্জনে যে ইচ্ছা শক্তি সামাজিক অনুপ্রেরণার তাগিদ ছিল, মুসলিম উম্মা অনুমোদিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় তার সায় ছিল না। তাঁর Spirit of Islam এ আমির আলি দুঃখ করে বলেছিলেন "But for Imam Gazzali and Isna Asharia, Islam would have been a nation of Keplar and Newton।" যাই হোক, ১৭৫০-২০০০ এই আড়াইশো বছর পশ্চিমী সভ্যতার অপ্রতিহত বিস্তৃতি ও প্রভুত্ব ইসলামি বিশ্বকে দগ্ধ করেছে বেশী। ব্রিটিশদের কাছে ভারতবর্ষে মুঘলশাহীর পতন, ফ্রান্সের কাছে আলজিরিয়ার। প্রথম মহাযুদ্ধে পর্যুদস্ত অটোমান শক্তির অধীন আরবদেশগুলিকে—সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরাক ও লেবানন—ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড কেক ভাগ করার মত নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নেয়। মাত্র দেড়শ বছরে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলির নাটকীয় পতনের তীব্র সম্পাতে হতচকিত মুসলিম বিশ্ব আত্মরক্ষার অবলম্বন খোঁজে। ঔপনিবেশিক দাসত্বের লাঞ্ছনা ও আঘাতের কারণে মুসলিম সমাজে অন্যতর জিহাদের তত্ত্বতালাশ চলতে থাকে—সেটা আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির। সাময়িক পরাজয় সহনীয়, কিন্তু পরাভবের গ্লানি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ ধর্মরক্ষার জন্য জিহাদে বিশ্বাস ব্যর্থ হতে পারে না—এই আস্থা বোধে সমর্পণ চায়। ইসলামের উন্মেষ পর্বে তার বিজয়াভিযানের উজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণ করা হল। আবির্ভাবের দুশো বছরের মধ্যে ইসলাম কি বিশ্বের এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিল না? নিশ্চিতভাবে রাজশক্তির অপকীর্তি, রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতা, মুসলিম উম্মার সামাজিক চ্যুতি ও ব্যক্তিগত ধর্মপালনে স্খলন তার সার্বিক পতনকে তরান্বিত করেছে। শিয়া তাত্ত্বিক জামালউদ্দিন আফগানী প্রথম আশংকা করেছিলেন ইউরোপীয় শক্তির প্রাবল্য, তার অভিঘাত ইসলামের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করবে। তিনি ইসলামের সূত্রগুলির সঙ্গে আপস না করে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে মেনে নিতে চেয়েছিলেন।

আফগানী যদি মুসলিম প্রতিবোধের প্রবক্তা হন, মওলানা মওদুদী জিহাদকে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রচার করে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ডাক দেন। মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশী দেশ ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেনের প্রভুত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে জিহাদ হবে হাতিয়ার, মৌলবাদী ইসলাম হবে সংগ্রামের আধার। ষাটের দশকে মওদুদীর মৌলবাদ তত্ত্বকে অন্য এক সংস্করণে জনপ্রিয় করেছিলেন মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের সুন্নি নেতা সৈয়দ কুতুব। তাঁর হাতে ইসলামী আন্দোলন উত্তর আধুনিক ব্যাখ্যা পায়। উচ্চশিক্ষিত সৈয়দ কুতুব আমেরিকার সচ্ছল প্রবাস জীবন ছেড়ে মিশরে ফিরে এসে প্রচার করেন আধুনিক ভোগবিলাস সর্বস্ব ধর্মহীন জীবন প্রাক ইসলামী জাহিলিয়াত বা অনাচারী সমাজের সঙ্গে তুলনীয়। কুতুবের মৌলবাদী সংবিধানে মুসলিমদের সমাজসেবা ও তৃণমূল স্তরে ধর্মরক্ষার আহ্বান ছিল। সমাজে ছাত্র ও কারখানার কর্মীদের কল্যাণকামী সংগঠনে অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যায়তনে 'সালাত' বা প্রার্থনার ব্যবস্থা, নতুন মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ, ইসলামী পরিধানের লোকপ্রিয়করণ—এই সব ক্ষুদ্র প্রয়াসে ইসলাম সুরক্ষিত থাকবে—এই ছিল সৈয়দ কুতুবের বিশ্বাস। নিজের গৃহ, পাড়ার পার্ক, বাড়ির প্রাঙ্গন যেন হবে নিরাপদ। মুসলিম প্রত্যাবর্তনের এই মধুর আবেগ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম সমাজে তরুণ প্রজন্মের একাংশের মনে প্রভাব ফেলেছে।

সুন্নি ইসলামের চরম মতবাদের ওহাবি আন্দোলন—বর্তমানে যা সালাফি তত্ত্বে রূপান্তরিত—সৈয়দ কুতুব এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। সালাফি মতবাদ আরবের রাজা মাউদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আঠারো উনিশ শতকে সুন্নি গরিষ্ঠ দেশগুলিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ওহাবি ও সালাফি মতবাদ প্রায়ই এক। সব ওহাবিই সালাফি তবে সব সালাফিই ওহাবি নয়। কারণ আব্দুল ওহাব সৌদি আরবের এক ধর্ম সংস্কারকের নাম, আর ইসলামে কোন সংস্কার আন্দোলনে ব্যক্তির বিশেষ অবদান থাকলেও তার নামের অনুমোদন নেই। তখন অংশীদারিত্বের অপরাধ বর্তাবে সমর্থকের উপর। তাই একজন মুসলিম নিজেকে ওহাবী বলতে পারেন না। সালাফি বলতে হবে। সালাফি অতি রক্ষণশীল সুন্নি সম্প্রদায়ের মতবাদ, যার নিরিখে শিয়া, সুফি বা ইসলামের অন্য শাখা ইসলাম ধর্ম বিরোধী। সালাফিরা হজরত মহম্মদ আর চার খলিফা-হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলিকে ইসলামের আদর্শ শিক্ষক হিসাবে দেখেন। পরিহাসের বিষয় অতি রক্ষণশীল সালাফি গরিষ্ঠ ধনী আরব দেশগুলি উদার পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশ বিশেষত আমেরিকার নিকট মিত্র। এদের বিপুল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আরব দেশগুলিতে পশ্চিমী বহুজাতিক সংস্থা তাদের বিপণনের বাজার বিছিয়ে রেখেছে—বিনোদন ও ভোগের যাবতীয় উপকরণের বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি করেছে। দুবাই, আবুধাবি, দোহা ও রিয়াদ আজ

পৃথিবীর বৈভব-রাজধানী। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানী ইবনে সিনা প্রমুখের বিত্তশালী আরব বিশ্বে NASA র কোন শাখা নেই। পশ্চিমী ও ইসলামী বিত্তের গুণাত্মক পার্থক্য এইখানে।

উনিশ শতকের সালাফি মতবাদের পাঁচশো বছর আগে সুফি চিন্তাধারা ও দর্শন দক্ষিণ এশিয়ায়, ইসলামের প্রচারে বিশেষ অবদান রেখে গেছে। এই উপমহাদেশে ভক্তিবাদের সিক্ত মৃত্তিকায় সুফি ভাবনার প্রেম ঈশ্বরচেতনা এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারায় মিশে গেছে—শিল্প, সাহিত্য ও মার্গসঙ্গীতে রেখে গেছে অক্ষয় অমলিন প্রভাব। ভারতের মুঘল শাসন, বিজিতের সংস্কৃতির মধ্যে নানা রঙে মিলিত হয়ে বৈচিত্র্যের শক্তিতে বিস্তৃত ও নতুন প্রাণে বিকশিত হয়েছিল। ইসলামের সামাজিক ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যাবে আজও ইসলাম ধর্মের অসংখ্য শাখা প্রশাখা (sects) ও উপগোষ্ঠী জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক রীতি ও আচারে নানা বৈচিত্র্য ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে।

ইসলাম রোমান ক্যাথলিকবাদের মত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়। ইসলামে আল্লাহ এবং উপাসকের মধ্যে কোনো মাধ্যমের অস্তিত্ব নেই—ক্যাথলিকবাদে পোপ যে ভাবে মাধ্যম হয়ে আছেন। তার ছাড়পত্র বিনা খ্রীস্টলাভ সম্ভব নয়। মৌলভীরা যাই বলুন না কেন, ইসলামে খোদা ও বান্দার যোগ সরাসরি সেটা তাঁদের মানতে হয়। কোরাণে শুভ ও কর্মের নির্দেশ ও অশুভ চেতাবনিতে ভক্তের বিচারশক্তির স্বাধীনতা আছে। শুভবোধে জাগ্রত হয়ে সেটা প্রয়োগ করার দায়িত্বভার নিজের। তবে এক বৃহৎ অংশের মুসলিম বিশ্বাস করেন পবিত্র তীর্থস্থান মদিনা ও মক্কায় হজ্জ্ব যাত্রা এক ঐশ্বরিক বিধান। যেহেতু দুই তীর্থভূমির অবস্থান সৌদি আরবে। তারা এক শতাংশ ধনী আরব সালাফিদের প্রভাব, প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করতে পারেনা। আরববাসীরা পবিত্র মক্কা ও মদিনার অভিভাবক এবং ঐ দুটি স্থান তারা ইসলামের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করে। একজন মুসলিমের কাছে হজ্জ্ব যাত্রা আত্মশুদ্ধির পরীক্ষা। তাই ইসলামের কেন্দ্রীয় আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা তাকে পাথেয় মেনে চলতে হয়। সমস্যাদীর্ণ দরিদ্র মুসলিম সমাজে কোরাণের নির্দেশনামা, পাপবোধ ও মৃত্যুর বাস্তবে পাঁচ ওয়াক্ত স্মরণ করতে হয়।

পশ্চিমী সভ্যতা আজ সম্পূর্ণ উন্মোচিত। তার প্রগতির বিকাশ চরাচরে দৃশ্যমান। তবু সন্দেহ দানা বেঁধেছে পশ্চিমের উদার শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ধরেছে রক্ষণশীলতার ঘূণ। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামও রূপান্তরবাদী (gradulistic)। শতাব্দীর অবগুণ্ঠনে, বোরখা, হিজাব ও বিভিন্ন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞায় আবৃত অনেক মুসলিম সমাজে মুক্ত জগতের বাতাস স্পর্শ করেছে। বিশেষত পশ্চিমের দেশগুলিতে ইসলাম আজ মূল ধারায় মিশে গেছে। প্রকৃতির অনিবার্য বিধানে ইব্রাহিমের আরব সন্তান আজ বিশ্বায়িত্ব নাগরিক।

বদলে যাওয়া কাজের ভুবন

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

পৃথিবী বদলাচ্ছে। একটা খুব বড় পরিবর্তন হল কাজের চরিত্র বদলে যাওয়া। বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই) এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির অভিনব অভিষেকে অকল্পনীয় ভাবে বদলে যাচ্ছে অর্থনীতির আঙ্গিক ও কাজের ধরন। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সুইডেনের প্রসিদ্ধ গৃহস্থালি বস্তুসম্ভার নির্মাণ সংস্থা আইকিয়া-র ইউরোপে প্রসার পেতে ৩০ বছর সময় লেগেছিল, সাত দশক পর আজ তার বার্ষিক বিক্রি ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; অথচ চিনা ই-বাণিজ্য সংস্থা আলিবাবা-র ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র দু'বছরেই ১০ লক্ষে পৌঁছেছে, ১৫ বছরে তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৭০০ বিলিয়ন ডলার। এক সুসংবদ্ধ ইন্টারনেট-ভিত্তিক ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণেই এই অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি। গতবছর প্রকাশিত বিশ্বব্যাঙ্কের 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৯'-এর মুখ্য বিষয় এটাই, 'দ্য চেঞ্জিং নেচার অব ওয়ার্ক'।

উন্নত দেশে উৎপাদন শিল্পে কর্মরত মানুষের সংখ্যা কমছে। যেমন পর্তুগাল, স্পেন ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশে ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে প্রায় ১০ শতাংশ কর্মসঙ্কোচন হয়েছে। কাজের ভরকেন্দ্র সরে গিয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের দিকে। নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে শ্রম-নিবিড় শিল্প বেশি, সেখানে শ্রমের বাজারের একটা ভাগ এখনও উৎপাদন শিল্পে টিকে আছে, কিন্তু সেখানেও বৃদ্ধিটা হচ্ছে প্রধানত সেই পরিষেবা ক্ষেত্রেই। আন্তর্জাতিক কাজের বাজারে ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতার চাহিদা তৈরি হয়েছে, যা কম মজুরিতে নিম্ন আয়ের দেশগুলি থেকেই মিলতে পারে। যেমন, একটি আমেরিকান কোম্পানি তাদের বিনামূল্যের অনলাইন টুলস্-এর সহায়তায় আফ্রিকায় ২০,০০০ সফটওয়ার প্রোগ্রামার তৈরি করেছে, যারা তাদের বা তাদের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। ২০১৪ সালের মধ্যে এই কোম্পানি আফ্রিকায় এমন ১ লক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির উদ্যোগ করেছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন শিল্পে দ্রুত কাজ হারাচ্ছেন শ্রমিকেরা। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে-র তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের মত দেশেও ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ সালের মধ্যে উৎপাদন শিল্পে চাকরি বেড়েছিল ৫.৩৯ কোটি থেকে ৫.৯ কোটি, গত ছ'বছরে তা নেমেছে ৫.৬৪ কোটিতে—বছরে গড়ে ৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। পাশাপাশি, যে হেতু অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভিঘাতে সংগঠিত কাজের জায়গাগুলি ভরাট করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অব থিংস, যন্ত্র মনুষ্য-শ্রমকে প্রতিস্থাপন করছে। মজুরির খরচ প্রায় শূন্যে নেমে আসছে, মুনাফার হার পাচ্ছে অতি-উর্ধ্বগতি।

এর ফলে, ভবিষ্যতে এক দিকে তৈরি হতে চলেছে অতি

উচ্চ ধনীদের এক শ্রেণি, অপর দিকে তাদের কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য ২৪x৭ কর্মরত মজুরিবিহীন যন্ত্রদল। উৎপাদন চত্বরের বাইরে চলে যাচ্ছেন সমাজের প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ মানুষ। এঁদের এখন উপায় কী? ওই ২০ কি ৩০ শতাংশ যে অতি ধনী শ্রেণি, তাঁদের বিলাসবহুল জীবন ঘিরে তৈরি হচ্ছে এক ব্যক্তিগত সেবার জগৎ, যাকে কেউ কেউ বলছেন 'সার্ভেন্ট ইকনমি'। গত এক বছরে আমেরিকায় এই ভৃত্য অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ৬.১ শতাংশ, যা অন্য সব ক্ষেত্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ম্যানিকিয়োর, পেডিকিয়োর, কুকুর-হাঁটানো, বৃদ্ধদের দেখাশোনা, শিশুদের যত্ন, ম্যাসাজ, সৌন্দর্য পরিচর্যা, ত্বক পরিচর্যা, ড্রাইভিং—এমন অসংখ্য সেবা বা পরিষেবাই হল এখন নতুন কাজের জগৎ। এখানে সামাজিক সুরক্ষা নেই, গড় বেতন অতি সামান্য, চাকরিরও নিশ্চয়তা নেই।

কাজের দুনিয়ার কাঠামো বদলের একটা বড় দিক হল 'গিগ ইকনমি'-র বিস্তার। গিগ ইকনমি হল চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কাজের দুনিয়া, যেমন বিভিন্ন অ্যাপের সাহায্যে কেনা খাবার খরিদ্দারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কাজ। এই গিগ অর্থনীতির বিকাশে বিশ্ব জুড়ে দ্রুত 'স্বাধীন' কর্মী-বাহিনীর বিস্তার ঘটছে। পাশাপাশি, প্রায় সব দেশেই প্রসারিত হচ্ছে 'প্ল্যাটফর্ম ফার্ম'—অ্যাপ-ভিত্তিক ব্যবসাবাণিজ্যের সংস্থা। যেমন একটি চিনা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সংস্থা সে দেশের ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমেরিকার ৬০ হাজার শিক্ষকের অনলাইন যোগাযোগের মাধ্যমে ইংরেজি শেখার আয়োজন করেছে।

শিক্ষার জগতেও এই পরিবর্তনের বড় প্রভাব পড়ছে। ২০১৮ সালে যে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হবে তারা বড় হয়ে এমন পেশা ও কাজে প্রবেশ করবে যেগুলোর এখন অস্তিত্বই নেই। ফলে, কলেজে ভর্তি হয়ে প্রযুক্তির পাঠ নিয়ে চার-পাঁচ বছর পর এক জন ছাত্র যখন পাশ করে বেরোবে তখন হয়তো তার শেখা প্রযুক্তি আমূল বদলে গিয়েছে। তাই বিশ্ব ব্যাঙ্ক জোর দিয়েছে মানব পুঁজি গঠনের ওপর, কিন্তু তার কোনও নির্দিষ্ট আঙ্গিককে তারা সূত্রায়িত করেনি, শুধু প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে সরকারকে খেয়াল রাখতে বলেছে। প্রযুক্তির অলৌকিক পরিবর্তনের অভিঘাতে মানব পুঁজির প্রয়োজন কী ভাবে বদলাবে, সেটা অজানা, কিন্তু এটুকু তারা বুঝেছে গোড়ায় যথেষ্ট জল ঢালা ও পরিচর্যা করা ভবিষ্যতের কান্ডারিদের জন্য অতীব জরুরি।

[কৃতজ্ঞতা : আনন্দবাজার পত্রিকা]

নতুন রাজনীতি, কাজের রাজনীতি

অরণি সেন

বেশ কয়েক বছর ধরে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় দিল্লির 'আম আদমি পার্টি' (এ.এ.পি.)-র সরকারের বাজেটের ২৩% ও ১৩% যথাক্রমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় এবং সংস্কারের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার এবং প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভোল পাল্টে দেওয়ার কথা শুনে কৌতূহল হয়েছিল। এরপর ২০১৮তে এ.এ.পি.-র থেকে প্রস্তাব আসে তাদের দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিদর্শন করার। সরকারি আতিথেয়তা না নিয়ে, আগে থেকে না জানিয়ে শ্রী সোমেন চক্রবর্তীর সহায়তায় দিল্লির বেশ কিছু সরকারি স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র র‍্যানডম পরিদর্শন করি। পাহাড়গঞ্জ প্রভৃতি পুরনো দিল্লির ঘিঞ্জি দরিদ্র শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলি বেছে নেই। কোথাও ঢুকতে পারি, কোথাও পারি না। কোথাও নিস্পৃহ ব্যবহার পাই, কোথাও ফোটো না তোলা ও রেকর্ড না করার শর্তে আন্তরিকতার সাথে সবকিছু দেখানো হয়। কোন মডেল সরকারি স্কুল এবং উন্নত সরকারি হাসপাতালে যাই নি।

ঝকঝকে মহল্লা ক্লিনিক ও ভিড়ে গমগম স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। হাতের নাগালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। নিঃখরচায় চিকিৎসা, সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা, ওষুধ এমনকি অ্যাম্বুলেন্সে করে রেফারের ব্যবস্থা। উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা স্কুলগুলি। গেটে নিরাপত্তা কর্মী, স্কুল চত্বর জুড়ে সি. সি. ক্যামেরা। স্কুলের দেওয়াল, ঘর, পাঁচিল সব রঙচঙে। স্কুল চত্বর পরিচ্ছন্ন, সুদৃশ বাগান ও খেলার মাঠ। স্কুল কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম। নামী বেসরকারি স্কুলগুলির সাথে পাল্লা দেওয়া নার্সারির খেলনাঘর থেকে উঁচু ক্লাসের ল্যাবেরটরি। চোখের সামনে বাম ও তৃণমূল আমলে সরকারি স্কুলগুলি ধ্বংস ও বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখতে অভ্যস্ত অবাকই হয়েছিলাম। উৎফুল্ল হয়েছিলাম নিজের চোখে দেখে যে প্রকৃত সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকলে যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করা যায় এবং এই পরিকাঠামোর মধ্যেও এতটা উন্নতি করা সম্ভব।

এরপর অরবিন্দ কেজরিয়ালরা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার সাথে লড়াই চালিয়ে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়ে দিল্লিবাসীর বিদ্যুতের বিল এক ধাক্কায় কমিয়ে দিলেন। একটা মাত্রা অবধি নিঃখরচায় বিদ্যুতের যোগান দিলেন। এরপর যোগান দিলেন পর্যাপ্ত জল। রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করলেন। করলেন পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ। আইনশৃঙ্খলা বিশেষত মহিলাদের নিরাপত্তার উপর জোর দিলেন। ওলা, উবার পরিষেবায় ভাড়া সার্জে নিয়ন্ত্রণ আনলেন।

দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ঝুপড়ির বাসিন্দাদের পাট্টা দিলেন, নতুন আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু হল। বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ব্যবস্থা করলেন। প্রথম থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধ জারি রাখলেন সংগ্রাম। নির্বাচনমুখী মহিলাদের বিনামূল্যে বাসযাত্রা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তীর্থযাত্রা ইত্যাদিকে ধরছিই না। দিল্লির প্রধান দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিজেপি যখন

উগ্রজাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা, মুসলিম বিরোধী ঘৃণার রাজনীতি ও ব্যক্তিগত কুৎসা ছড়াতে ব্যস্ত এবং কংগ্রেস যখন দিশাহীন, নিষ্ক্রিয় ও বারংবার ব্যর্থ রাহুল গান্ধী ক্ষমতার কেন্দ্র ছাড়বেন বলেও ছাড়ছেন না তখন কেজরিয়াল-শিশৌদিয়ারা নীরবে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেলেন। এক সাথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি বিশেষত বিজেপি জমানায় তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা এবং নির্বাচনগুরু প্রশান্ত কিশোরের ভোটকৌশল যুক্ত হয়ে দিল্লি বিধানসভায় তৃতীয়বার বিপুল ভোটে (৭০ টির মধ্যে ৬২ টি আসন এবং প্রাপ্ত ভোটের ৫৩.৫৮%) জয়ী হলেন।

মহল্লা ক্লিনিক

দিল্লির মত জায়গায় প্রথম দিকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ও পরে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির অবরোধের মধ্যে পরপর তিনবার জয় যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে। আর এগুলি কোনটিই সহজসাধ্য ছিল না। তীব্র লড়াইয়ে তারা অনেকবারই খাদের কিনায় চলে গেছিলেন, আবার ফিরেও আসেন। দল বারবার ভেঙেছে। নেতৃত্বের মধ্যে চলেছে তীব্র ব্যক্তি সংঘাত। কেজরিয়ালের উপর বারবার শারীরিক, আইনি, রাজনৈতিক আঘাত নেমে এসেছে। অসুস্থতা পিছু ছাড়েনি। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি আম আদমির সাথে থেকে তাদের উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। তথাকথিত প্রগতিশীল, বাম, বিপ্লবী ও বুদ্ধিজীবীদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও সমালোচনার মধ্যেও অটল ছিলেন। কিছু কিছু রাজ্যে জনপ্রিয়তাবাদী মুখ্যমন্ত্রীরা যখন বিভিন্ন Conditional Cash Transfer-র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি অর্থের অনেকটাই অপচয় করে ভোটে জেতার চেষ্টা করেছেন, তারা তখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটনানোর চেষ্টা করে গেছেন। অন্য রাজ্যে এখনবধি সফল না হলেও উচ্চ শিক্ষিত নেতৃত্ব এবং মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষের গণভিত্তি সম্পন্ন দলটি এখন দিল্লি এন.সি.আরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

তাই বলে কেজরিয়াল কোন মেসিয়াও নন, নন কোন বিপ্লবী নায়ক আর সেটা তিনি মোদি বা মমতার মত ঘুরপথে বা সরাসরি, অন্যদের দিয়ে বা উচ্চকিতভাবে বলেও থাকেন না। এই সমাজ ব্যবস্থার একজন হিসাবে তারও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিপদে সমঝোতাও করতে হয়েছে। দলটিও ঢিলেঢালা ব্যক্তিবর্গের সমাহার। এন.আর.সি. বিরোধী আন্দোলন নিয়ে নীরবতা, নরম হিন্দুত্ববাদ, পরবর্তিতে দিল্লি দাঙ্গায় নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে কেজরিয়াল ও তাঁকে কেন্দ্র করে 'আম আদমি পার্টি'র ভূমিকাও সমালোচিত। তথাপি তার বিশেষ কৃতিত্ব ভারতীয় রাজনীতির তিনটি চর্চিত কার্যকারিতাহীন ধারাকে ভাল রকম ধাক্কা দেওয়া। বিজেপির সরাসরি নব উদারতাবাদী অর্থনীতি ও বিদ্বেষের রাজনীতি, কংগ্রেস-তৃণমূলের ঘুরপথে নব উদারতাবাদী অর্থনীতি ও সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং তথাকথিত প্রগতিশীল, বাম, বিপ্লবী ও বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয়, উদ্যোগহীন নিস্ফলা তাত্ত্বিক কচকচির রাজনীতির বিপরীতে তিনি আম আদমির উন্নয়নের রাজনীতিকে একটি পর্যায় অবধি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার ভবিষ্যত বলবে এই নতুন কাজের রাজনীতি বর্তমান ভারতে বন্ধ্যা পশ্চাদমুখী রাজনীতির বিপরীতে সত্যিসত্যিই কোন দিশা দেখাতে পারে কিনা। মহাশক্তিধর বৃহৎপুঁজির সাথে কতটা লড়াই ও দরকষাকষি করে নিজেদের চরিত্র অটুট রেখে জনমুখী কাজ করতে পারে।

এক প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি থেকে

বাবুয়া চৌধুরি

অনেক মানুষই অনেকরকম বিচিত্র আতঙ্কে ভোগেন, সেই সব আতঙ্কের গালভরা নামও আছে চিকিৎসাশাস্ত্রে, চিকিৎসাও আছে। কিন্তু আমার আতঙ্কের কোনও বিজ্ঞানসম্মত নাম খুঁজে পাইনি। প্রত্যেকবারই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে আমি এই ভোটাতঙ্কে ভুগতে শুরু করি। গুরুপাক না খেলেও রাত্রে ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন আসতে থাকে। সেই স্বপ্নে কখনও ইভিএমের সাথে ভোটার রেজিস্টার মেলে না আবার কখনও বা ব্যালট পেপার পকেটে রয়ে যায়—শেষ পর্যন্ত মার খেতে খেতে ঘুম ভাঙে শরীর ঘর্মাক্ত ও গলা শুকনো অবস্থায়। এভাবেই হঠাৎ করে ভোটের আগের দিনটা খুব দ্রুত চলে আসে। ভোটদান বিষয়টা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আর আমার অবশিষ্ট নেই। সেই পাট অনেক কাল আগে চুকে বুকে গিয়েছে। যেবার প্রথম ভোটাধিকার পেলাম সেবারই ভুল নাম এবং গয়টার রোগীর মত স্ফীতচক্ষু ফটোসহ ভোটার কার্ড নিয়ে গিয়েছিলাম ইভিএমটা দেখতে। বলা ভালো একইসঙ্গে দুটো বোতাম যদি চিপে ধরা যায় তাহলে দুটো জায়গাতেই আলো জ্বলে কিনা সেটা পরীক্ষা করতে। ইতিমধ্যে বাবার একটি বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটরের উপর সফলভাবে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। দুটো বোতাম চাপার সময়টি একদম একই

হয় তাহলে পর্দায় কোনও নম্বরই ওঠে না। একইভাবে ইভিএমের দুটো বোতাম চিপে দিলাম। প্র্যাকটিস নেই বলে একটা জায়গাতেই আলো জ্বলে উঠে পিপ্‌ করে একটা শব্দ হল। ওই শেষবার ভোটার হিসেবে বোতাম টিপেছিলাম। পরে যতবারই ইভিএম পেয়েছি প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবেই পেয়েছি। পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু সফলতা আসেনি। তবে সেই প্রথমবার ভোট দেওয়ার কৌতূহল আজকে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। বয়েস বাড়ার সাথে সাথে আতঙ্ক বেড়েছে। শহরে থাকলে ভোটের আঁচ ততটা গায়ে লাগে না। একটা খুশি খুশি ব্যাপার থাকে। কে কোন পার্টি করছে তাই নিয়ে সাধারণ লোকের খুব একটা মাথাব্যথা থাকে না। গ্রামের ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। প্রত্যেককে কোনও না কোনও পার্টি করতেই হবে।

রাজনৈতিক হিংসা

২০১৮ সালের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের তোড়জোড় শুরু হতে হতেই দুটো ঘটনা দেখলাম। বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্যে এস. ডি. ও অফিসে লাইন দিতে লাগল আবার একইসঙ্গে বেশ কিছু লোক ভোটকর্মীর তালিকা থেকে নিজের নাম কাটানোর জন্যে নানা জায়গায় লাইন করতে লাগলেন। কেউ কেউ সফল হলেও বেশীরভাগই ব্যর্থ হলেন। যাঁরা আশ্বাসবাণী পেয়ে নিজেদের সাফল্য উপভোগ করছিলেন শেষমেশ তাঁদেরও ডিউটির চিঠি এসে গেল, এই বিষয়টি বাকিদের বেশ উপভোগ করতে দেখলাম।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন থেকে শুরু হল হিংসা। বিরোধী কাউকে মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হবে না—এই ধরনের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাস্তবে সব জায়গাতেই। আর উন্নয়ন তো শুধু করলেই হবে না, তাকে রাস্তায় এনে দাঁড় করাতেও হবে। না হলে তো আবার উন্নয়নের বিরোধী গজিয়ে যাবে। বিরোধীরা অভিযোগ জানাচ্ছিলেন যে তাঁদের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছেন না, তাঁদের মনোনয়ন পত্র সুষ্ঠুভাবে জমা দিতে নির্বাচন কমিশন সাহায্য করুক। আবার সরকারপক্ষের বক্তব্য ছিল যে এত উন্নয়ন হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের কোনও সমর্থকই নেই, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রার্থী না পেয়ে তাঁরা অগণতান্ত্রিক বক্তব্য রাখছেন। তাঁরা বিরোধীদের সবরকমভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রার্থী দিয়ে তো সাহায্য করতে পারবেন না।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন ১২ জন মানুষের প্রাণ গেল (সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী)। রাস্তার উপরে মহিলাদের কাপড় খুলে নেওয়া হল। আহত হলেন বহু মানুষ, এমনকি সাংবাদিকরাও। প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন দুজনেই তখন উদাসীন থাকার ভূমিকায় নিজেদের টেক্কা দিচ্ছেন প্রত্যেকদিন। ১০ই এপ্রিল রাতে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় একদিন বৃদ্ধি করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। আবার ১১ই এপ্রিল সকালে সেই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালেন যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় আর বাড়ানো যাবে না। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং ভোটের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধীরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন। আদালত ভোট প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ জারী করলেন। আবার নতুন করে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হল ১৪ই মে। ৫ দফা নির্বাচনে যে পরিমাণ নিরাপত্তারক্ষী অপ্রতুল বলে মনে হচ্ছিল এবারে এক দফা নির্বাচনে সেই সংখ্যাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে ঘোষিত হল। ফলে আবার মামলা এবং আবার স্থগিতাদেশ। বিরোধীরা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টে একই মামলা করার ফলে তাদের জরিমানা করা হল। কিন্তু ভোটের প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ উঠল না। শুনানি হয়ে চলল। সবারই একটা ধারণা হয়ে গিয়াছিল যে ১৪ই মে ভোট হচ্ছে না, কারণ আদালত যখন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, তখন নিশ্চয়ই সবদিক বিচার করেই একটা সুষ্ঠু ভোটের উপায় পাওয়া যাবে। আর ভোট ১৪ই মে না হলে রমজান মাসের পর পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী দিয়েই হবে। ভোটের ট্রেনিং চলছিল। সেখানেও আধিকারিকেরা জানেন না ভোট কবে। কয়েকদিন পরেই আদালতের রায় বেরোল। রায়ে বলা হল ''কমিশনের কাজে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না''। দ্বিতীয়ত, ''নির্বাচন কমিশন যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তাতে আদালতের কিছু বলার নেই'', তৃতীয়ত ''ভোট প্রক্রিয়ায় হিংসার কারণে কেউ মারা গেলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের বেতন থেকে সেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বেতন পর্যাপ্ত না হলে সম্পত্তি বিক্রি করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'' কিন্তু ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হবে সেই বিষয়ে কোনও আলোকপাত করা হয়নি এবং সর্বশেষে ''কমিশন যদি চায়, পূর্বঘোষিত তারিখেই ভোট হতে পারে।'' কমিশনের কাজে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না এই মূল বিষয়টি নির্ধারণ করতে প্রায় মাসখানের লেগে গেল। আবার এখানেও একটা ফ্যাকরা লেগে থাকল—সুপ্রীম কোর্টে পঞ্চায়েত ভোটের ই-মনোনয়ন গ্রাহ্য হবে কি হবে না সেটা নিয়ে শুনানি ওই জুলাই, মানে ভোট হয়ে যাবার পর, এটাও আমার ঠিক মাথায় ঢুকলো না।

এসে গেল ১৩ই মে। আমার সাথে চারজন ভোটকর্মী ও দু'জন নিরাপত্তারক্ষী সহ চললাম বুথের দিকে। নিরাপত্তারক্ষী বলতে একজন পুরনো ৩০৩ রাইফেলধারী কনস্টেবল এবং একজন সিভিক ভল্যান্টিয়ার। একটা ৪০৭ টাইপের বাসে চারটে পার্টি। বাসে মোট

সিট ৩০টা। চারটে পার্টির মোট অফিসার ও কর্মী ২০ জন, প্রতি পার্টিতে দুজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ২৮ জন। যাঁরা এই ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা শুধু মানুষ গুনেছিলেন, কিন্তু চারটে পার্টির সাথে ১৬টা ব্যালটবক্স, ভোটকক্ষ বানানোর জন্যে আটটা কার্ডবোর্ড, জিনিসপত্রের জন্যে আটটা ব্যাগও যে যাচ্ছে সেটার হিসেব করে উঠতে পারেননি। ফলত নীচু গাড়িতে ঘাড় নামিয়ে, কার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, ব্যবস্থাকারীদের প্রতি গালাগালি করতে করতে গাড়ি চলল বুথের দিকে। এক রসিক মাস্টারমশাই এই যাত্রাকে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যাওয়ার সাথে তুলনা করছিলেন।

প্রায় ৪০ মিনিট পর অবশেষে গাড়ি সেই বুথে পৌছোলো। গাছে ঘেরা সুন্দর প্রাইমারি স্কুল। গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পাশাপাশি দুটো ঘরে দুটো বুথ। পাশের ঘরের প্রিসাইডিং অফিসার পুলিশ ট্যাগিং এর জটিলতার কারণে নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই চলে এসেছেন। সেন্টার থেকে ওনাকে বলা হয়েছিল পুলিশ বুথে পৌছে যাবে। সেই খবর আবার ওই বুথের দায়িত্বে থাকা সেক্টর অফিসারের কাছে নেই। কাজেই তিনি কিছুতেই মানবেন না এরকম কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি এসে প্রিসাইডিং অফিসারের উপর হম্বিতম্বি শুরু করলেন। দুজনেই বেশ উত্তেজিত। বাকিরা গিয়ে ব্যাপারটাকে তখনকার মত সামলে দিলাম।

ঝামেলা মিটতে কাজে বসলাম। প্রচুর ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। শুধু ফর্ম নয়, তার সাথে খাম সবেতেই স্বাক্ষর করে ডিসটিংগুয়িশিং মার্ক মেরে রাখতে হবে। বারোশোর কাছাকাছি ভোটার, সেই হিসেবে ৩৬০০ সই আর ৭২০টা ডিসটিংগুয়িশিং মার্ক দিতে হবে। ব্যালট পেপারে পুরোটা না হলেও যতটা পারা যায় কাজ সেরে রেখে যখন শুতে গেলাম তখন প্রায় একটা বাজে। বিছানা বলতে মেঝের উপর চাদর পেতে নিয়েছি। মশার জন্যে জামা প্যান্টে রোল অন লাগিয়ে নিলাম, এটা আমার কাছে নতুন জিনিস। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে আমার স্ত্রী কিনে এনেছে। মশা খুব একটা ছিল না কিন্তু অজস্র অন্য পোকা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মধ্যে বেশ কিছু জোনাকি আছে। পোকাগুলো নাকে কানে ঢুকছে, কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। এর মধ্যে কারেন্ট চলে গেল। ঘুমের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল সেটাও চলে গেল। ওই গরমে একটা ঘরের মধ্যে আট জন, তার মধ্যে চার জন প্রবলভাবে নাক ডাকছে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে বিশাল মাঠ আর আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। গ্রামের ভেতরে এখনও দূষণ সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি। একটা সিগারেট ধরাবো ধরাবো ভাবছি এর মধ্যেই একজনের গলার আওয়াজ শুনলাম—"আমার বাড়ির লাইট বন্ধ করসে, আমি ভোটের ঘরে তালা দিব শালা ইত্যাদি ইত্যাদি..."। অন্ধকারে ভালো দেখা না গেলেও বুঝলাম আওয়াজটা কাছকাছি থেকে আমার দিকেই আসছে। আবার ঘরে ঢুকে গেলাম। সেই প্রতিবাদী লোকটি বারান্দায় এসে বসেছেন। মদের নেশায় সাধারণ মানুষের বঞ্চনা নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখছেন। এতক্ষণ গরমেও যাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি এই ভাষণ শুনে তাঁরাও জেগে উঠেছেন। ব্যতিক্রম শুধু সিভিক ভলেন্টিয়ার। তিনি বুথে আসার পর থেকেই যে শয্যা নিয়েছিলেন, শুধু উঠেছিলেন খাওয়ার সময়ে। এইভাবে বসে থেকে থেকে ভোর ৪.৩০ বাজল। ততক্ষণে প্রতিবাদী মানুষটি বিদায় নিয়েছেন। দরজা খুলে বাইরে বেড়িয়ে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রথম ভোট দেবেন তাই লাইনের একেবারে সামনের জায়গাটার দখল নেবেন বলে দাঁড়িয়েছেন।

রাজনৈতিক হিংসা

ধীরে ধীরে ভোটের কাজকর্ম শুরু হল। তিন দলের পোলিং এজেন্ট উপস্থিত। কোনও গোলমাল নেই। পুরুষ ও মহিলা লাইন আলাদা, মহিলা লাইন অনেক বড়। সম্ভবত ভোট দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ করতে যাবেন। এইভাবে দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট চলল। হঠাৎ আমার নজরে এল সিভিক ভল্যান্টিয়ার বুথের আশেপাশে নেই। গেল কোথায়? বুথ থেকে বেড়িয়ে দেখলাম একটু দূরে কিছুটা জঙ্গল মত আছে সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বল—"স্যার আশেপাশের সব বুধ দখল হয়ে গিয়েছে, এখানেও হবে, আমাকে ডাকবেন না"। একজন লাঠিধারী মানুষের পক্ষে কখনই একদল সংঘবদ্ধ অপরাধমনস্ক সশস্ত্র মানুষের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাকে ওখানে ছেড়ে বুথে ফিরলাম। বন্দুকধারী পুলিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"শুনেছেন?" উনি বললেন—"হ্যাঁ", আমি বললাম "আপনি কি করবেন?" উনি বললেন—"আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়"। ঠিক, উনি কিই বা করবেন? এখন আমার প্রধান কাজ বাকি অফিসারদের বিষয়টা জানানো আর যতটা সম্ভব তাদের নিরাপদে রাখা। আমাদের নিরাপত্তার ভার যাঁদের উপর ছিল তারাই যখন পালিয়েছেন, এখন নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরই দায়িত্ব। কিন্তু ঘরভর্তি ভোটার আর পোলিং এজেন্টদের মধ্যে কিভাবে ঘটনাটা জানাবো সেটাও একটা সমস্যার বিষয়। তার মধ্যে সুবিধে করে একজনকে জানালাম যাতে কিছুটা হলেও আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে। দেড়টা পার হয়ে ঘড়ির কাঁটা তখন দুটোর দিকে হঠাৎই স্কুলের মাঠ প্রচুর বাইক আর লোকে ভরে গেল। দেখলাম তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চিৎকার করতে করতে বুথের দিকে আসছেন। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে গেলেন ২৫-৩০ জন। সামনের কয়েকজনের হাতে বন্দুক, ভোজালি, তরোয়াল, একজনের হাতে সুতলি বাঁধা একটা কিছু, মনে হল

বোমা। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন আমার দিকে বন্দুক তাক করে হুমকি দিতে লাগল, আমি বাকি অফিসারদের আমার পেছনে এসে দাঁড়াতে বললাম। ঘরের ভেতরে তখন গণতন্ত্রের উল্লাশ চলছে। যাঁরা ছাপ্পা দিতে এসেছেন তাঁরা উত্তেজনায় কি করবে বুঝে উঠতে পারছেন না। একগোছা করে ব্যালটে ছাপ দিয়ে কাউন্টারফয়েল সহ বাক্সে গোঁজার চেষ্টা করছেন। ব্যালটগুলোতে প্রিসাইডিং অফিসারের সই নেই, ভোট চলার সময়ে ধীরে ধীরে করব ভেবে রেখেছিলাম। অ্যারো ক্রস মার্ক খুঁজে না পেয়ে সামনের টেবিলের উপর ডিসটিংগুয়িশিং মার্কের স্ট্যাম্প ছিল সেটা দিয়েই ভোট দেওয়া চলছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট দেওয়া শেষ করতে হবে—এরকম একটা ব্যাপার। ঘরের ভেতরে তিন জন ভোটার ছিলেন তাঁদের মেরে বের করে দেওয়া হয়েছে। মুখ ঢাকা লোকটা তখনও বন্দুক নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমার মাথায় তখন রিসিভিং সেন্টারের হয়রানির অঙ্ক ঘুরছে। ফর্ম-১৮তে ব্যালট পেপার অ্যাকাউন্টের হিসাব দিতে হবে। বন্দুকধারি কে বললাম আমার সাথে একজনের কথা বলার ব্যবস্থা করে দিতে। পাশের ঘর থেকে টেবিল চেয়ার ভাঙার শব্দ আসছে তখন। একজন নেতা গোছের এগিয়ে এলেন। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এই বুথে ভোটারের তুলনায় ব্যালট পেপার বেশী আছে। যদি সব ব্যালট ছাপ দিয়ে ভরে দেওয়া হয় তাহলে সমস্যা হতে পারে। মদের নেশায় সে কিছু বুঝল বলে মনে হল না। ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যালট বাক্সের সিল ভেঙে গিয়েছে, খোলা বাক্সে গোছা গোছা ব্যালট পেপার ঢোকানো হচ্ছে। এই কর্মতৎপরতা চলল ২-৪৫ মিনিট পর্যন্ত। হঠাৎ করে ঘর খালি হয়ে গেল। না সবাই গেলেন না, চারজন পাহারায় থাকলেন। এর মধ্যে বাড়ি থেকে ফোন করছে, বললাম—''খুব ভালো ভোট হচ্ছে''। স্ত্রী বলল ''টিভিতে তো দেখাচ্ছে ভীষণ খারাপ অবস্থা''। আমি আর কি বলি? টিভি দেখেই টেনশন শুরু করেছে আমার অবস্থা জানলে তো কি করবে কেউ জানে না। ঘরের মেঝেতে ছাপ মারা, ছাপ না মারা, ছেঁড়া, গোটা ব্যালট পেপারে ভরে আছে। ফর্ম ১৮র ব্যালট পেপার অ্যাকাউন্টের হিসেব দেওয়া কার্যত অসম্ভব, একমাত্র ব্যালট বাক্স খুলে গুনে দেখলে পাওয়া যেতে পারে। তবে যাঁরা এসেছেন তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট নিয়েই তাঁর বেশী চিন্তিত। ইতিমধ্যে সেক্টর অফিসারকে ফোন করে যাচ্ছি তিনি ফোন তুলছেন না। পরিস্থিতি আর ততটা ভয়ানক নেই দেখে নিরাপত্তারক্ষী দু'জন ফিরে এসেছেন। সিভিক ভল্যান্টিয়ার ওখানে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন খৈনি পাওয়া যাবে কি না। আমাদের উপর নজরদারি চালানোর জন্যে বসে থাকা একজন প্যাকেট বার করে দিলেন। কিন্তু ওনার 'কালী খৈনি' লাগবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ওনার এই ব্র্যান্ড সচেতনতা আমাকে মুগ্ধ করে দিল। আমিও আর কি করি 'ধূমপান নিষেধ' লেখা জায়গাটার সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে সিগারেট টানতে শুরু করলাম। যে সব বন্ধুরা বিভিন্ন বুথে ভোট নিতে গিয়েছে তারা ফোন করে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করছে আমার কাছে, আবার আমিও ফোন করে করে শুনছি। সব জায়গায় যে একই পরিস্থিতি তা নয়, কিছু জায়গাতে ভদ্রভাবে বুথ দখল হয়েছে, কোথাও লাইনে থাকা ভোটারের আঙ্গুলে কালি লাগিয়ে দিয়ে তাদের চলে যেতে বলা হয়েছে, কোথাও সকাল ৯টার আগেই সব ব্যালটে ছাপ্পা মেরে বাক্স সিল করে দেওয়া হয়েছে—মানে মোদ্দা কথা হল সব জায়গাতেই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, শুধু একটাই সমস্যা হয়েছে যে কোন বৈধ ভোটারকেই নিজের ভোটটা দিতে দেওয়া হয়নি।

ইতিমধ্যে আবার বাড়ি থেকে ফোন, খবরে দেখাচ্ছে রায়গঞ্জে প্রিসাইডিং অফিসারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বললাম যে খবরের চ্যানেলে এরকম দেখায় গল্প বানিয়ে, ওসব না দেখে সিনেমা দেখতে। আর কিই বা বলতে পারি? কিন্তু এবার বুঝলাম আমি যত সহজে বলতে পারলাম, স্ত্রী বিষয়টাকে তত সহজে নিতে পারছে না, কারণ আত্মিয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই খবর দেখছেন আর ওকে ফোন করে আমার খবর নিচ্ছেন।

পায়ে পায়ে পাশের বুথে গিয়ে দেখলাম প্রিসাইডিং অফিসার বেশ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বসে আছেন। মেঝেতে টেবিল উল্টে আছে। বাকি অফিসাররা ঘরে কেউ নেই। ৩ জন পাহারাদার বসে আছে। একজনের হাতে ভোজালি আর সিভিক ভল্যান্টিয়ার তার সাথে গল্প গুজব করছেন।

তখন প্রায় ৪টে বাজে, কাগজপত্র গোটানো শুরু করলাম। ফর্ম-১৮ বাদে যা যা হাতের কাছে পেলাম, খুঁজে পেতে ফিলআপ করে ব্যাগে ভরে দিলাম। সেক্টর অফিসার জানিয়ে দিয়েছেন বিকেল ৫টার আগে তাঁর সাথে যেন যোগাযোগ করা না হয়। এখন আর বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকতে হবে। হঠাৎ আবার ঘরের মধ্যে হইচই। ৬-৭ জন ঘরে ঢুকে এলেন, একজনের হাতে তীর ধনুক। এঁদের মধ্যে একজন জামার তলা থেকে জেলা পরিষদের একগাদা ব্যালট বের করে আমাকে দিলেন, জানালেন, 'এই ব্যালটগুলি তাঁরা ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলেন এখন ফেরত দিতে এসেছেন। তাঁরা কোন নীতিহীন তার কাজ করবেন না, শুধুমাত্র উন্নয়নের বিরোধিতা করে যাঁরা ভোট দিচ্ছিলেন তাঁদের নীতিহীন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তাঁদের ভোট দেওয়া আটকে দিয়েছেন'। খুব নীতিমূলক কথা মানতেই হবে।

বসে বসে সিগারেট খেয়ে খেয়ে ফুসফুস গ্যাস চেম্বারে পরিণত, কিন্তু গাড়ি আর আসে না। সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে, যারা পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁরাও তাড়া দিচ্ছেন, তারা আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, রাতে গ্রামে তল্লাশী চালাতে হবে। অবশেষে গাড়ি এল। আবার বেশ সরগরম হয়ে উঠল জায়গাটা। আমরা গাড়িতে উঠলাম জিনিসপত্র নিয়ে। আমাদের তো একলা ছেড়ে দিতে পারেন না তাই আবারও দুজন পাহারাদার উঠলেন গাড়িতে। সাথে গামছায় বাঁধা বোমা। বাসের সামনে ১০টা, পেছনে ১০টা বাইকে দলীয়কর্মীরা চলছেন, তাঁদের হাতে তির ধনুক, ভোজালি, বল্লম, বন্দুক কি নেই? এরকম এস্কর্ট করে মন্ত্রী সান্ত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়। আমরাও যে

এরকম আপ্যায়ন পাবো সেটা ভাবিনি। বাসে সেকেন্ড পোলিং অফিসারের নাকের সামনে বোমার থলি ঝুলছে। নতুন চাকরি, প্রথম ভোট। সে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গিয়েছে। এভাবে বেশ খানিকটা আসার পর যখন ওনারা বুঝলেন যে শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন বাস থামিয়ে নেমে পড়লেন। বাকিরাও ফেরত চলে গেল। বাস আমাদের রিসিভিং সেন্টারে নামিয়ে দিল।

মালপত্র নিয়ে ভেতরে ঢোকার পরপরই অফিসাররা চলে এলেন। ভীষণ ভালো ব্যবহার, কি কি করতে হবে সব বলে দিলেন। আমি এর আগে অনেক ভোট নিয়েছি, ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর এরকম ব্যবহার সাধারণত পাওয়া যায় না। এই ভালো ব্যবহারের কারণ বুঝলাম ভেতরে যাওয়ার পর। প্রত্যেকটা পোলিং পার্টির লোকজন অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। বুথে আহত, অপমানিত হয়ে আসার যন্ত্রণা তখন ক্ষোভে পরিণত। একটাই প্রশ্ন—'তাহলে এত পয়সা খরচ করে ভোট নিতে যাওয়ার কি দরকার ছিল?"

জিনিসপত্র জমা করে দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। বেশ কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। রাস্তার দুই জায়গাতে বড়সড় জটলা—সবাই বুঝি ভোট নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। ভুল ভাঙল দ্বিতীয় জটলায়, না ভোট না—আই পি এলের বেটিং চলছে। অল্প বয়েসী ছেলেই বেশী, দুটো মেয়েকেও দেখলাম। সামনের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন এই বেটিং করতে গেলে আধার কার্ড দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। খুবই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, টাকা ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই মনে হয়।

অবশেষে বাড়ি ফিরলাম, দেড় বছরের ছেলে দৌড়ে এসে কোলে নেওয়ার বায়না জুড়ল। ছেলেকে বুকে চেপে ধরলাম। যখন মাথায় বন্দুক তাক করেছিল, ছেলের মুখটাই ভেসে উঠেছিল সবার আগে। স্নান করে চা-টা খেয়ে একটু ধাতস্থ হলাম। টিভি চালাতেই দেখলাম ভোটের সন্ত্রাস। বাইক জ্বলছে, রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে আছে, কারো মাথা দিয়ে রক্ত ঝড়ছে, কোথাও লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার চলছে, ভোট বাক্স উড়ে গিয়ে পুকুরে পড়ল, আগুনে পুড়ছে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার--জ্বলছে ভারতের তথাকথিত গণতন্ত্র। বেসরকারি খবর অনুযায়ী ওইদিন পর্যন্ত ২৩ জনের কাছাকাছি মারা গিয়েছেন, মানে মনোনয়ন জমার দিন থেকে শুরু করে ভোটের দিনের তখনকার খবর পর্যন্ত। যদিও সরকারি মতে সংখ্যাটি '৬'। মা আর স্ত্রী সকাল থেকে এইসব দেখে দুপুরে আর ভাত খেতে পারেনি। এর মধ্যেই তলা দিয়ে একটা খবর যাচ্ছে--প্রিসাইডিং অফিসার নিখোঁজ। প্রিসাইডিং অফিসারকে অপহরণ করা হয়েছে। প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকলেও রাতে আর ভালো করে ঘুম হল না।

সকালে উঠে বাজারে গেলাম, বাজার প্রায় ফাঁকা, তারই মধ্যে ছোট ছোট জটলায় ভোট নিয়ে আলোচনা চলছে। এক বন্ধুর সাথে দেখা হল। তার বুথের ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, পরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। সেখান থেকে পরে বাড়ি ফিরেছে অনেক রাতে। বাড়ি ফিরে টিভি চালাতেই শিউড়ে উঠলাম। প্রিসাইডিং অফিসার রাজকুমার রায়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে রেললাইনের ধারে। আর দেখতে ভাল লাগছিল না। আড্ডা দিতে বেরলাম। বন্ধুদের প্রায় সবারই ডিউটি পড়েছিল—কম বেশী সবারই একই অভিজ্ঞতা। একজনের ফোন নিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। একজনের ঘরের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারা কোনও মতে পাশের একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কোথায় আবার খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছে, ভোটটা যদিও তারাই দিয়েছে। একটাই প্রশ্ন ছিল সবার যে এটাই যদি ভোটের পদ্ধতি হয় তাহলে এত টাকা খরচ করে এত মানুষের হয়রানির মানে কি?

সন্ধ্যেবেলা টিভিতে সিরিয়াল শেষ হওয়ার পর আমার সুযোগ আসল। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 'শিক্ষক রাজকুমার রায় আত্মহত্যা করেছেন'। তিনি যে ট্রেনে আত্মহত্যা করেছেন সেই ট্রেনের ড্রাইভার বয়ান দিয়েছেন। মানে পরপর ঘটনাগুলো সাজানোর চেষ্টা করলে এরকম একটা ব্যাপার উঠে আসে যে প্রিসাইডিং অফিসার ভোট চলাকালীন বুথ থেকে বার হয়ে গেলেন, সেখান থেকে ৩১ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে (আর কোনও বিকল্প ছিল না?) রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছে ট্রেনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। তিনি নাকি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন আত্মহত্যা করবেন। তাই তিনি ভোটের আগের দিন সব কাজ করলেন। ভোট চলাকালীন ছাপ্পার প্রতিবাদ করায় হুমকি খেলেন, তারপর বাড়িতে ফোন করলেন যে ফিরতে দেরী হবে এবং শেষ পর্যন্ত ৩১ কি.মি. পায়ে হেঁটে যে লাইনে ট্রেন চলাচল খুবই কম সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করলেন—এইরকমই ভোট সন্ত্রাস নিয়ে তুলোধোনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। আবার পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ।

এর মধ্যেই ১৫ই মে কর্ণাটক বিধানসভার ভোটের ফল বেরল। তাই নিয়ে আবার বাজার গরম। সেখানে বিজেপি ১০৪টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে। যেখানে জাতীয় কংগ্রেস ৮০টি আর জেডি ৩৭টি সিট পেয়েছে। সরকার গঠন করতে হলে ১১২টা আসনের দরকার। রাজ্যপাল বিজেপিকে আহ্বান জানালে বিজেপি সরকার গঠন করে ফেলে ১১২ জন বিধায়কের সমর্থন ছাড়াই। এইভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ উগরে দিলেন। রাহুল গান্ধীও বেজায় ক্ষিপ্ত। কংগ্রেস গতবারের ১২২টি আসনের বদলে এবারে ৮০টি, জেডি গতবারের ৪০টি আসনের জায়গায় এবারে ৩৭টি এটা তো বিজেপিরই নৈতিক পরাজয়। মানুষ তো বিজেপিকে চাইছে না। বিজেপি সরকার গঠন করলে তো গণতন্ত্রেরই অবমাননা। কাজেই কর্ণাটক হাইকোর্টে মামলা হল। মাঝরাতে কোর্টে মামলা চলল। আদালত বিজেপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের একটা সময়সীমা বেঁধে দিল। তার মধ্যে ১১২ সংখ্যাতে পৌঁছাতে হবে, নইলে নতুন সরকার ভেঙে দেওয়া হবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের গণনা এগিয়ে আসছে। শিক্ষক রাজকুমার রায়ের হত্যার প্রতিবাদে এবং মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবীতে সারা বাংলার শিক্ষকেরা রাস্তায় নামলেন। দীর্ঘক্ষণ রায়গঞ্জে পথ অবরুদ্ধ হল এবং শিক্ষকরা ভোট গণনা বয়কট করলেন। শিক্ষামন্ত্রী জানালেন আন্দোলনকারীরা কেউই ভোটকর্মী নন, সবাই এবিটিএ'র সদস্য। এখানে সোশাল মিডিয়াতে একটা প্রশ্ন উঠে আসছিল যে 'এবিটিএ'র সদস্য হলেই কি আন্দোলন করার অধিকার থাকবে না নাকি এবিটিএ-রই একমাত্র আন্দোলন করার মত মেরুদণ্ড আছে?' আন্দোলনরত শিক্ষকরা গ্রেফতার হলেন। ভোটের প্রক্রিয়ায় প্রায় ২৫ জনের মত মারা গিয়েছিলেন বলে খবরে ছিল, কিন্তু কতজন গ্রেফতার হয়েছিলেন সেই সংখ্যাটা আতিপাতি করে খুঁজে পেলাম না। জানা গেল এসডিও কে হেনস্থা করার অপরাধে শিক্ষকরা গ্রেফতার হয়েছেন। এসডিও জানিয়েছেন তিনি নীচু জাতের মানুষ বলে হেনস্থার শিকার। এই জাতের তাসটা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। রাজকুমার রায়ের বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে কোন অফিসার ছিলেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছিলেন কিনা এবং মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে সেই ব্যাপারে কোলকাতা হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে কোনও সংবাদপত্র বা টিভিতে এক লাইনও চোখে পড়ল না। রাজকুমারবাবুর মৃত্যুকে না হয় আত্মহত্যা বলে পার পাওয়ার একটা চেষ্টা চলছিল, কিন্তু বাকিদের মৃত্যু তো আর আত্মহত্যা নয়, তাদের বেলায় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেটাও জানা যায়নি।

ওদিকে ভোটের গণনা শুরু হয়ে গেল। ভোটের বুথে না হয় নিরাপত্তা ছিল না, কিন্তু গণনা কেন্দ্রেও একই ঘটনা। ত্রিস্তর নিরাপত্তা ভেদ করেও সেখানে ব্যালট পেপারে ছাপ দিতে দেখা গেল। ফাঁকা ব্যালট পেপারে ছাপ দেওয়া হচ্ছিল নাকি বিরোধী ব্যালেটে আবার ছাপ দেওয়া হচ্ছিল—সেটা বোঝা গেল না। ৩৪% আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার পর যে সব আসনে ভোট হয়েছে সেখানেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল শাসকদল। কেষ্টবাবুর গুড়-জল, নকুলদানা, চড়াম চড়াম ঢাকের আওয়াজের সাথে রাস্তা আগলে উন্নয়নের দাড়িয়ে থাকা ফর্মুলা প্রশংসিত হল।

ওদিকে আবার কর্ণাটকে জেডি আর কংগ্রেস মিলিতভাবে সরকার গঠন করে ফেলল, মুখ্যমন্ত্রী হলেন সেই জেডি থেকে যারা ১৬% আসন আর ১৮% ভোট পেয়েছে। এই গণতন্ত্রের জয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকলেন। সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট প্রক্রিয়া ও পঞ্চায়েত গঠন হল। পুরো ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন কর্ণাটকে কোনও ধরনের গোলমালের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আর হ্যাঁ সুপ্রীম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়া বৈধতা নিয়ে হওয়া মামলা দীর্ঘদিন চলল।

কার্ল মার্ক্স : শ্রম ও বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের হিসাব নিকাশ

প্রদীপ বকশি

সংক্ষিপ্তসার

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের একটি সমালোচনা শুরু করেছিলেন। সেই সমালোচনা তাঁর জানা বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র হতে উত্তরণের পথের সন্ধানে নিবেদিত ছিল।

সেই উত্তরণের লক্ষ্য : এই বিদ্যাটিকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন মতাদর্শকে বা ভ্রান্ত চৈতন্যকে খণ্ডন করা পথে, একটি প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান তৈরি করে, মজুরি শ্রমিকের আত্মমুক্তির সংগ্রামে তত্ত্বগতভাবে সাহায্য করা। মার্ক্স তাঁর এই কাজটিকে ৬টি ভাগে ভাগ করে গবেষণা করার ও লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই ভাগগুলি যথাক্রমে : *পুঁজি, জমি সম্পত্তি, মজুরি শ্রম, রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশ্ব বাজার।*

Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) [মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র (মাএরস)] গ্রন্থমালার দ্বিতীয় বিভাগে 'পুঁজি'-র ও তার আগের প্রাথমিক অসমাপিত ও সমাপিত লেখাজোখাগুলি ১৫টি খণ্ডে, কয়েকটি খণ্ডের একাধিক উপ-খণ্ড নিয়ে, মোট ২৩টি বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে :

<http://mega.bbaw.de/struktur/abteilung_i>

মার্ক্সের ও এঙ্গেলসের লেখা অন্য সব বই, নিবন্ধ ও সেগুলির খসড়া এই গ্রন্থমালায় প্রথম বিভাগের

<http://mega.bbaw.de/struktur/abteilung_ii>

তাঁদের চিঠিপত্রগুলি ওই রচনাসমগ্রেহ তৃতীয় বিভাগের :

<http://mega.bbaw.de/struktur/abteilung_iii>

আর, বহু দেশ ও নানা বিষয় সম্বন্ধে লেখাপড়া করার সময়ে নেওয়া নোট ও উদ্ধরণ সম্বলিত খাতাপত্রগুলি চতুর্থ বিভাগের :

<http://mega.bbaw.de/struktur/abteilung_iv>

বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ও হবে। এই প্রকাশনা ২০২৫ সাল নাগাদ শেষ হতে পারে বলে জানা গেছে <http:// mega.bbaw.de>.

মার্ক্সের এ পর্যন্ত প্রকাশিত রচনা ও খসড়াগুলি আলোচিত ও সমালোচিত প্রায় প্রতিটি বিষয়ই অসম্পূর্ণ ও উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। এমনই একটি বিষয় হল মজুরি শ্রম।

আধুনিক সমাজে মজুরি শ্রমের আর বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আলোচিত ও সমালোচিত হলে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা আরও বিকশিত হতে পারে।

সব ধরনের শ্রমই কোনও কাজের জন্য খরচ করা শ্রম সময়ের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায়। ১৮৪৫ সালে, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) রচিত *Die Laga der orbelitenden Klasse in England* (ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় পৌনে দুই শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন দেশে মানুষের প্রতিদিনের জীবনে সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা চালু রয়েছে (বকশি, ২০১২বি)। এই অনুসন্ধানের অন্যতম ফল হিসাবে, গত কয়েক দশকে, প্রতিদিনের বিনা মজুরির শ্রম-সময়ের ভিন্নতার আলোকে, স্ত্রী-পুরুষে সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিত্তিটি প্রকাশ্যে আসে। এই তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে এবং তাকে আরও সম্প্রসারিত করে মজুরি শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে মার্ক্সের অসমাপিত পরিকল্পনাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

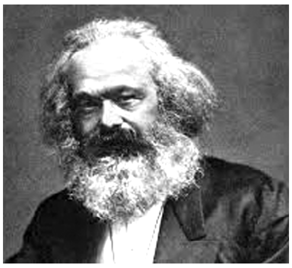

কার্ল মার্ক্স

এই নিবন্ধে এই গবেষণার অতীত ইতিহাসের একটি খসড়া ও তার আগামী কর্তব্যগুলির জন্য একটি সম্ভাব্য কর্মসূচি পেশ করা হল।

কোনও নিরক্ষর মানুষ নিজের সারা দিনরাতের শ্রম সময়ের হিসাব রাখতে ও দিতে পারেন না। সারা পৃথিবীর স্ত্রী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজে শ্রম-সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডারকে আরও বিকশিত করার পথে, পৃথিবীর সব জনসমাজের সব মানুষকে এই হিসাব রাখার জন্য দরকারি সাক্ষরতা অর্জন করতে হবে। এখনও বহু দেশের বহু মানুষ নিরক্ষর। তাই যাঁরা বিনা মজুরির শ্রম সময়ের হিসাব নিকাশ করার ব্যাপারে আগ্রহী, তাঁদের বিভিন্ন সমাজে সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করার প্রয়াসের সাথে যুক্ত হয়ে এবং বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এই কাজ করতে হবে।

এই নিবন্ধে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ :

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা, মজুরি শ্রম, বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম, স্ত্রী-পুরুষে অসাম্য, সময়ের ব্যবহারের হিসাব নিকাশ ও পর্যালোচনা, সর্বজনীন সাক্ষরতা, বিকাশমান প্রযুক্তি।

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা

কাল মার্কস ১৮৫৮-১৮৫৯ সালে ৬টি প্রাথমিক ধারণায় বা বিষয়ে ভাগ করে, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা করার জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সময়ে তিনি চার বার এই পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথম বার : ১৮৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ফার্ডিনান্ড লাসালকে পাঠানো একটি চিঠিতে। সেখানে মার্ক্স লেখেন :

''এখন আমি অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণাগুলি সমালোচনা করার অথবা, বলা যায়, বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি সমালোচনামূলক উপস্থাপনা করার কাজে ব্যস্ত। এটি একই সময়ে এই ব্যবস্থার ও তার সমালোচনা উপস্থাপনা। এই উপস্থাপনা—আমি বলতে চাইছি, এর রচনাশৈলী—পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক, তাই এটি প্রচলিত অর্থে পুঁজি-বিরোধী নয়। পুরো বিষয়টি ৬টি বইয়ে ভাগ করে লেখা হবে : ১) পুঁজি প্রসঙ্গে (এর মধ্যে ভূমিকা হিসাবে কয়েকটি অধ্যায় থাকবে।) ২) জমি সম্পত্তি প্রসঙ্গে। ৩) মজুরি শ্রম প্রসঙ্গে। ৪) রাষ্ট্র প্রসঙ্গে। ৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ৬) বিশ্ব বাজার (*MEGA* 111/9: 72-73; *MECW* 40-270)।

দ্বিতীয় বার : ওই বছরেরই ১১ মার্চ তারিখে লাসালকে পাঠানো অন্য একটি চিঠিতে।

''গোটা ব্যাপারটাকে আমি যে ৬টা বইয়ে ভাগ করছি তার সবগুলোতেই সব বিষয় সমানভাবে সবিস্তারে লেখার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। শেষের ৩টিতে সাধারণ রূপরেখার বেশি কিছু দেব না। আর প্রথম ৩টিতে যেহেতু অর্থশাস্ত্রের মূল ভিতগুলোর কথা থাকবে, তাই সেখানে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা এড়ানো যাবে না।' (*MEGA* 111/9: 99; *MECW* 40-243)।

তৃতীয় বার : ওই ১৮৫৮ সালেরই ২ এপ্রিলে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে। সেখানে মার্ক্স লিখেছেন :

'গোটা বিষয়টাকে ৬টা বইয়ে ভাগ করে ফেলতে হবে। ১) পুঁজি প্রসঙ্গে, ২) জমি সম্পত্তি, ৩) মজুরি শ্রম, ৪) রাষ্ট্র, ৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ৬) বিশ্ব বাজার। (*MEGA* 111/9: 122; *MECW* 40-298)।

আর চতুর্থবার : ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত *Zur Kritik der Politischen Okonomic : Erstes Hft* (রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা : প্রথম পুস্তিকা)-র মুখবন্ধে। সেখানে তিনি লেখেন : SV

''বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে আমি নিচে লেখা ক্রম অনুসরণ করে বিচার করছি : *পুঁজি, জমি সম্পত্তি, মজুরি শ্রম, রাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশ্ব বাজার*। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যে তিনটি বিশাল শ্রেণিতে বিভক্ত সেই শ্রেণিগুলির অস্তিত্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রথম তিনটি শিরোনামের অধীনে বিশ্লেষণ করা হবে। আর বাকি তিনটি শিরোনামের মধ্যেকার সম্পর্ক নিজে নিজেই স্পষ্ট।... দরকারি সব মালমশলাই কয়েকটি পুস্তিকার আকারে আমার সামনে রয়েছে। এগুলি একে অপরের থেকে বেশ ছাড়া ছাড়া আলাদা আলাদা সময়ে রচিত। এসব আমি নিজে বোঝার জন্য লিখিনি। এই লেখাজোখাগুলিকে ওপরের পরিকল্পনা অনুসারে গুছিয়ে লেখার ব্যাপারটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে'' (মার্কস 1859 : iii; *MEGA* 11/2: 99; *MECW* 29:261)।

এই সমালোচনা তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে শেষ করে যেতে পারেননি। সেই অসমাপিত সমালোচনার, আর তার মধ্যে বিশেষ করে 'পুঁজি'র রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার অসমাপিত অবস্থার; নানা প্রসঙ্গ গত একশো বছরেরও বেশি সময় জুড়ে নানা জনে আলোচনা করেছেন ও করছেন। এ বিষয়ে দেখুন : কাউটস্কি, ১৮৯৭; ভিলব্রান্ট, ১৯১৮; রুবেল, ১৯৭৩; কেনেস্সে, ১৯৯১; লেবোউইটস,

১৯৯২; এবং ফান ডের লিন্ডেন ও হুবমান (সম্পা.)। ২০১৮। আর প্রাসঙ্গিক ভিন্ন মতের জন্য দেখুন : গ্রোসমান, ১৯২৯; লাসিডেস, ১৯৯৮; মার্ক্স-এঙ্গেলস গবেষণায় অবদান, নতুন পর্ব, ২০১৩ এবং ঘোষ, ২০১৭।

মার্ক্সের 'পুঁজি'র রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা অসম্পূর্ণতার, আরও দুটি, পর্যায়ক্রমিকভাবে আরও বড় মাপের, অসম্পূর্ণতার গর্ভে নিহিত।

এক : মার্ক্সের 'পুঁজি' সংক্রান্ত লেখাজোখার অসম্পূর্ণতা তাঁর পরিকল্পিত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার বৃহত্তর অসম্পূর্ণতার একটি অংশ মাত্র। সেই পরিকল্পিত সমালোচনার মধ্যেকার জমি সম্পত্তি, মজুরি শ্রম; রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশ্ব বাজার সংক্রান্ত বাকি ৫টি বিষয়ে লেখার জন্য তৈরি করা, তাঁর বিভিন্ন ছক, গ্রন্থ-নিবন্ধপঞ্জী, ব্যক্তিগত সংগ্রহের কয়েক হাজার বইয়ের মার্জিনে লেখা মন্তব্য ও শত শত খাতায় লিখে রাখা উদ্ধরণ, নোট ও খসড়াগুলি আরও অসমাপিত এবং আরও কম বিকশিত, খানিকটা প্রকাশিত আর খানিকটা অপ্রকাশিত, অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। 'পুঁজি' সংক্রান্ত লেখাজোখাগুলির মধ্যে তাঁর পরিকল্পিত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার বাকি ৫টি প্রাথমিক ধারণা সংক্রান্ত নানা কথা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। তবে ওই বাকি বিষয়গুলি নিয়ে 'পুঁজি' গ্রন্থমালার আদলে কোনও গ্রন্থমালা রচনার কাজ তিনি শুরুও করে যেতে পারেননি।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

দুই : রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস ও তার সমালোচনা মানব সমাজের ইতিহাসের আর তার মধ্যে বিকাশমান বিভিন্ন বিদ্যার ইতিহাসে একটি অংশ মাত্র। মার্ক্সের অসমাপিত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনাও, তাঁর কালে, তাঁর জানা, পৃথিবীর মানব সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ও বিদ্যার ইতিহাসের, তাঁর সারা জীবন জুড়ে জারি থাকা সুবিশাল, অসমাপিত অধ্যয়নের ও পর্যালোচনার একটি অংশ মাত্র। মানব সমাজের ইতিহাসের, আর তার মধ্যে বিভিন্ন দেশের, নানা বিদ্যার ও বিষয়ের, বহু পর্যায়ের, এই অসমাপিত, আর তাই উন্মুক্ত, পর্যালোচনার এক বিশাল উত্তরাধিকার মার্ক্স তাঁর পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য রেখে গেছেন। সেই উত্তরাধিকার মার্ক্সের ও এঙ্গেলসের সংরক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে :<https://search/socialhistory.org/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#tabnav>, মার্কসের নিজের লেখাজোখায় (A 1-115 এবং B 1-168), আর তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত রচনাসমূহে : <http://mega,bbaw.de/struktur> লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনা সমগ্রের চতুর্থ বিভাগের বত্রিশ নম্বর খণ্ডের প্রাক-প্রকাশনা হিসাবে, মার্ক্স-এঙ্গেলসের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের, এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গ্রন্থনিবন্ধাদির, একটি হালনাগাদ সটিকা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে *MEGA* IV/32, 1999। সেখানে, তালিকাভুক্ত গ্রন্থ-নিবন্ধসমূহের মার্জিনে লেখা মার্ক্সের মন্তব্যগুলির হদিশ মেলে। বহু দেশের ও বহু বিষয়ে প্রকৃতি ও ইতিহাসচর্চার যে প্রয়াস মার্ক্স আজীবন জারি রেখেছিলেন তার আংশিক পরিচয়বাহী একটি খসড়া গ্রন্থ-নিবন্ধপঞ্জীর গত কয়েক বছর যাবৎ অন্তর্জালে রয়েছে (বকশি, ২০১৩)।

মজুরি শ্রম

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা করার জন্য মার্ক্সের ১৮৫৮-১৮৫৯ সালের পরিকল্পনার তৃতীয় বিষয় ছিল : মজুরি শ্রম।

শ্রমের মজুরি আলোচনা দিয়েই মার্কস তাঁর ১৮৪৪ সালে লেখা Okonomisch-philosophische Manuskripte (Erste Wiedergabe) : Heft I. এবং (Zweite Wiedergabe) : Heft I. [অর্থশাস্ত্রীয়-দার্শনিক পাণ্ডুলিপিসমূহ (প্রথম উপস্থাপনা) : (প্রথম পুস্তিকা) এবং, (দ্বিতীয় উপস্থাপনা) : প্রথম পুস্তিকা] শুরু করেছিলেন। এই দুই উপস্থাপনাতেই প্রথম বাক্য : "Arbeitslohn : Arbeitslohn wird bestimmt durch den feindlichen Kampf Zwischen Capitalist und Arbeiter." ["শ্রমের মজুরি : পুঁজিপতির ও শ্রমিকের মধ্যে বৈরিতামূলক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শ্রমের মজুরি নির্ধারিত হয়।"] (MEGA 1/2, 1982: 189 এবং 327)। তবে এই সূত্রপাত সত্ত্বেও জীবনের পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি তাঁর অসমাপিত 'পুঁজি' গ্রন্থমালার আদলে মজুরি শ্রম সংক্রান্ত কোনও বিস্তারিত গ্রন্থমালার খসড়া রচনা করার কাজে হাত দিতে পারেননি। এর মানে এই নয় যে মজুরি শ্রম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা ১৮৪৪ সালের পর একই জায়গায় খেমেছিল, আর এগোয়নি। এগিয়েছে, এবং সে সম্বন্ধে অন্যেরাও লিখেছেন। মজুরি শ্রম সম্বন্ধে মার্ক্সের ধারণা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনার একটি উদাহরণ : স্ক্রেপান্তি, ২০১৭।

'পুঁজি' গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন সংস্করণে মজুরি শ্রম সম্বন্ধে একটি অধ্যায় বা, কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত একটি করে বিভাগ রয়েছে। মার্ক্স-এঙ্গেলস রচনাসমগ্রের দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে এই প্রথম খণ্ডটির ৬টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে (MEGA II/5-10)। ১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত এই সংস্করণগুলির ভেতরে মজুরি শ্রম সংক্রান্ত অধ্যায়ের বা বিভাগের (প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া) পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি যথাক্রমে : II/5 হামবুর্গ ১৮৬৭ (৪৩৩-৪৫৫)। হামবুর্গ ১৮৭২ (৪৯৮-৫২১); II/7 পারি ১৮৭২-১৮৭৫ (ফরাসি পাঠ, ৪৬১০৪৮৭), II/8 হামবুর্গ ১৮৮৩ (৫০৬-৫৩১); II/9 লন্ডন ১৮৮৭ (ইংরেজি অনুবাদ, ৪৬৬-৪৯১); এবং II/10 হামবুর্গ ১৮৯০ (৪৭৯-৫০৫)। এর মধ্যে প্রথম তিনটি সংস্করণ (II/5-7) মার্ক্সের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল; আর পরের তিনটি (II/8-10) তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদনা করেন এঙ্গেলস। এই প্রতিটি সংস্করণেই খুবই স্পষ্ট করে ও অপরিবর্তিত ভাষায় লেখা রয়েছে

: ''মজুরির আবার নানা রূপ আছে... তবে সেই সব রূপের আলোচনা করার জায়গা মজুরি শ্রম সংক্রান্ত একটি বিশেষ রচনার মধ্যে, আর তাই এই বইয়ে তার জন্য কোনও জায়গা নেই'' (II/5; 440; 11/6: 505; II/7: 468; II/8: 513; II/9:473; II/10: 486)। দেখা যাচ্ছে যে আলাদা করে মজুরি শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা লেখার প্রয়োজন নিয়ে ১৮৫৮-১৮৫৯ সাল থেকে শুরু করে ১৮৮৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত মার্ক্সের, আর তার পরে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এই খণ্ডটির সম্পাদক এঙ্গেলসের কোনও ভিন্ন মত ছিল না।

১৮৫৯ সালে মার্ক্স লিখেছিলেন যে তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর খসড়া লেখাজোখাগুলিকে ''গুছিয়ে লেখার ব্যাপারটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে'' (মার্ক্স, 1859 : iii; MEGA II/2, 1980: 99)। মজুরি শ্রমের আধার যে শ্রমিক তার জন্মের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হিসাবে এবং তার অবিচ্ছেদ্য পরিবেশ হিসাবে উপস্থিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েদের ও শিশুদের বিনা মজুরির শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নির্মাণ করে, আর তারপর তার সমালোচনাকে মজুরি শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার সাথে যুক্ত করে মার্ক্সের উত্তরাধিকারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম

আজও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাক্-বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী অবস্থায় টিকে রয়েছে। এই অবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি অতীত হতে উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া ও অতি ধীরে বিবর্তনশীল জমি সম্পত্তি এবং জমি-সম্পর্কসমূহ। জমি সম্পত্তির রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা, মার্ক্সের পরিকল্পনার দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে ঠিক করা ছিল। সেই কাজ করার জন্য তিনি অনেক মালমশলাও জোগাড় করেছিলেন; কিন্তু কাজটি করে উঠতে পারেননি।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ সমাজ এখনো হয় প্রাক্-আধুনিক, নয়তো সবে আধুনিক হওয়ার পথে পা বাড়াচ্ছে। এই সমাজগুলির শ্রমের বাজারে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সেখানকার বড় বড় ব্যবসাদাররাও এক ধরনের প্রতিবন্ধী। তাঁরা রাষ্ট্রের পরিচালক রাজনীতিবিদদের সাথে লেনদেনের সুবাদে পাওয়া সুযোগ-সুবিধার এবং প্রাক্-বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভেতরে গড়ে ওঠা আধিপত্যের, বশ্যতার, সাম্প্রদায়িকতার ও জাতপাতের নানা গোষ্ঠীগত যোগসাজসের ও রেওয়াজের ওপরে নির্ভর করে ব্যবসা করেন। এই সমাজগুলির অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষও এখনও পুরোদস্তুর মজুরি শ্রমিক নন। এঁদের মধ্যে যাঁরা পরিবারের বাইরে শ্রম-বাজারে নিয়োজিত, সারা দুনিয়ায় তাঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ এখনও নিজেদের দেশের রাষ্ট্রের দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি সীমার নিচে অর্ধ-দাস বা পূর্ণ-দাস শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন (আইএলও, ২০১০এ এবং ২০১৮বি; বিশ্বব্যাঙ্ক, ২০১৯)। কয়েকটি হিসাব অনুসারে ২০১৪ সালে ভারতের শ্রমজীবীদের মধ্যে এঁদের অনুপাত ৯০ শতাংশেরও বেশি ছিল (শ্রীজা ও শিরকে, ২০১৪: ৪১; শ্রম ব্যুরো, ২০১৫ছ১)। গ্রামের চাষবাসে আর শহরের খুচরো পরিষেবায় যাঁরা স্বনিয়োজিত শ্রমজীবী হিসাবে কাজ করেন, তাঁদের হিসাবের মধ্যে ধরলে এই শতকরা অনুপাত বাড়তে পারে। এই শ্রম-বাজারকে সংগঠিত ক্ষেত্র এবং সেখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ঘোষণা করে বিপুল সংখ্যক মানুষের আংশিক ও পূর্ণ দাসত্বের এই বিশাল বাস্তবতাকে ঢাকা দেওয়া যায় না। আর পৃথিবীর সব পরিবারে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত শিশু, নারী ও বয়স্ক মানুষেরা তো পুরোপুরি ১০০ শতাংশ দাস-শ্রমিক।

যেসব তুলনামূলকভাবে শিল্পোন্নত সমাজে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে, সেই জি-৭ গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত রাষ্ট্রগুলির সীমানার মধ্যেকার অবস্থাপন্ন ও ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য, ভারতের মতো কম মজুরির দেশে সস্তায় জরায়ু ভাড়া করার ও নলজাতক তৈরি করার বাজার (পাণ্ডে, ২০১৪; গ্রিলি, ২০১৬); আর, সেই রকম দেশ থেকেই শিশুপালন করার এবং অথর্ব সেবা ও অন্যান্য পারিবারিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য পরিচারিকা জোগাড় করার বাজার খানিকটা গড়ে উঠেছে। তবে তা সত্ত্বেও, আজও সেই শিল্পোন্নত সমাজগুলিতেও, পরিবারের চৌহদ্দির ভেতরের বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমই, বাজারের জন্য মজুরি শ্রম প্রদানকারী শ্রমিকের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সুনিশ্চিত করে। বাকি দুনিয়ার ক্ষেত্রে তো একথা আরও বেশি করে খাটে। অর্থাৎ, আজও, সারা পৃথিবীতে *শ্রম বাজারের মজুরি শ্রম, আর বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম একসাথে মিলেমিশে সমগ্র মানব সমাজে সব ধরনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন সম্পন্ন করে।*

এখানে একথাও বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে যখন বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতার মধ্যেই :

(০) সেনাবাহিনীর, পুলিশের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর শ্রমজীবী কর্মীরা (সুরকার, ২০১৩) ন্যূনতম নাগরিক অধিকারহীন অবস্থায় দাস হিসাবে বা প্রায়-দাস হিসাবে কাজ করেন, অথবা,

(১) যখন মুচলেকা দিয়ে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বাঁধা পড়ে যাওয়া, কোনও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সদস্যেরা সকলে মিলে, ঠিকা প্রথায় বা পিস রেটে বা ফুরনের হিসাবে, চাষের জমিতে ফসল বোনার ও কাটার সময়ে, পাথর কুচির খাদানে, নুনের খনিতে, ইট ভাটায় বা অগভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ ইত্যাদিতে নিয়োজিত হন অথবা,

(২) যখন বহু দেশের যৌন কর্মীরা সময়ের হিসাবে বা ফুরনে যৌন পরিষেবা প্রদানকারী মজুরি শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও পুরনো ঋণের বোঝার বা সন্ত্রাসের, দাপটের ও লোকনিন্দার চাপে পড়ে, বাড়িওয়ালাদের বা মালকিনদের বা দালালদের হাতে কয়েক বছরের জন্য বা বাকি জীবনের জন্য পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বাঁধা পড়ে থাকেন; অথবা,

(৩) যখন একটা ভৌগোলিক এলাকার, যেমন দক্ষিণ এশিয়ার ভারত প্রভৃতি দেশের, জায়মান বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজ তার অতি প্রাচীন জাতিভেদ প্রথার কঠোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে পঙ্গু ও হেঁটমুণ্ড হয়ে থাকে; অথবা,

(৪) যখন বর্তমান কালের চিনের বা বিগত শতাব্দীর সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও বিচারের ব্যবস্থা পার্টিতান্ত্রিক আমলাশাহীর মৌরুসি রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের অধীনস্থ হয়ে থাকে; অথবা,

(৫) যখন পুঁজি নিবেশ বানানোর জন্য তৈরি করা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের গুলাগ এবং চিনের লাও গাই প্রভৃতির মতো বন্দি শিবিরে, ও বিভিন্ন দেশের জেলখানায় কয়েদিদের দাস-শ্রম বা প্রায়-দাস-শ্রম সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে; অথবা,

(৬) যখন গুগল, ফেসবুক প্রভৃতির মতো তথ্য ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলি, তথ্য প্রযুক্তির ওপর তাদের আধিপত্যের সুবাদে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মজুরি শ্রমিকদের মারফৎ, প্রাচীন ভারতীয় পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রযুক্তির ওপর আধিপত্যকারী ব্রাহ্মণদের আর, সমরাস্ত্র ও যুদ্ধ প্রযুক্তির ওপর আধিপত্যকারী ক্ষত্রিয়দের কায়দায়, বিনা বাক্যব্যয়ে, সারা পৃথিবীর আন্তর্জাল ব্যবহারকারী শত সহস্র কোটি মানুষের প্রতি মুহূর্তের বিনা মজুরির শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে তখন; অথবা,

(৭) যখন উপরের (০)-(৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এক বা একাধিক পরিস্থিতি একই সময়ে, একই জায়গায় বিরাজ করে, তখন মজুরি শ্রম ও বিনা মজুরির শ্রম মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে থাকে, তাদের জট ছাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

সময়ের ব্যবহারের বিকাশমান গবেষণায় মজুরি শ্রমের ও বিনা মজুরির শ্রমের হিসাব নিকাশ করার জন্য, সময়কে সাধারণ মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণার সুবাদে গড়ে ওঠা Centre for time Use Research : <https://www.timeuse.org/> প্রভৃতি সংস্থার তত্ত্বাবধানে গঠিত ও নির্ণীয়মান তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে উপরোক্ত প্রকার জটগুলি ছাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

শ্রম বাজারের মজুরি শ্রমের আর বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের মধ্যে সময় ছাড়া আরও একটি সাধারণ ব্যাপার আছে। সেটি এই যে, বাইরের দিক থেকে দেখলে এরা পারস্পরিক চুক্তির ও স্বীকৃতির পরিণাম বলে মনে হলেও, ভেতরে ভেতরে উভয়েই প্রবল ও দীর্ঘ বৈরিতামূলক সংগ্রামের সাথে জড়িত। তফাৎ এই যে বিনা মজুরির গ্রামের ওপর আধারিত আধুনিক এক পতি প্রথার পরিবার পত্তন করার ইতিহাস গত কয়েক হাজার বছরের পুরনো। আর আধুনিক মজুরি শ্রমের বাজার পত্তন করার ইতিহাস মাত্র বিগত কয়েক শত বছরের। পরিবার ও বাজার এই দুই প্রতিষ্ঠানেই মানুষে-মানুষে সম্পর্ক সম্পত্তির, ক্ষমতার ও মর্যাদার অসাম্যের ওপরে আধারিত, আর উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের, আইনের, শিক্ষা ব্যবস্থার ও মর্যাদার অসাম্যের ওপরে আধারিত আর উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের, আইনের, শিক্ষা ব্যবস্থার ও জনমত তৈরি করার জন্য মিথ্যা প্রচার মাধ্যমগুলির দৃষ্টিতে ও ভাষায়, এই সম্পর্কগুলি সমানাধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে স্বেচ্ছায় সম্পাদিত স্বাধীন চুক্তির ওপরে আধারিত।

সম্পত্তি ও পরিবার এবং সে সম্বন্ধে সমাজে পরিব্যাপ্ত সাধারণ ভ্রান্ত চৈতন্যের বিষয়টি মার্কসের ১৮৪৫ সালের ব্রাসেলস প্রবাস পর্বের ২ নম্বর খাতায়, বুরে (১৮৪০) হতে নেওয়া একটি নোটে বীজাকারে প্রতিফলিত হয়েছে। বুরে লেখেন : ''...সম্পত্তি ও চরম নিঃস্বতা কি থাকা উচিত? বিবাহ ও গণিকাবৃত্তি, পরিবার ও পরিবারহীনতা কি থাকা উচিত? এই সকল ব্যাপারই তাদের নিজ নিজ বৈপরীত্যসমূহে বিকশিত হয়েছে, আর কেবলমাত্র অতি বড় মিথ্যা ও মোহ-মায়া মারফৎই সাধারণ স্থির-নিশ্চিত ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হতে পেরেছে" (MEGA IV/3, 1998:142-143)। এ প্রসঙ্গে মেগা-র এই খণ্ডের সম্পাদকেরা মন্তব্য করেছেন : 'সংক্ষেপে : ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে একাধারে বাতিল-অপসারিত-সংরক্ষিত-ও-উন্নীত (Aufhebung) না করে চরম নিঃস্বতা দূর করা যাবে না। বুর্জোয়া পরিবারকে একাধারে বাতিল-অপসারিত-সংরক্ষিত-ও-উন্নীত না করে গণিকাবৃত্তি বিলোপ সাধন করা যাবে না" (ওই খণ্ডেই : ৪৭১)। বর্তমান নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমকে একাধারে বাতিল-অপসারিত-সংরক্ষিত-ও-উন্নীত না করে, মজুরি শ্রমের বিলোপ সাধন করা যাবে না।

কার্ল মার্ক্স উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের যে সমালোচনা শুরু করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল মজুরি দাসত্ব হতে মজুরি শ্রমিকের আত্ম-মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য করা। আশা এই যে একদিন সেই আত্মমুক্তির সংগ্রাম, নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র হতে ধারাবাহিক উত্তরণের পথে ভবিষ্যতের মানব সমাজে বা কমিউনিজমে পৌঁছবে। তবে সেই মজুরি দাসত্ব হতে মুক্ত মানব সমাজে পৌঁছানোর আগে অবশ্যই আরও একটি দরকারি পর্যায় পার হতে হবে। সেই পর্যায়ে, সব বিনা মজুরির দাস-দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে।

আজ আধুনিক এক পতি প্রথার পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই বিনা মজুরির দাস-শ্রমের বা প্রায়-দাস-শ্রমের সব থেকে বড় ও সব থেকে শক্তিশালী দুর্গ। লিউইস হেনরি মর্গান রচিত প্রাচীন সমাজ (১৮৭৭) থেকে নেওয়া নোটের এক পতি প্রথা সংক্রান্ত অংশে এ বিষয়ে মার্ক্স লিখেছেন : ''আধুনিক পরিবার একেবারে গোড়া থেকেই চাষবাসের পরিষেবার সাথে জড়িয়ে রয়েছে, আর তাই তার মধ্যে শুধু দাসত্ব নয়, ভূমিদাসত্বও রূপাকারে বিদ্যমান। যেসব বৈরিতা পরে সমাজে ও তার রাষ্ট্রে বিকাশ লাভ করে, সে সবই তার মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে রয়েছে" (মার্ক্স, বি ১৬২, ১৮৮০-১৮৮১; ক্রেডার, ১৯৭৪ : ১২০; এঙ্গেলস, ১৮৯২ছ৬১; ইংরেজি অনুবাদে : MECW, 26 : 166)। পরিবারের বাইরে মজুরি দাসত্বের আর

পারিবারিক জীবনে দাসত্বের ও ভূমিদাসত্বের বহু স্তরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমরা নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র হতে উত্তীর্ণ হয়ে কমিউনিজমের মানব সমাজে পৌঁছতে পারব না।

পিতৃতান্ত্রিক পারিবারে ও সমাজে মেয়েদের অধস্তন দশার সমালোচনার প্রথম প্রতিফলন ঘটে প্রাচীন সাহিত্যে। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রচিত থেরীগাথার অন্তর্গত ঋষিদাসী, সোনা, অড্ডকাসী, অভয়মাতা, বিমলা, অম্বপালী, চাপা, মুক্তা, পূর্ণিকা, সুমঙ্গলমাতা, কুশা গৌতমী ও সোমা সংক্রান্ত গাথাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (রাজে, ২০০৬ : ৮৭-১০০)। সেই প্রাচীন কাব্যিক উপস্থাপনা পরবর্তী কালের দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মসমূহের ও ললিত সাহিত্যের গতিধারাকে প্রভাবিত করে। তবে এখানে তা লিঙ্গ-বৈষম্যের সামাজিক-নৈতিক ও দার্শনিক সমালোচনায় এবং নারী এবং পুরুষের সাংস্কৃতিক, নাগরিক, আইনগত ও সাংবিধানিক সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

সেই উত্তরণ শুরু হয় ইউরেশিয়া ভূভাগের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে, ষোড়শ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে। তার প্রতিফলন ঘটে গুর্নে (১৫৯৪; ১৬৪১), ফান শুরমান (১৬৪১), বার (১৬৭৩-১৬৭৫), কন্দরসে (১৭৯০), গোজেস (১৭৯১) এবং ওলস্টোনক্রাফট (১৭৯২) প্রমুখের রচনায়। এই অঞ্চলের আধুনিকতার এই ঊষাকালের প্রাসঙ্গিক সামাজিক আলোড়নের সাথে এবং আরও বহু চিন্তাবিদ নারী ও পুরুষের দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক রচনার সাথে, সাধারণ পরিচিতির জন্য দেখুন : ম্যাককিয়োন (২০০৫) এবং ফান এক্ক (২০১৭)। উনিশ শতকে ফুরিয়ের (১৮০৮) এবং বুরে (১৮৪০), আর তার পর মার্ক্স ও এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (১৮৪৮)-এ এবং অন্যত্র নারীর ও পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারের অভাবের সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্মবস্তুর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। নারীমুক্তি সম্বন্ধে মার্ক্সের ও এঙ্গেলসের ধারণার বিবর্তন সম্পর্কে ম্যাক্সিমিলিয়ান রুবেল (১৯০৫-১৯৯৬)-এর বিবরণ (১৯৯৭) প্রসঙ্গে দেখুন : বকশি, ২০১৬।

শ্রমই যে মানব সমাজের সকল সম্পদের উৎস, একথা প্রবল নারী ও শূদ্র বিদ্বেষী প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকার মনুও জানতেন। ১৮৭৯ সালে সেপ্টেম্বরে, কোভালেভস্কির একটি বই থেকে নেওয়া ভারতবর্ষে জমি-সম্পর্কের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি নোটে, মার্কস লিখেছেন : ‘‘...জনসমাজের অধিকারভুক্ত পতিত জমিতে হলকর্ষণের দ্বারা সম্পত্তির উদ্ভবের প্রতি সোজাসুজি অঙ্গুলি নির্দেশ করে মনু স্বীকার করেছেন যে শ্রমই সম্পত্তির ভিত্তি...’’ (মনুসংহিতা, ৯.৪৪; কোভালেভস্কি, ১৮৭৯:-৯৩; মার্ক্স, ২০০১:১৬ এবং প্রাসঙ্গিক টীকা ১৪ক:৭৯)। সম্পত্তি উৎপাদনকারী শ্রমের আধার যে শ্রমিক, তার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনই বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের সামাজিক চাহিদার মূল কারণ।

সারা পৃথিবীতে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রম কেবলমাত্র শেষ ফল হিসাবেই পণ্য-মুদ্রা সম্পর্কসমূহের এলাকায় ঢোকে। সেই ফলগুলি হল : হাসপাতালের বাজারে শিশু হিসাবে শ্রমিকের জন্ম, স্কুল-কলেজ ইত্যাদির বাজারে শিক্ষানবিশ শ্রমিক হিসাবে তার বড় হওয়া, শ্রমের বাজারে জোগান দেওয়া শিশু শ্রমিকের ও প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের মজুরি শ্রমের সময়, আর সেই শ্রম-সময়ের মধ্যে ঢুকে থাকে শ্রমিকের পুষ্টি/খাবার-দাবার, বিশ্রামের বন্দোবস্ত, তার ঘরে কাচা জামা-কাপড়, অসুখ-বিসুখের সময়ে তার সেবা, আর দরকারি যৌন পরিষেবার জোগান ইত্যাদি। পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে বিনা মজুরিতে জোগান দেওয়া এইসব পরিষেবার ও জিনিসের মোট যোগফল—শ্রমিকের শ্রমশক্তি। কোনও শ্রমিকের শ্রমশক্তি যখন শ্রমের বাজারে ঢোকে, তখন সেই বাজারের কেউ সেই শ্রমিকের দেহের ও চেতনার মধ্যে ঢুকে থাকা, তার মায়ের বা বোনের বা স্ত্রীর বা পরিবারের অন্য কোনও সদস্যের অতীত পরিষেবার জন্য কোনও দাম দেয় না। অন্য কথায় বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃতভাবে শিল্পোন্নত বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সহ বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র, সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই গর্ভধারণ, জন্মদান, শিশুপালন, আর বয়স্কদের নানাভাবে সেবা করার সাথে জড়িত পারিবারিক শ্রম, বিনিময় মূল্যের জগতের চৌহদ্দির বাইরেই পড়ে থাকে।

প্রশ্ন ওঠে, সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টিতে এই বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের অবদান কতটা? বিগত প্রায় ১২০ বছর যাবৎ সেকথা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই প্রয়াসের কয়েকটি উদাহরণ : স্টেটসন (আগেকার পদবি : গিলম্যান), ১৮৯৮; ভিলব্রান্ট, ১৯০৬; স্ক্রুমিলিন, ১৯২৩-১৯২৫; জালাই, ১৯৬৬, ১০৭২ এবং ১৯৭৫; গোল্ডশ্মিড-ক্লেবমোন্ট, ১৯৮২ এবং ১৯৮৭; কৃষ্ণরাজ এবং দেশমুখ, ১৯৯৩; মো, ২০০৩; আয়রমঙ্গর, ১৯৯৪ এবং ২০০৪; ফোগেল, ১৯৯৪ এবং ২০০৮; রাজাভি, ২০০৭; বাডলেন্ডার, ২০০৭ এবং ২০০৮; চৌধুরী, ত্রিপাঠী, জর্জ ও অন্যেরা, ২০০৯; আন্তোনোপৌলোস এবং হিরওয়ে (সম্পা.), ২০১০; হিরগুয়ে, ২০১৬; ডঙ্গ এবং আন, ২০১২; জিলানাওয়ালা, ২০১৩; গাগ্লিয়ারদোনে, ২০১৫; শার্মেস ২০১৫-২০১৬; থ্রোপ, টাইসন এবং নিলসেন, ২০১৭; স্মিথ, ২০১৭; কোনেলি এবং কোঙ্গার (সম্পা.), ২০১৭; সুলিভান, ২০১৮; দোত্তি সানি, ২০১৮; এবং জু ও নিশিমাতো, ২০১৮।

এই কাজগুলি নানা ধরনের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডলের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। এইসব কাজ মার্ক্স প্রস্তাবিত রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনায় নিবেদিত নয়। তবে মার্ক্স যেভাবে তাঁর কালের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র, পরিসংখ্যান, ইংল্যান্ডের কারখানা পরিদর্শকদের রিপোর্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের নিজ সমালোচনা শুরু করেছিলেন, এই কাজগুলিকেও সেইভাবে বিনা মজুরির শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের নির্মাণে ও তার সমালোচনার জন্য ব্যবহার করা যায়। সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত অতীত, বর্তমান ও আগামী তথ্যভাণ্ডার হতে সেই সমালোচনায়

যে প্রশ্নগুলি উঠে আসছে ও আসবে সেগুলির উত্তর খুঁজে বার করাটাই আগামী দিনের কাজ।

এ প্রসঙ্গে দুটি দেশে সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত কয়েকটি অনুসন্ধানে পাওয়া কিছু তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দেশ অস্ট্রেলিয়া, আর দ্বিতীয় দেশ ভারত।

অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে ১৯৯৭ সালে ব্যবহৃত শ্রম-সময়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ শিশুপালন করার কাজে খরচ হয়েছিল (আয়রনমঙ্গার, ২০০৪: ১০৫-১০৬)। এর খানিকটা ছিল মজুরি শ্রম, আর বাকিটা বিনা মজুরির। সময়ের ব্যবহারের বিচারে শিশুপালনই ছিল ওই বছরে অস্ট্রেলিয়ার সব থেকে বড় শিল্প। সেখানকার সরকারের ২০১৬ সালের একটি রিপোর্ট অনুসারে সেখানে মেয়েদের প্রায় ৩৬ শতাংশ কাজ মজুরি শ্রমের আর বাকি ৬৪ শতাংশ কাজ বিনা মজুরির; অন্যদিকে ছেলেদের প্রায় ৬৪ শতাংশ কাজ মজুরি শ্রম আর তাদের বাকি ৩৬ শতাংশ কাজ বিনা মজুরির (অস্ট্রেলিয়ার সরকার, ২০১৬: ৪)। একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থার তৈরি করা হিসাব অনুসারে ওই ২০১৬ সালেরই বাজার দরে অস্ট্রেলিয়ায় বিনা মজুরির শ্রমকে মজুরি শ্রম দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার মূল্য সেখানকার রাষ্ট্রীয় গড় আয়ের প্রায় ৩৪ শতাংশ। (থ্রোপ টাইসন এবং নিলসেন, ২০১৭: ২)। সেখানকার গণমাধ্যমেও এই অনুসন্ধানের প্রতিফলন ঘটেছে : শিশুপালন করার কাজকে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতির সব থেকে বড় শিল্প হিসাবে মেনে নেওয়ার দাবি উঠেছে (স্মিথ, ২০১৭)।

২০০৯ সালে নাগপুরে করা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষার ওপরে আধারিত একটি হিসাব অনুসারে, ওই বছরে ভারতের মেয়েদের বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের মূল্য ছিল প্রায় ৬১২.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার বা ২৯,৫৩,৪৬,৭৯৭ ট্রিলিয়ন ভারতীয় টাকা বা ভারতের ওই বছরের রাষ্ট্রীয় গড় আয়ের প্রায় ৬১ শতাংশ (চৌধুরী, ত্রিপাঠী, জর্জ ও অন্যেরা, ২০০৯, ii, ২৪)

বাজার দরের মজুরি শ্রমের মাপকাঠি দিয়ে বিনা মজুরির শ্রমের প্রতিস্থাপন মূল্যের হিসাব করা ছাড়াও, মজুরি শ্রমের হারানো সুযোগের মাপকাঠিতে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের হিসাব নিকাশ করা হয়। উদাহরণ, একটি নারী (না) ও একটি পুরুষ (পু) নিয়ে গঠিত এমন একটি এক পতি প্রথার পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কথা বিবেচনা করা যাক, যেখানে (না) এবং (পু) দু'জনেই মজুর এবং দু'জনেই সমান দক্ষ; কিন্তু এই ধরনের পরিবারের রেওয়াজ মেনে নিয়ে কেবলমাত্র (পু) শ্রম বাজারে মজুরি শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন আর (না) পরিবারে বিনা মজুরির কাজে নিয়োজিত থাকেন। যদি (পু) প্রতিদিন তাঁর মজুরির হিসাবে কোনও মুদ্রার ১ একক পান, তাহলে (না)-এর ওই দিনের জন্য বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের মজুরি = অন্তত পক্ষে, শ্রম বাজারে না গিয়ে হারানো মজুরি হিসাবে প্রাপ্য ওই মুদ্রার ১ একক + বাড়িতে (পু)-র জন্য রান্না করা, তার বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা, তাকে যৌন পরিষেবা প্রদান করা ইত্যাদির জন্য বাজার দরে প্রাপ্য মজুরি। ওই পরিবারে শিশু থাকলে তাদের জন্য গর্ভের ভাড়া বাজার দরে গর্ভধারণের শিশু ও পালনের মজুরি ইত্যাদিও যোগ করতে হবে। আর শিশুরা পরিবারে বিনা মজুরির কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকলে, শিশুশ্রমিক হিসাবে তাদের প্রাপ্য মজুরিটাও পারিবারিক বিনা মজুরির হিসাবের মধ্যে যোগ করতে হবে। যেভাবেই মাপা হোক, সমাজে সম্পদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে শ্রম বাজারের মজুরি শ্রমের তুলনায় বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের অবদানই বেশি বলে দেখা যাচ্ছে।

এই পর্যন্ত সম্পদ সৃষ্টিতে বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের ভূমিকার ও তার হিসাব নিকাশ করার প্রয়োজনের প্রসঙ্গ। এইবার সেই কাজ করার সম্ভাবনার কথা। এই কাজ তিনটি পর্যায়ে করা যেতে পারে।

উপসংহার

প্রথম পর্যায়

বিনা মজুরির পারিবারিক শ্রমের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নির্মাণে ও তার সমালোচনায় আগ্রহী সমাজ বিজ্ঞানীদের, পরিসংখ্যানবিদদের ও MEGA II চর্চাকারীদের গোষ্ঠী তৈরি করে সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকাশিত গ্রন্থনিবন্ধাদির সমীক্ষা করা। সেই সমীক্ষার অস্থায়ী ফলগুলি প্রকাশ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আরও বড় গোষ্ঠী তৈরি করে বিভিন্ন দেশের সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা। সেই অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের অস্থায়ী ফলাফল প্রকাশ করা।

তৃতীয় পর্যায়

পৃথিবীর সব দেশে নিয়মিত সময়ের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করা হয় না। এই কাজে সমগ্র জনসমাজের যোগদান সুনিশ্চিত করার জন্য, পৃথিবীর সব মানুষকে বা প্রায় সব মানুষকে সাক্ষর হয়ে অন্ততপক্ষে তাদের সাত দিনের ২৪ ঘণ্টার কাজের ডায়েরি লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এই গবেষণার সাথে, সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করার কাজে যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। আজ মোবাইল ফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করা নিরক্ষরদের ও সাক্ষরদের মধ্যে ২৪ ঘণ্টার সময়ের ব্যবহারের ক্ষেত্র সমীক্ষা করা যেতে পারে (কেলি ও অন্যরা, ২০১৫)। এই কাজ করার পথে মানব সমাজে, বিশেষ করে বিনা মজুরির শ্রমের নিয়োজিত মেয়েদের ও শিশুদের মধ্যে ভাষা, গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত যুগোপযোগী শিক্ষাও বাড়বে (দ্য আম্ব্রোসিয়ো, ১৯৯৮; বকশি, ২০১২এ)।

[কৃতজ্ঞতা : শঙ্কর রায় ও নিত্যানন্দ ঘোষ]

অর্থনীতি

বাজেট অথবা না-বাজেটের গল্প

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

প্রতি বছর বাজেট নিয়ে একটা সোরগোল ওঠে। এ নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলির উৎসাহ বেশি। অধুনা টিভির মরা গাঙে টিআরপি আনতে বাজেট একটি মোক্ষম উপায়। বাজেট নিয়ে এত হৈ-হট্টগোলের শুরু সেই নব্বই দশকের শুরুতে যখন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তাঁর উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক প্রয়াসগুলিকে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করছেন ও টিভিতেও তার সরকারি সম্প্রচার শুরু হয়েছে। বাজেটে তখন আগ্রহ ছিল আয়করের নতুন বিন্যাস ঘোষণা ও অপ্রত্যক্ষ করের বাড়া-কমার ওপর। জিএসটি চালু হওয়ার পর দু-একটি পণ্য বাদ দিয়ে (পেট্রোপণ্য, মদ ইত্যাদি) অপ্রত্যক্ষ করের বিন্যাসে বাজেটের আর কোন ভূমিকা নেই (বিদেশি পণ্য আমদানির ওপর শুল্ক ব্যতিরেকে)। তবুও বাজেট নিয়ে একটা হৈ হৈ ভাব চলে। বাজেট পেশের দুদিন পরে তা আবার মিলিয়েও যায়।

আসলে বিষয়টা অন্যত্র। কারণ, অর্থনীতির গতিপথ বাজেট-নির্ভর নয়। তা নীতিসমূহের আলয়ে কতকটা নীরবে চলাচল করে। আর তা চলে সারা বছর ধরেই। তাই, বাজেট আলোচনার যা কিছু তা বাজেটের দিনেই ফুরিয়ে আসে। ওই, আয়করের (ব্যক্তিগত ও কোম্পানিগত) কিছু চাপানউতোর ছাড়া। তবে দেখা গেছে, আয়করেরও কিছু বিন্যাস বছরের যে কোনও পর্যায়েই হতে পারে। তাই, বাজেট ২০২০ নিয়ে বলার চেয়েও বর্তমান শাসকের অর্থনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়ে কিছু কথা বলতে পারলে তা সদর্থক হতে পারে। তবে, এবার বাজেটে আয়করে দ্বৈত ব্যবস্থা এনে অর্থমন্ত্রী খানিক চমক দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাকে আনার পেছনে এক সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যও আছে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি কেন্দ্রে বিজেপি'র সরকার না থেকে কংগ্রেস না অন্য কোনও মিলিজুলি সরকার থাকত, তাহলেও কি বাজেট একই ধরনের হত? প্রশ্নটি খুব সোজাসাপ্টা কিন্তু এর উত্তর মনে হয় বেশ জটিল। তাই যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সরকারে কে বা কারা অধিষ্ঠিত আছে তার ওপরে সরকারের অর্থনৈতিক নীতিভাবনা অনেকটা নির্ভর করে। কথাটা কিছুটা ঠিক আবার সম্পূর্ণত ঠিক নয়।

এইসব হেঁয়ালি ছেড়ে বিষয়ের অভ্যন্তরে বরং প্রবেশ করা যাক। আয়করের এই দ্বৈত ব্যবস্থা কেন চালু করা হল? উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। এক ঝটকায় যদি পুরনো ব্যবস্থা ছেড়ে নতুন ব্যবস্থা লাগু করা হত তাহলে সমাজে ব্যাপক আলোড়ন উঠত। তাই দুই-ব্যবস্থা রাখা হল যাতে করদাতারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কারণ, আনকোরা যা কিছু তা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা হল, পুরনো সঞ্চয়মুখি ব্যবস্থা থেকে মানুষজনকে ব্যয়মুখি ব্যবস্থায় এনে ফেলা। অর্থাৎ, ফেল কড়ি মাখো তেল। অর্থমন্ত্রী তা ঠারেঠোরে স্বীকারও করেছেন। সরকারের তরফে সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করে করদাতাদের ব্যয়মুখি, ভোগমুখি ও বিনিয়োগমুখি করে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আয়ের যে অংশ ভোগব্যয়ে লাগল, বাকীটাকে সঞ্চয়ের ঘরে পাঠিয়ে অলস করে রাখা নয় (যা সুদ অর্জন করে), বরং সরাসরি বাজারে এনে ফেলা (শেয়ার, বন্ড) ও বাড়তি আয়ের চেষ্টা করা। কারণ, শেয়ার বা বন্ডে বিনিয়োগ করলে মুনাফা হলে ভাল, কিন্তু লোকসানেরও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, সক্রিয় পুঁজি গঠনে সকলকে সামিল করে নেওয়া। এতে বাণিজ্যিক অধিপতিদের সুবিধা এই যে, তাঁরা অর্থকরী সংস্থা থেকে সুদ-বিশিষ্ট ঋণ না নিয়ে বাজার থেকেই সরাসরি বড় পরিমাণে পুঁজি পেয়ে যেতে পারেন। এটা একটা অর্থনৈতিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার ভাবনা থেকেই এই দ্বৈত করব্যবস্থার পত্তন। এতে কর্পোরেট ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির পুঁজি সংগ্রহে সুবিধা হবে।

কিন্তু, দেশের অর্থমন্ত্রী কি সামান্য এইটুকু বুঝছেন না যে অর্থনীতির বর্তমান তীব্র সমস্যাটা লুকিয়ে আছে চাহিদার তলানিতে। অথচ বাজেটে এ নিয়ে তাঁর কোনও নিদান নেই। তিনি অর্থনীতির ছাত্রী, না বোঝার কোনও কারণই নেই কিন্তু তিনি বুঝেও বুঝছেন না! কেন? কারণ, তার মাথার ওপর গুরুমশাই বিজেপি'র তাত্ত্বিক খড়্গ ঝুলছে যেখানে অর্থনীতির একটি আদর্শগত বয়ান আছে। সেই বয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল ব্যবসায়ীদের (ট্রেডার) স্বার্থ দেখে রচিত, যা বিজেপি দলের মূল ভিত্তিভূমি। এই রক্ষণশীল ব্যবসায়ীদের মনোভাব একেবারেই চাহিদা-নির্ভর ব্যবসার প্রসারের পক্ষে নয়, বরং যা চলছে তার ওপর কর কমানো ও অসৎ উপায়ে অধিক লাভের বাসনা-প্রসূত। এই রক্ষণশীল মনোভাবই আজকের ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থবিরতায় পৌঁছে দিয়েছে। ছোটবেলায় আমরা শুনতাম, 'ইধার কা মাল উধার, উধার কা মাল ইধার'। রক্ষণশীল ট্রেডারদের লক্ষ্মীলাভ এই পথেই। কিন্তু মনোভাবটা অমন হলেও অর্থনীতির তো এতকাল ধরে গড়ে ওঠা একটা শরীর ও তার কার্যব্যবস্থা আছে; যা দিয়ে অর্থনীতিটা চলছে আবার তার ভিতরে দ্বন্দ্বও তৈরি হচ্ছে। আর আজ অর্থনীতির কার্যাবলী যেহেতু বিশ্ব ব্যাপী, প্রযুক্তি-নির্ভর ও ভার্চুয়াল, তাই বহু কাজ বিশ্ব অর্থনীতির টানে ও আঙিনাতেই সমাধা হয়ে থাকছে। কর্পোরেটদের তাই তেমন মাথাব্যথার কোনও কারণ নেই। বিপদে পড়ছেন ছোট ব্যবসায়ী, ছোট উৎপাদক ও আমজনতা, বিশেষত গ্রাম-শহরের গরিব ও প্রান্তিক মানুষেরা। এঁদের হাতে পুঁজির জোগান কম, চাহিদার অভাবে বিক্রিও তথৈবচ, দিনান্তে, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কাজের তীব্র অভাব, আর তা ক্রমশই এক দুষ্ট চক্রের রূপ ধারণ করছে, যেখানে কর্মহীনতা, চাহিদাহীনতা ও সম্ভাব্য লগ্নি পরস্পরের সঙ্গে লিপ্ত থেকে সমগ্র অর্থনীতিকে তলানিতে নিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অসীমা গোয়েলও এই ভয়ার্ত ছবিটির কথা সম্প্রতি বলেছেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে অর্থনীতির অবস্থা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী একবারের জন্যও তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ভারতীয় অর্থনীতির 'স্তিমিত' হয়ে আসার প্রসঙ্গটি উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তিনি এও বলেছেন যে এই বাজেটে কোনও দিশাও নেই। যে কারণে বাজেট এক চর্বিত-চর্বণ, অসার ও সম্বৎসরের নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। সেই একই কারণে তা নিয়ে চর্চারও তেমন অবকাশ কিছু নেই। কারণটি হল, অর্থনীতির টিকিটি বাঁধা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ও নাগপুরের সদর দফতরে। সেখান থেকেই অর্থনীতির নীতি ও রথ দুইই চালিত হচ্ছে। সেখানে অর্থনীতি যত না আছে তার থেকে বেশি রাজনীতি, ধর্ম, পেশী ও খেয়ালখুশি ভেল্কিবাজীর উপস্থিতি।

তবে আমাদের দেশ যেহেতু খানিকটা ফেডারেল ধাঁচের ও রাজ্যগুলির হাতে কিছু অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেই সুবাদে বেশ কিছু রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কৃষি ঋণ ও অনুদান সহ সমাজের নানা শ্রেণি ও স্তরের মানুষের জন্য গত ২০-২৫ বছরে ধীরে ধীরে নানাবিধ প্রকল্প চালু হয়েছে যা কতকটা প্রান্তিক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে কিছুটা তো সাহায্য করেইছে, সার্বিক ভাবে না হলেও। তাই অর্থনীতির উন্নয়নে রাজ্যগুলির ভূমিকা কী হতে পারে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে সামগ্রিক অর্থনীতির ছবি পাওয়া বেশ দুষ্কর। তাই বাজেট নিয়ে আলোচনাটাই নিরর্থক যদি না কিছু চমক থাকে, যেমন এবারে ছিল দ্বৈত করব্যবস্থার পত্তন। সম্ভবত এবারের বাজেটে আরও এক চমক; দীর্ঘতম ভাষণ হিসেবে অর্থমন্ত্রী তাঁর পূর্বসূরীদের বাজেট ভাষণের রেকর্ড ভাঙ্গনের, যা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেও শেষাবধি পেরেছেন। তো, সেও এক আমোদ বিশেষ।

অর্থনীতির হালহকিকৎ

● রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্ট (২০১৮-'১৯) :
ঝুঁকি সামলানোর ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের ঘাটতি সামলানোয়। আর্থিক সংস্থান অনেক কমে দাঁড়িয়েছে ৬৪ কোটি টাকায়। অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়েছে। ব্যাঙ্ক প্রতারণা আগের বছরের থেকে ৭৩.৮% বেড়েছে। বাজারে নগদে লেনদেন বেড়েছে ১৭%। পারিবারিক সঞ্চয় কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.২%। হায় বিমুদ্রাকরণ!

● ব্যাঙ্কের সংযুক্তি :
ব্যাঙ্কের অর্থভাণ্ডারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও কেন্দ্রীভূত করতে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের সংযুক্তি হয়েছে। (১) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মিশে গেছে। (২) কানাড়া ও সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক। (৩) ইউনিয়ন, অন্ধ্র ও কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক। (৪) ইণ্ডিয়ান ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক।

● জিএসটিতে প্রতারণা :
প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। অক্টোবর '১৯ উৎসবের মরশুমে জি.এস.টি. সংগ্রহ হ্রাস ৫.১৯%।

● ইংলিশ প্রিমিয়াম লীগে লাভের বহর :
গত আর্থিক বছরে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ফুটবল দল লাভ করেছে ৬২৭.১ মিলিয়ন পাউণ্ড (৫,৫৬০ কোটি টাকা)।

● ব্রিটেনের থমাস কুক বন্ধ :
১৮৪১ তে শুরু হওয়া ব্রিটেনের নামী ভ্রমণ সংস্থা থমাস কুক বন্ধ হয়ে গেল। মূলত ব্রেক্সিট ঘিরে অচলাবস্থা, আর্থিক মন্দা, চাহিদা কমা, ইন্টারনেটে সবার জন্য বিমানের টিকিট ও হোটেল বুকিংএর সুবিধা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপবৃদ্ধি, স্টার্টআপ কোম্পানিগুলির আগমন প্রভৃতি সংস্থাটির বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ। এরপর করোনা অতিমারীর থাবায় প্রবলভাবে ধাক্কা খেল পর্যটন ও পরিষেবা শিল্প। একে একে বন্ধ হয়ে গেল নামী নামী পর্যটন সংস্থা, হোটেল, পরিবহন সংস্থা।

● ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সালতামামি :
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ২০০৯-'১৯ দশকে মোট ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পরিমাণ ২.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। ১৯১৮-'১৮এ ৭১, ৫৪৩ কোটি ও ২০১৯-'২০-র প্রথম তিনমাসে ৩১,৮৯৯ কোটি টাকা। সবচাইতে বেশি স্টেট ব্যাঙ্ক (১,১৯৭ কোটি), তারপর এলাহাবাদ ও পিএনবি মিলিতভাবে ২,৮৫৫ কোটি।

● এফ ডি আই সমর্থন, ডলারে ঋণ নেওয়ার বিরোধিতা আর.এস.এসের :
বিজয়া দশমীতে দেওয়া বার্ষিক দিশারী বক্তৃতায় আর.এস.এসের মুখ্য সরসঙ্ঘ সঞ্চালক মোহন ভাগবত এইচ সি এল প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান শিব নদরকে পাশে বসিয়ে দেশের স্বার্থে এফ.ডি.আইকে পূর্ণ সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি আর.এস.এসের আর্থিক শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক অশ্বিনী মহাজন ডলারে ঋণ নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কারণ ঋণের সুদ এবং ডলারের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রকৃত সুদ অনেক বেড়ে যাবে।

● ই-কমার্স ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর করের দাবী :
আর.এস.এসের স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এবং প্রধান ভোটব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি দাবী তুলেছে ই-কমার্স ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপর কর বসাতে হবে। গুগল, মাইক্রোসফট, ফেসবুক প্রভৃতি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ভারত থেকে প্রচুর মুনাফা করলেও কোন কর দেয় না। এছাড়া আমাজন প্রভৃতি সংস্থা বিদেশের সার্ভারে তথ্য রেখে বিদেশ থেকে ব্যবসা করে বিপুল মুনাফা করে। ভারত থেকে নেওয়া বিজ্ঞাপন থেকে প্রচুর আয় করে। অথচ কোন করই মেটায় না। উপরন্তু প্রচুর ছাড় দিয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের পথে বসিয়ে শহর ও মফস্বলগুলির বাজার দখল করে গ্রামের দিকেও হাত বাড়াচ্ছে। তাদের উপর কর বসালে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের রক্ষা করা যাবে এবং বছরে সরকারের ন্যূনতম এক লক্ষ কোটি টাকা আয় হবে। কিন্তু মোদী সরকার নিশ্চুপ।

● সুদ কমিয়েই চলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আর্থিক বৃদ্ধি আরও কম: ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরে পাঁচবার রেপোরেট (স্বল্প মেয়াদে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে সুদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয়) কমিয়ে মোট ১৩৫ বেসিক পয়েন্ট কমালো।

● শিল্পোৎপাদন হ্রাস :

আগস্ট '১৮ থেকে আগস্ট '১৯ ১.১% হ্রাস।

● পূর্বাভাস ছাঁটল বিশ্বব্যাঙ্ক :

বিশ্বব্যাঙ্ক ২০১৯-'২০ আর্থিকবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৭.৫% ভেবেছিল, ভারতের অর্থনীতির হাল দেখে অক্টোবর '১৯ এ পুনর্মূল্যায়ন করল তা ৬% এও পৌঁছবে না।

● জি.এস.টি আদায় কম (কোটি টাকায়) :

এপ্রিল '১৯	১,১৩,৮৬৫
মে	১,৫০,২৮৯
জুন	৯৯,৯৩৯
জুলাই	১,০২,০০০
আগস্ট	৯৮,২০২
সেপ্টেম্বর	৯১,৯১৬

● উৎসবের সময় গাড়ি বিক্রি হ্রাস :

সংস্থা	সেপ্টেম্বর '১৮	সেপ্টেম্বর '১৯
● মারুতি সুজুকি	১,৫১,৫১২	১,১৫,৪৫৪
● হুণ্ডাই	৪২,৪৭২	৪৫,৭৫৫
● মাহীন্দ্রা	১৯,৯৩১	১৩,৯৬৭
● টয়োটা	১২,৫১২	১০,২০৩
● হোন্ডা	১৪,৮৬৬	৯,৩০১

গাড়ি বিক্রি কমল বাণিজ্যিক গাড়ি ৩৯%, প্যাসেঞ্জার কার ৩৩.৪৫%, প্যাসেঞ্জার ভেহিকেল ২৩.৬৯%, মোটরসাইকেল ২৩.২৯%,। ২০১৮-র থেকে '১৯এ সারাদেশে গাড়ি বিক্রি কমেছে ১৫%, পশ্চিমবঙ্গে ৩৯%।

● রঘুনাথ রাজন উবাচ :

রাজকোষ ঘাটতির বিষয়ে অনেক তথ্য লুকোনো আছে। আসলে সেই অঙ্কে অনেক বেশী রাজস্ব আদায় নিয়ে প্রচুর আশার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বাড়তি ধার করা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন খোদ অডিটর জেনারেল। জোরালো আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অর্থনীতি দিশা হারাচ্ছে। দেশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে। নোট বাতিল, খুবই খারাপ পরিকল্পনা। জিএসটির রূপায়নও দুর্বল। এই দুই সিদ্ধান্ত ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

● চীন-ভারত বাণিজ্য ঘাটতি :

১৯০৭-'০৮ থেকে '১৭-'১৮তে সরসারিভাবে বাণিজ্য বেড়েছে ৫, ২০০ কোটি ডলার। চীন থেকে পণ্য আমদানি ৫,০০০ কোটি ডলার। ভারত থেকে রপ্তানি ২০০ কোটি ডলার। ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ৪০%। ভারতের ও বিশ্বের খেলনা বাজারের ৯০% ও ৪৫% চীনের দখলে। এছাড়া চোরা পথে এবং দাম কমিয়ে প্রচুর পণ্য চীন ভারতে পাঠায়।

● ফের ব্যাঙ্ক তছরূপ :

পাঞ্জাব অ্যান্ড মহারাষ্ট্র কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের (পিএসসি) ৪৫০০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি প্রকাশ পেল।

● আই.এম.এফের পূর্বাভাস :

ঝিমিয়ে পড়েছে বিশ্বের অধিকাংশ অর্থনীতি। সবথেকে প্রভাব পড়েছে ভারত ও ব্রাজিলে। ২০০৮এর থেকেও দীর্ঘ হবে এই মন্দা।

● আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সূচকে :

ভারত নেমে গেল আরও ১০ ধাপ নীচে। প্রথম সিঙ্গাপুর, দ্বিতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের স্থান ৬৮।

● বিশ্ব ক্ষুধাসূচকে অবতরণ :

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে দরিদ্র প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালকে ছাড়িয়ে ভারত পৌঁছল ১১৭টি দেশের মধ্যে ১০২ তম দেশে।

● অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের স্বামী অর্থনীতিবিদ পরকাল প্রভাকর কি বললেন :

সরকার অস্বীকার করলেও, নিরবিচ্ছিন্নভাবে সকলের সামনে আসা পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, একের পর এক ক্ষেত্র কিভাবে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে এই দল নিজস্ব নীতি তৈরি করার পরিবর্তে 'নেতি নেতি' (এটা নয় ওটা নয়) কে গ্রহণ করেছেন। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা নিয়ে সমালোচনা না করে বরং নরসিমহা রাও—মনমোহন সিংহের অর্থনৈতিক মডেলকে অনুসরণ করায় মন দিক সরকার।

● ভারতের মন্দা কাটানো নিয়ে অভিজিৎ বিনায়কের মত :

কর্পোরেট ট্যাক্স না কমিয়ে বাড়ানো। পিএম কিসান প্রমুখ সামাজিক প্রকল্পে অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি যাতে সাধারণ মানুষের হাতে অর্থের জোগান আসে এবং ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে।

● বিএসএনএল নিয়ে প্রস্তাব :

বিএসএনএল নিয়ে বিরোধীদের আশঙ্কা। দেশ বিদেশে ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে সমালোচনার পর কেন্দ্র বিএসএনএল ও এমটিএনএলের সংযুক্তির প্রস্তাব দিলেন। ৫০ বছরের বেশী কর্মীদের জন্য স্বেচ্ছা অবসর। নিলাম ছাড়াই বরাদ্দ ৪জি স্পেকট্রাম। কেন্দ্রের বরাদ্দ ২০,১৪০ কোটি টাকা। স্পেকট্রামের সিএসটি বাবদ ৩৬৭৪ কোটি টাকাও কেন্দ্রের বাজেট থেকে। পুনর্গঠন ও অন্যান্য খরচের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বন্ড ছেড়ে ১৫০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ। দুই সংস্থার সম্পত্তি বিক্রি করে ৩৮,০০০ কোটি টাকা আয়।

● হরিয়ানা ভোটের সময় কিছুটা মনমোহিনী :

পেট ও পকেটের টান যখন ধর্ম আর উগ্রজাতীয়তাবাদ দিয়ে আটকানো যাচ্ছে না তখন হরিয়ানা ভোটের সময় কেন্দ্র সরকার দিল্লির সব বেআইনি কলোনিকে মান্যতা দিল এবং রবিশস্যের সংগ্রহমূল্য ৫০% থেকে ১০৯% বাড়ালো।

● কয়েকটি কুখ্যাত আর্থিক কেলেঙ্কারী :

- আই এল অ্যান্ড এফ এস কেলেঙ্কারী
- পি এন বি কেলেঙ্কারী
- বিজয় মাল্যর ব্যাঙ্ক তছরূপ কেলেঙ্কারী

● সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারী
● রোজ ভ্যালী চিঠফান্ড কেলেঙ্কারী
● অগস্তা ওয়েষ্টল্যান্ড ভিভিআইপি চপার কেলেঙ্কারী
● কোল ব্লক অ্যালেকেশন কেলেঙ্কারী
● আইএনএক্স মেডিয়া কেলেঙ্কারী
● এয়ারসেল ম্যাক্সিস কেলেঙ্কারী
● স্টারলিং বায়োটেক ব্যাঙ্ক তছরূপ কেলেঙ্কারী
● এভিয়েশন কেলেঙ্কারী
● আই সি আই সি-ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন লোন কেলেঙ্কারী
● ললিত মোদী এবং আইপিএল অর্থ তছরূপ কেলেঙ্কারী
● হাসান আলি খাঁন তহবিল তছরূপ কেলেঙ্কারী
● তামিলনাড়ু গুটকা কেলেঙ্কারী

● পোল্ট্রি শিল্পেও মন্দার ছাপ :

নোটবন্দী ও জিএসটি চালুর পর পোল্ট্রি ব্যবসায় আর্থিক সঙ্কট নেমে আসে। বর্তমান মন্দায় তা ঘনীভূত হয়। আরামবাগ হ্যাচারিজ সহ বেশ কিছু নামী ও জনপ্রিয় সংস্থার বেশ কিছু শাখায় 'নোটিস অফ ক্লোজার' ঝুলে যায়।

● সোনার হাইজ্যাম্প (১০ গ্রাম, ২৪ ক্যারেট, টাকায় গড় দাম ধনতেরাসে) :

২০১৫	২৭,১৮৫
২০১৬	৩০,৫৫০
২০১৭	২৯,৯১০
২০১৮	৩২,৪৭০
২০১৯	৩৮,৮৯০

● রাজকোষ ঘাটতি :

২০১৯-'২০ অর্থবর্ষের রাজকোষ ঘাটতি বছরের শেষে ৭.০৩ লক্ষ টাকার মধ্যে বেধে রাখার পরিকল্পনার প্রথম ছমাসেই ঘাটতি ৯৩% অর্থাৎ ৬.০২ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াল।

● বেকারত্ব বৃদ্ধি :

নোটবন্দীর পর ৬.১%, সেপ্টেম্বর '১৯ ৭.২%, অক্টোবর '১৯ ৮.৫%

● বিরল আচার্যের প্রেসক্রিপশন :

সরকারের ব্যয় নিয়ে আরও বেশী আলোচনা হওয়া উচিত। 'ইণ্ডিপেনডেনট ফিস্কাল মনিটর' ব্যবস্থা তৈরি করে স্বাধীনভাবে রাজকোষে নজরদারি চালানো উচিত। কোন প্রকল্প ঘোষণার দু মাসের মধ্যে অডিট করতে এবং আগামী পাঁচ বছরে সেটি কার্যকর করতে অর্থের সংস্থানের সূত্র বাতলাতে হবে। দেশের বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সারাজীবন ১০% হারে পণ্য কিনতে পারবে না। সেক্ষেত্রে চাহিদা বজায় রাখতে আরও অন্তত ২০-৩০ কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার উপরে তুলে আনতে হবে। এর জন্য চাই মূল্য বৃদ্ধি বাদে প্রকৃত আয় বাড়ানো, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য শ্রম ও কৃষিসংস্কার।

● আবাসন শিল্পে মানুষের সঞ্চয়ের টাকা :

আটকে থাকা আবাসন শিল্পকে চাঙ্গা করতে এল.আই.সি. স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকার ফান্ড, ঘোষণা কেন্দ্রের।

● মন্দাতে মন্দা কই :

আমেরিকান ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকনমিক রিসার্চের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন আর্থিক ত্রৈমাসিকে যদি আর্থিক কর্মকাণ্ড কমে যায়; কমে যায় জিডিপি, প্রকৃত আয়, কাজের সুযোগ, শিল্পোৎপাদন, পাইকারি ও খুচরো মূল্যবৃদ্ধির দর তাকে মন্দা বলে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর '১৯-র জিডিপি বৃদ্ধির হার নেমে এসেছে ৪.৫%এ। অক্টোবরে আটটি প্রধান পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উৎপাদন ৫.৮% কমেছে। অর্থবর্ষের প্রথম সাত মাসে রাজকোষ ঘাটতি পৌঁছেছে ৭.২ লক্ষ কোটি টাকা। এরপরও সরকারের দ্বিতীয় ব্যক্তি অমিত শাহ প্রকাশ্যে বলছেন মন্দা কই?

● বিলগ্নীকরণের বন্যা :

মোদি সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসে নীতি আয়োগের মাধ্যমে বিলগ্নীকরণের প্রথম তালিকা স্থির করেন। তার মধ্যে ছিল ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা যার অনেকগুলি সচল ও লাভজনক। ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকার 'বিপিসিএল', 'শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া', 'কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া', 'টিহরি জলবিদ্যুৎ নিগম' এবং 'নিপকো'র বিলগ্নীকরণ ঘোষণা করেছেন। বিরোধীরা তো বটেই আর.এস.এসের 'স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ' এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

● মোবাইল মাসুল বৃদ্ধি :

সরকারি সহায়তা, মাসুল কমিয়ে ও ব্যাপক প্রচারে মুকেশ আম্বানির জিও সংস্থা ভারতীয় মোবাইল ব্যবহারকারী বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের ধরে এবার ডিসেম্বর '১৯ থেকে মাসুল ৪২% বাড়িয়ে নিল। এছাড়াও কল ড্রপ প্রভৃতি পকেট কাটার কৌশলতো আছেই।

● গ্রামোন্নয়নে কোপ :

মোদিনমিক্সের দ্বিতীয় পর্বে ভারতের অর্থনীতি খারাপ হতে হতে স্থিতিস্ফীতিতে পৌঁছে গেছে। সমস্ত বিশেষজ্ঞরা যখন গ্রামের হাতে বেশী করে টাকা জোগানোর কথা বলছেন তখন মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনা, পি.এম. কিষান প্রভৃতি গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প কাটছাঁট শুরু করলেন।

● ২০১৯-'২০-র কক্ষচ্যুতি :

বিষয়	সরকারের ঘোষিত টার্গেট	বাস্তব
● বিলগ্নিকরণ থেকে আয়	১.০৫ লক্ষ কোটি	৬০ হাজার কোটি
● কর থেকে আয়	২৪.৬১ লক্ষ কোটি	১৫.৪৯ লক্ষ কোটি
● প্রত্যক্ষ কর থেকে আয় বৃদ্ধি	১৩.৩৫ লক্ষ কোটি	(১৩%)
● পরোক্ষ কর থেকে সংগ্রহ	১১.১৯ লক্ষ কোটি	৬.১২ লক্ষ কোটি
● কর্পোরেট কর থেকে আয়	১৩.৩৫ লক্ষ কোটি	১.৪৫ লক্ষ কোটি
● মাসিক জিএসটি আয়	১.২৫ লক্ষ কোটি	১.০৩ লক্ষ কোটি
● রাজকোষ ঘাটতি	৩.৩%-র মধ্যে	১১৫% (প্রথম ন মাস)

● পূর্বাভাস :

মন্দা চলবে, বিনিয়োগে বৃদ্ধির হার ১৫ বছরে সর্বনিম্ন, নতুন যন্ত্রাংশে গত ৫০ বছরে সর্বনিম্ন। পুঁজির বিনিয়োগ দু দশকে সবচাইতে কম। ব্যাপক রাজকোষ ঘাটতি। আয়ের নিম্নগতি।

● ছয় বছরে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি :
ডিসেম্বর '১৯এ জনতার ব্যবহৃত পণ্য-পরিষেবায় মূল্যবৃদ্ধি ৭.৩৫% এ পৌঁছে গত ছয় বছরে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। বৃদ্ধির হার নেমে গেছে গত ১১ বছরের সর্বনিম্ন ৫%-র কাছাকাছি।

● জি এস টি জালিয়াতিতে এগিয়ে বাংলা :
ভুয়ো সংস্থা খুলে জিএসটি জালিয়াতিতে কলকাতা অগ্রগণ্য। নভেম্বর অবধি ৫৫৪১টি জালিয়াতিতে ৭১৬৪টি সংস্থার নাম জড়িয়েছে।

● বেকারত্বের শ্রীবৃদ্ধি (সূত্র : এন. এস. এস. ও.) :
নোটবন্দির ঠিক পরপরই বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ ৬.১%। তারপর থেকে বেড়েই চলেছে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর '১৯এ বেড়েছে ৭.৫%

২০১৯ মাস	গ্রামে	শহরে	দেশে
জুলাই	৬.৯০	৮.৩০	৭.৩৪
আগস্ট	৭.৪৮	৯.৭১	৮.১৯
সেপ্টেম্বর	৬.০০	৯.৫২	৭.১৬
অক্টোবর	৮.০২	৮.২৭	৮.১০
নভেম্বর	৬.৪৫	৮.৮৮	৭.২৩
ডিসেম্বর	৬.৯৩	৯.০২	৭.৬০

● কাজের সুযোগ তৈরিতে পেছিয়ে ভারত (সূত্র : রাষ্ট্রপুঞ্জের সামগ্রিক বিষয়ক রিপোর্ট) :
ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে জনসংখ্যার ৩৩% মানুষ শিক্ষা, কাজ বা কোনও প্রশিক্ষণে যুক্ত হন, ভারতে তা ৪০%-র বেশি।

● রাজ্য বাজেটে চা শিল্প :
আগের দুই অর্থবর্ষে চা বাগানগুলিকে কৃষি আয় করে ছাড় দেয় রাজ্য। মুনাফার উপর ওই করের হিসাব কষা হয়। ২০২০-'২১ ও ২০২১-'২২এও তা মকুব হল। চা-বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের আবাসন প্রকল্প—চা সুন্দরী গড়বে রাজ্য। তার জন্য বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা।

● কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ করে কোপ (এপ্রিল '১৯ থেকে ১৫ জানুয়ারি '২০) :
● কর্পোরেট করে আদায় ৩.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা
● ব্যক্তিগত আয় করে আদায় ৩.৩ লক্ষ কোটি টাকা
● অন্যান্য করে আয় ৯,০০০ কোটি টাকা
● সব মিলিয়ে (প্রত্যক্ষ কর আদায় ৭.২৫ লক্ষ কোটি টাকা)
● গতবারের চাইতে ৬.১% কম

● আবিশ্ব কাজের হাহাকার :
ভারতে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর '১৯এ বেকারত্বের হার বেড়ে ৭.৫% (সি. এম. আই.)। যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৬০%। ২০১৭-র মে-আগস্টের পর টানা সাতবার বাড়ল। বিশ্বে বেকারের সংখ্যা ১৮.৮০ কোটি (আই.এল.ও.)। অনেক কম মজুরিতে কাজ করছেন ১৬.৫০ কোটি শ্রমিক। একবারের জন্যও কাজ পাননি ১২ কোটি। সব মিলিয়ে কর্মসঙ্কটে ৪৭ কোটি। বছরে বেকারত্ব বৃদ্ধি ২৫ লক্ষ।

● রাজ্যের রাজকোষে বিপুল ঘাটতি (কোটি টাকায়) :

সাল	রাজস্ব ঘাটতি	আর্থিক ঘাটতি
২০১৭-'১৮	৯,৮০৬	২৮,৯৩০
২০১৮-'১৯	১০,৩৯৮	৩৩,৪৮৫
২০১৯-'২০	১৮,৫৬১	৩৬,৩৬৫

● করোনা আবহে ভারতে লকডাউনের প্রথম তিনমাসের অর্থনৈতিক ফল :
আর্থিক বৃদ্ধি ২০১৯-'২০-র চতুর্থ তিনমাসে ০৩.১এর নিচে নেমে যাওয়া। বেকারত্ব বৃদ্ধি ৬.৭১%, ১৪ কোটি মানুষের কাজ হারানো। সরকারি আয় কমে যাওয়া, সরকারের ক্ষতি ৩২ হাজার কোটি টাকা। খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জোগান হ্রাস কারণ বহু কলকারখানা ও সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবারগুলোর আয় ৪৫% হ্রাস, ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া। পর্যটন ও পরিষেবা শিল্পর মৃত্যু।

● নীরব বেসরকারিকরণ :
লকডাউন, কার্ফু ও করোনা অতিমারী আতঙ্কের মধ্যে মোদী সরকার নীরবে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বিক্রি করে দিচ্ছে। ভারত পেট্রোলিয়ামের (বিপিসিএল) ৫২.৯৮% অংশীদারিত্ব বেচা হচ্ছে।

● মূল্যবৃদ্ধি বৃদ্ধি, শিল্পোৎপাদন হ্রাস :
প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ লক্ষ কোটি ডলার অর্থনীতি তৈরি স্বপ্ন ছারখার। ডিসেম্বর '১৯ এ শিল্পোৎপাদন কমেছে ০.৩%, জানুয়ারি '২০তে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি ৭.৫৯%। বিগত ৬৮ মাসে সর্বাধিক। ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রান্নার গ্যাসের দাম ১৪.২ কোজি সিলিন্ডার পিছু এক লাফে ১৪৯ টাকা বাড়ানো হল।

● চা বাগানে ভর্তুকি বৃদ্ধি :
২০১৯-'২০ বাজেটে উত্তরবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের চা বাগানগুলি খাতে ভর্তুকি ২১.১৪ কোটি টাকা বেড়ে টি বোর্ডের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৯৭.৬৪ কোটি টাকা।

● কেন্দ্র বাজেটে ক্রমাগত শিক্ষায় বরাদ্দ হ্রাস :

বছর	মোট ব্যয়ের অনুপাত (%)	জিডিপির অনুপাত (১%)
২০১৪-'১৫	৪.১৪	০.৫৩
২০১৫-'১৬	৩.৭৫	০.৫০
২০১৬-'১৭	৩.৬৫	০.৪৭
২০১৭-'১৮	৩.৭৪	০.৪৮
২০১৮-'১৯	৩.৪০	০.৪৪
২০১৯-'২০	৩.৪০	০.৪৫
২০২০-'২১	৩.২৬	০.৪৪

● ২০২০-'২১ বাজেট এক নজরে :

ক্ষেত্র	কোন সালে কত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	
	১৯১৯-'২০	১৯২০-'২১
প্রতিরক্ষা	৩,০৫,২৯৬	৩,২৩,০৫৩
পেনশন	১,৮৪,১৪৭	২,১০,৬৮২
কৃষি ও সংশ্লিষ্ট	১,২০,৮৩৫	১,৫৪,৭৭৫
শিল্প ও বাণিজ্য	২৮,৬০৮	২৭,২২৭
শিক্ষা	৯৪,৮৫৪	৯৯,৩১২
বিদ্যুৎ	৪২,৪৫৮	৪২,৭২৫

আর্থিক বিষয়ক	২৪,৮৮০	৪১,৮২৯
স্বাস্থ্য	৬৩,৮৩০	৬৭,৪৮৪
স্বরাষ্ট্র	১,২৪,০৮৩	১,১৪,৩৮৭
সুদ	৬,২৫,১০৫	৭,০৮,২০৩
তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম	১৬,০০০	৫৯,৩৪৯
গ্রামোন্নয়ন	১,৪৩,৪০৯	১,৪৪,৮১৭
সমাজকল্যাণ	৪৮,২১০	৫৩,৮৭৬
রাজ্যগুলির বরাদ্দ	১,৫৫,৪৪৭	২,০০,৪৪৭
পরিবহন	১,৫৮,২০৭	১,৬৯,৬৩৭
নগর উন্নয়ন	৪২,২৬৭	৫০,০৪০
অন্যান্য	৭৬,৭৮২	৮৪,২৫৬
	ভর্তুকি	
সার	৭৯,৯৯৮	৭১,৩০৯
খাদ্যশস্য	১,০৮,৬৮৮	১,১৫,৫৭০
পেট্রোলিয়াম	৩৮,৫৫৯	৪০,৯১০
	কর ব্যবস্থা	
জিএসটি ক্ষতিপূরণ	১,২১,২০০	১,৩৫,৩৬৮

● ইয়েস ব্যাঙ্কের ডুব :

মোদি জমানায় পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের পর ধসে পড়ল ইয়েস ব্যাঙ্ক। যেখানে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস্ এর বেশিটাই ৩১ হাজার কোটি টাকা মোদি ঘনিষ্ঠ, অনিল আম্বানি গোষ্ঠির অনাদায়ী ঋণ। ক্ষমতার অলিন্দে অবাধ ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাঙ্ক ইয়েস ব্যাঙ্কের কর্ণধার রাণা কাপুর অনেকদিন ধরেই ব্যাঙ্কের অর্থ সরাচ্ছিলেন। এবার এই ইয়েস ব্যাঙ্ককে উদ্ধার করতে সরকারি নির্দেশে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে ঢালা হল আপনার আমার ১১,৭৬০ কোটি টাকা।

● ঋণ খেলাপির সালতামামি (অর্থমন্ত্রক ১৬ মার্চ ২০২০, কোটি টাকায় :

প্রথম ১০ জন শিল্পপতির থেকে মোট অনাদায়	৬৫,১৬৭
প্রথম ১০টি ব্যাঙ্কের পাওনা	৫৪,৪০৩
ব্যাঙ্ক	**পাওনা**
পি এন বি	১৩,৪৭৩
এস বি আই	১৩,৪৩২
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৬,৫০৪
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	৫,১৮৮
কানাড়া ব্যাঙ্ক	২,৯৩৯
ইউকো ব্যাঙ্ক	২,৮৮৯
ওভারসিজ ব্যাঙ্ক	২,৭৫৩
আই ডি বি আই	২,৫৭১
অন্ধ্র ব্যাঙ্ক	২,৩৩০
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	২,৩১৪

● মহিলা কর্মীর সংখ্যা হ্রাস :

লকডাউনের আগেই ভারতে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। ২০০৬ এর তুলনায় ২০২০তে (মার্চ অবধি) মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৩৪% থেকে ৯.২% কমে হয়েছে ২৪%।

● বেসরকারি পুঁজি এবার সবক্ষেত্রে :

করোনা ও লকডাউনের বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়াতে সকলের প্রত্যাশা ছিল দরিদ্রদের অ্যাকাউন্টে অর্থ জোগবেন কেন্দ্র সরকার। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা সেরকমই পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সে পথে না হেঁটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ১৭ মে পঞ্চম দফায় ত্রাণ প্রকল্প ঘোষণায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তা আরও সুগম করলেন। তিনি যা ঘোষণা করলেন তার নির্যাস : (১) সমস্ত ক্ষেত্রের দরজা বেসরকারি পুঁজির জন্য খোলা। কোন ক্ষেত্রকে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জন্য তুলে রাখার দিন শেষ। (২) কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের তালিকা ঘোষণা করে হবে। যার প্রত্যেকটিতে থাকবে ন্যূনতম একটি এবং সর্বাধিক চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা। বেসরকারিকরণ, একাধিক সংস্থা মেশানো ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যা কমানো হবে। টক্কর বেসরকারি সংস্থার সঙ্গেও। (৩) বাকি সব ক্ষেত্রে থাকবেই না রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। সময় ও সুযোগ বুঝে হবে বেসরকারিকরণ।

● নকল কারবারে ক্ষতি :

ভারতে নকল পণ্যের দাপট বাড়ছে। করোনা থাবায় তা আরও বেড়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯তে বেড়েছিল ২৪%। ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রতি বছরে এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি।

● চর্ম শিল্পে ধাক্কা :

২০১৯ এপ্রিল-মে তে রপ্তানি ৫২৭১ কোটি টাকা, এ বছর ৯৭৪ কোটি টাকা।

সংকলন : বুনো রামনাথ

রাজ্য বাজেটে 'হাসির আলো'

নতুন	আগের
● গ্রাম ও শহরে অতি গরীব পরিবারে তিন মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ নিখরচায়	● তিন মাসে ৭৫ ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ খরচ হলে, ইউনিট পিছু মাসুল গুনতে হয় ৩.৩৭ টাকা
● তবে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ হলেই মাসুলের আওতায় পড়ে যাবেন গ্রাহক	● সঙ্গে মিটার ভাড়ার মত অল্প কিছু স্থায়ী খরচ
● এর আগে রাজ্যে সকলের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হয়েছিল গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্প	● লাইনে লোড থাকে ০.৩ কেভিএ ● বিদ্যুতের খরচ ৭৫ ইউনিট ছাড়িয়ে গেলে প্রতি ইউনিটে মাসুল হয় ৫.৫৬ টাকা

অর্ধেক আকাশ

আলোকবর্তিকা হেলেন কেলার

সুপর্ণা চৌধুরি

কবিগুরু বলেছিলেন, "যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো / জ্বালাও আলো, আপন আলো শুনাও আলোর জয় বাণী রে"।

কবির এই কথার সাথে যেন তাঁর জীবনদর্শন একাত্ম হয়ে যায়। ঘোর অন্ধকার ও নৈঃশব্দের জগতে থেকেও তিনি আপন আলো জ্বালিয়ে ছিলেন, বিশ্বকে আলোর জয়বাণী শুনিয়েছিলেন। তিনি হেলেন কেলার। দৃষ্টিহীন, মূক-বধির হয়েও তিনি শিক্ষার আলোয় ও আত্মবিশ্বাসের যষ্টিতে ভর করে জীবনের মূল স্রোতে ভেসে ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ১৮৮০ সালের সাতাশে জুন আমেরিকার টাস্কাম্বিয়ায় হেলেন কেলারের জন্ম হয়। তাঁর বাবা আর্থার কেলার এবং মা ক্যাথরিন। বাবা ছিলেন সামরিক বিভাগের কর্মচারী। সুস্থ, স্বাভাবিক শিশু হিসেবেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হেলেন। বড়ও হচ্ছিলেন স্বাভাবিক নিয়মেই। নিজের

হেলেন কেলার

আত্মজীবনীতে হেলেন লিখেছেন, তিনি খুব ছোট বয়স থেকেই কথা বলতে পারতেন। মাত্র উনিশ মাস বয়সে পৌঁছে তিনি পরে যান এবং এক প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ জানান যে হেলেনের পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক আঘাতে ক্ষতিক্রস্ত হয়েছে। এরপর তিনি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারান। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শে শিক্ষিকা নিযুক্ত করে শিক্ষা জীবন শুরু হয় হেলেনের। ১৮৮৭ সালের ৩রা মার্চ কেলার পরিবারের বাড়িতে আসেন হেলেনের শিক্ষিকা অ্যানি সুলিভ্যান ম্যানসফিল্ড। অন্ধকারের নিকষ কালো ভেদ করে হেলেনের জীবনে প্রথম আলোর স্পর্শ নিয়ে আসেন তিনি। হেলেনের শিক্ষিকা এই মহিয়সী নারী হেলেনের জীবনের সঙ্গে জুড়ে ইতিহাস হয়ে যান। অ্যানির ভালবাসা, স্নেহ, যত্ন, সাহায্য, শিক্ষা ছাড়া হেলেন কেলার তাঁর জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারতেন না, হতে পারতেন না আলোর দিশারী। হেলেন কেলারের শিক্ষিকা অ্যানি সুলিভ্যান ছিলেন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্না। শৈশবে তিনি মাতৃপিতৃহীন হয়ে যান। পার্কিনস্ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিখ্যাত চিকিৎসকদের চিকিৎসা ও অস্ত্রপচার দ্বারা তিনি স্বাভাবিক দৃষ্টি লাভ করেন। তারপর থেকে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাকল্পে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন অ্যানি সুলিভ্যান ম্যানসফিল্ড।

পরিচয় পর্বে অ্যানি হেলেনকে মাতৃস্নেহে কাছে টানলেও প্রথমদিকে হেলেন তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। নানাভাবে অ্যানিকে আঘাত করতেন হেলেন। ধৈর্য্য ধরে কখনও শাসন, কখনও স্নেহ ও আদর দিয়ে তিনি হেলেনের মন জয় করেন। তারপর শুরু হয় হেলেনকে শিক্ষদান পর্ব। অ্যানি কোন বস্তুকে স্পর্শ করাতেন হেলেনকে। তারপর নিজের আঙুল দিয়ে হেলেনের হাতের পাতায় লিখে দিতেন বস্তুটির নাম। হেলেন স্পর্শানুভূতির সাহায্যে বুঝতেন বস্তুটির নাম, আকার ও আয়তন। এভাবে আঙুলের সাহায্যে লিখে হেলেন খুব তাড়াতাড়ি নিজের মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হন। পরে বিশেষ পদ্ধতিতে শুরু হয় অনুশীলন। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গুরু শিষ্যার নিবিড় অনুশীলনে হেলেন অস্পষ্ট কথায় নিজের মনের ভাব বোঝাতে সমর্থ হন। হেলেনের কথাকে অপরের বোধগম্য করে দিতেন অ্যানি।

হেলেন কেলার কুড়ি বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হন। হেলেনের সাথে ক্লাসে অধ্যাপকদের পড়ানো মনযোগ দিয়ে শুনতেন অ্যানি। পরে অ্যানি তা হেলেনের হাতে লিখে দিয়ে তাঁকে অনুভব করাতেন। এই অমানুষিক ক্লান্তিকর অনুশীলনকে পাথেয় করে হেলেন কেলার বি.এ. পাশ করেন সসম্মানে। সমস্ত কলেজের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। তেইশ বছর বয়সে হেলেন রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "The story of my life" এতে তিনি লিখেছেন, কিভাবে তাঁর শিক্ষিকা অ্যানি সুলিভ্যান শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস তথা আত্মবিকাশের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

হেলেন কেলারের কাছে জীবন ছিল গতিময় ও প্রাণবন্ত। নিজের অপূর্ণতাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অন্যের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার কাজে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। মানুষের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন হেলেন। তিনি লিখতেন সমাজতন্ত্রের কথা, মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কথা, খনি শ্রমিকের যন্ত্রণাময় জীবনের কথা। আত্মজীবনী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হেলেন কেলারের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কাউকে স্পর্শ করেই তাঁর মানসিক প্রকৃতি অনুভব করতে পারতেন হেলেন। তাকে নিয়ে বাড়তে থাকে নানা স্তরের মানুষের কৌতুহল।

হেলেন কেলার দিকে দিকে বক্তৃতার মাধ্যমে সচেতনতার

আলো ছড়িয়ে চলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল অন্ধ ও মূক-বধির শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং তাঁদের মনোবল তথা আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পদ্ধতি। হেলেনের বক্তৃতা সর্বজনগ্রাহ্য করে দিতেন তাঁর শিক্ষিকা অ্যানি।

অ্যানি সুলিভ্যান পরবর্তীকালে দৃষ্টিহীন হয়ে গেলে হেলেনের সাহায্যে এগিয়ে আসেন পলি টমসন নামে এক তরুণী। হেলেনের ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই পলি টমসনই হয়ে ওঠেন হেলেনের বিশ্বস্ত সঙ্গী।

আশ্চর্য এক ক্ষমতার অধিকারিনী ছিলেন হেলেন কেলার। তিনি কারও কণ্ঠ স্পর্শ করে কণ্ঠনালীর ওঠানামার উপলব্ধির মাধ্যমে তার প্রতিটি কথা বুঝতে পারতেন। তাঁর দীর্ঘাঙ্গী আকৃতি, ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করতো তাঁর কাছে আসা মানুষদের।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক ও টেলিফোনের অধিকর্তা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সাথে হেলেন কেলার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন দেশের সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে থাকেন হেলেন মূক-বধির শিশুদের উন্নতিকল্পে। দৃষ্টিহীনদের কল্যাণ ও সহযোগিতার কাজে বিভিন্ন সংস্থার আহ্বানে সাড়া দেন তিনি। গ্রাহাম বেলের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিহীনদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন হেলেন।

বিভিন্ন সংস্থায় যোগদান ও নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে হেলেন কেলার ক্রমশ উপলব্ধি করেন দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার্থে স্কুল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি এই ধরনের স্কুল গড়ে তুলতে থাকেন। বহু সম্মানীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। বহু মানুষ নানাভাবে অর্থ সাহায্য করেন হেলেনকে। হেলেন প্রায় পঞ্চাশটি স্কুল গড়ে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় থাকাকালীন পরিচিত হন হেলেনের সঙ্গে। তাঁকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''পৃথিবীর সবচেয়ে শুদ্ধ আর পবিত্র আত্মার প্রতিমূর্তি''। এই পবিত্র আত্মার প্রতিমূর্তি হেলেন কেলার সারা জীবন কর্মময় থেকেছেন মানুষের কল্যাণে। ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী হেলেন মনে করতেন যে, ঈশ্বর তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। তিনি মানুষকে অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ''অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'' ছড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আলোর দিশারী।

১৯৬৮ সালের ১লা জুলাই তাঁর কর্মময় জীবন থেকে ছুটি নিয়ে অমৃতধামে যাত্রা করেছিলেন আলোকবর্তিকা হেলেন কেলার।

[সৌজন্য : মুজনাই]

অ্যাসিড আক্রমণ ও বধূ নির্যাতনে শীর্ষে বাংলা

অ্যাসিড হামলার শিকার

রাজ্য	২০১৮	২০১৭	২০১৬	২০১৫	২০১৪
পশ্চিমবঙ্গ	৫৩	৫৪	৮৩	৪১	৪১
উত্তরপ্রদেশে	৪৩	৬০	৬১	৬১	৪৩
ওড়িশা	১৩	১৩	১৩	০৭	১০
অন্ধ্রপ্রদেশ	০৯	০৯	১১	১৪	০৬
কেরল	০৮	১৩	১৩	১০	০৪

বধূ নির্যাতন : ১৬,৯৫১; খুনের চেষ্টা : ১২,০৫২

আগুয়ান নারী

ছাত্র, সংখ্যালঘু প্রমুখদের উপর ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন অসংখ্য নারী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদফ জাফর, ঐশী ঘোষ, সূর্যা রাজপ্পন, স্বরা ভাস্বর, দীপিকা পাড়ুকোন, জয়তী ঘোষ, সুচরিতা সেন

ধর্ষণেও বাংলা কম না

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের সাথে পাল্লা দিয়ে ধর্ষণের সংখ্যা বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে। একের পর গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা আমাদের হতবাক করে দিচ্ছে। এন.আই.এ.-র ২০১৮ সালের নথি জানাচ্ছে:

● পশ্চিমবঙ্গ ধর্ষণ : ১০৬৯; ● কলকাতায় : ১৪; ● নির্যাতিতার সংখ্যা : ১৪

শিল্প ও সংস্কৃতি

জাতীয় উৎসবের উৎস সন্ধানে

ষড়ানন পণ্ডা

বাঙালীর জাতীয় উৎসব 'দুর্গাপূজা'—গাল ভরা এই কথাটা এখন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমনটা বাসে-ট্রেনে হাসপাতালের দেওয়ালে লেখা থাকে ধূমপান নিষেধ। সিগারেট প্যাকেটের গায়ে থাকে : Cigarette smoking is injurious to Health। দুর্গাপূজার এক মাস আগে থেকে টিভি, রেডিও-তে ঘন ঘন প্রচার করা হয় "চাঁদার জুলুমকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করবেন না। পুলিশের অনুমতি ছাড়া মাইক বাজানো আইনতঃ দণ্ডনীয়" ইত্যাদি। চণ্ডীমণ্ডপের মাইকে স্তুতিঃ 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' নারীজাতিকে আমরা মায়ের মতো ভালবাসি, শ্রদ্ধা সম্মান করি। প্রতিবছর পুজোর কয়েক দিনে পুলিশ সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতকারী, মদ্যপায়ী, ধর্ষণকারী কয়েক হাজার বর্বরকে গ্রেপ্তার করে। এই কি জাতীয় উৎসবের চালচিত্র! তবে এটা কী চিত্র?

একটা জাতির সকলের সহযোগিতায় সকলের কল্যাণের জন্য যে উৎসব তাই হল জাতীয় উৎসব। যে উৎসবের যন্ত্রণায় জাতি নিপীড়িত, লাঞ্ছিত—তা-ই কি জাতীয় উৎসব?

(১) গ্রামে বিরল দর্শন একটি মোটর গাড়িকে ছুটতে দেখে শিশু মনে মনে কল্পনা করে ঐ মোটর গাড়ির ভিতরে নিশ্চই কোন বিশাল শক্তিশালী দৈত্য এতবড় গাড়িটাকে সোজা বা বাঁকা পথে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিশু বড় হয়ে মোটর গাড়ির ভিতরের ইঞ্জিনের ও ড্রাইভারের ক্ষমতার কথা জানতে পারে। তখন তার ছেলেবেলার মিথ্যা ধারণা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়।

ঈশ্বরের কল্পনা, ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্মও মানুষের আদিম কল্পনার ফল। মানব সভ্যতার শৈশব অবস্থায় মানুষ চোখের সামনে দেখল—মস্ত বড় একটা পাহাড়ের চাঁই উপর থেকে গড়িয়ে কয়েকটা গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষকে পিষে, থেঁতলে দিল। আবার ঐ পাথরের চাই' দিয়ে গুহার দরজা বন্ধ রাখলে—বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষাও পাওয়া যায়। এই পাথরের চাই অসন্তুষ্ট হলে বিপদ, সন্তুষ্ট থাকলে মঙ্গল বা নিরাপদ। অতএব একে সন্তুষ্ট করতে হবে—একে পুজো করতে হবে। তখনও এখনকার মতো মন্ত্র ঢাকঢোল, মাইক, ভোগ-নৈবেদ্য প্রতিমার ভাবনা মানুষের মাথায় আসেনি। তখন ঐ পাথরের চাঁইকে ঘিরে জোরে জোরে নাচ-গান হোত। এই হল ঈশ্বর ভাবনার অতি আদিম ধাপ। এভাবে কেটে গেছে বেশ কয়েক হাজার বছর।

(২) ঈশ্বর চিন্তার দ্বিতীয় ধাপে মানুষ দেখছে—বজ্র-বিদ্যুৎ ঝড়-বৃষ্টি রৌদ্র—সবই আকাশ থেকে নামছে। বজ্রপাতে বনের গাছে আগুন ধরে যাচ্ছে, জীবজন্তু মরছে। বন্যায় বহু জীবজন্তু মানুষ ভেসে যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি খরার উপদ্রবে মানুষ নাজেহাল। এসব ব্যাপার তবে হচ্ছে কি করে? সেদিন মানুষ শিশুর মতো কল্পনা করে নিয়ে ছিল—ঐ সুদূর আকাশের আড়ালে কোন সর্বশক্তিমান প্রভু আছেন, তিনিই এসব করেছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্তবস্তুতি মন্ত্রতন্ত্র করল। অবশ্য এই ধাপে আসতে মানুষের বহু হাজার বছর কেটে গেছে।

(৩) ঈশ্বর চিন্তার তৃতীয় ধাপে মানুষ ঈশ্বরের একটা চেহারা দিতে সমর্থ হলো। অবশ্য ঈশ্বর বা ভগবানের চেহারা মানুষের মতই হবে। কিন্তু শক্তি যেহেতু মানুষের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী, এজন্য হাতের সংখ্যা ৪, ৮ বা ১০ হলো, মাথা হলো ৪।৫।৬, চোখ বেড়ে ৩ হল। যেমন ব্রহ্মার ৪ মুখ, ৪ হাত। শিবের ৫ মুখ, কালীর ৪ হাত, দুর্গার ১০ হাত। শিব, দুর্গা, কালী-এর চোখ ৩টি করে। বিষ্ণুর ৪ হাত। হাতে রইলো শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি। দুর্গার ১০টি হাতেই আছে ধারাল অস্ত্র। ইনি যুদ্ধের দেবী। তাই বাহনও শক্তিশালী জন্তু পশুরাজ সিংহ।

(৪) ঈশ্বর বিশ্বাসের চতুর্থ বা শেষ ধাপে মানুষের মস্তিষ্কের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির তালে তাল রেখে কল্পনা ও কাজে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো। দেবতার মূর্তি মাটি, পাথর, ধাতু কাঠ দিয়ে এতদিন তৈরি হোত। এখন থেকে বরফ দিয়ে, ধান দিয়ে, কড়ি দিয়ে, আলোর নানা কৌশলে, চোখ ধাঁধানো ক্যালেণ্ডারে দেবতার মূর্তি তৈরি হল, আঁকা হল। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, মণ্ডপ প্যাণ্ডেল—সবকিছুরই জৌলুস বেড়ে গেল।

প্রতিমার বহিরঙ্গের পরিবর্তন হলেও পুরাতন কিছু কিছু জিনিস অপরিবর্তিত থেকেই গেছে। যেমন মন্ত্রের সাহায্যে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বর্তমানের দুর্গোৎসব যা জাতীয় উৎসব নামে পরিচিতি লাভ করেছে—এরূপ প্রতিমা পূজার বয়স চারশ বছরের মতো। কলকাতায় দুর্গা পূজার প্রচলন হয় প্রায় দুশো বছর আগে।

(৫) আজকের দিনের মানুষ কিন্তু এরকম মানুষ হয়ে জন্মায়নি। বহু হাজার বছরের মধ্য দিয়ে পশু স্তর থেকে মানুষ মানুষের স্তরে উন্নীত হতে সমর্থ হয়েছে। মানুষ যখন মানুষ হয়ে উঠতে থাকে তখন তার মস্তিষ্কের বিকাশও ধীর গতিতে ঘটতে থাকে; চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা বাড়তে থাকে। একদিন সে ছিল প্রকৃতির কাছে শিশুর মত অসহায়, প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল শিশুর মতই অপ্রতুল। তবু অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তা করার ক্ষমতার সে অধিকারী। এই অজানাকে জানার ক্ষমতাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে সে আপাততঃ যুক্তিগ্রাহ্য নানা কল্পনার জন্ম দেয়। প্রাকৃতির নানা কিছুর পেছনে এক পরম শক্তির কল্পনা করে। এই কল্পনাই ঈশ্বর বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। কেটে যায় হাজার হাজার বছর : জ্ঞান ও

পরীক্ষা—প্রমাণ লব্ধ তথ্যাদি মানুষ ক্রমশঃ আহরণ করতে থাকে। আর এর ফলে পূর্বেকার কল্পনার বহু কিছুই সে জ্ঞানের আলোয় বিচার করে। তখন মানুষ তার পূর্বেকার ঈশ্বর সম্পর্কিত কল্পনার ফাঁকি সম্পর্কেও সচেতন হতে থাকে।

(৬) মানব সভ্যতা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করতে শুরু করলে কিছু মানুষ এসবকে কল্পনা ও মনুষ্য সৃষ্ট বলে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। তবে এদের সংখ্যা আজও নিতান্তই কম। ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪৮ কোটি ১০ হাজার। এদের মধ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীনের অনুপাত ৪:১। ধর্ম এবং ঈশ্বর চিন্তা কোত্থেকে এল, কত দিন থেকে এর অস্তিত্ব, কিভাবে এর বিকাশ হল এসব প্রশ্নের উত্তর অনেকে খুঁজলেও এর কৌতূহল নিবৃত্ত করার মতো তথ্যাদি না জানতে পারলে সত্যের পথে হাঁটাটাও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই সাধারণ পাঠকদের জন্য আমার এই সামান্যতম প্রচেষ্টা। অবশ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা ব্যাখ্যা করার সুযোগও নেই। তবুও সামান্য একটু রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখানে ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম ইত্যাদির কথাই বলা হচ্ছে। মানব ধর্ম, জলের ধর্ম, হাইড্রোজেনের ধর্ম এই অর্থে ধর্ম কথাটাকে ধরা হয়নি। সাধারণতঃ আমরা বলি ঈশ্বরে বিশ্বাসকারীদের বলে আস্তিক আর কোন ধর্মেই যার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই তাদের বলে নাস্তিক।

(৭) ধর্ম এ ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের কল্পনার সন্তান। ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস সনাতন বা চিরন্তন নয়। বিবেকানন্দ বাণী ও রচনার ৩য় খণ্ডের ৫৩ এবং ১৭৪ পৃষ্ঠায় স্বয়ং বিবেকানন্দের উক্তি :

''ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা প্রভৃতি সমস্ত ধারণা আপনারই প্রতিবিম্ব। ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিবিম্ব স্বরূপে সৃষ্টি করলেন—একথা ভুল। মানুষ নিজ প্রতিবিম্ব অনুযায়ী ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে—একথাই সত্য। সমগ্র জগতে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব অনুযায়ী ঈশ্বর বা দেবতা সৃষ্টি করেছি। একটি উত্তম ভগবান গড়াই মানুষের মহত্তম কীর্তি। যেমন মানুষ, তেমন ভগবান। এই রকম মানবিক প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন উপায়েই মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না। যা ইচ্ছে বলো; যত খুশি চেষ্টা করো, তুমি ভগবানকে মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুই কল্পনা করতে পারো না এবং তিনি ঠিক তোমারই মতো।''

(৮) মানুষে মানুষে বিভেদের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য। আর ধর্মের সৃষ্টি সমাজের এই বৈষম্য সৃষ্টিরও আগে। পরবর্তী কালের সমাজ ও বিশেষ শ্রেণী নিজ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষই এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের চেয়ে ধর্মীয় বৈষম্য সম্পর্কেই বেশী সচেতন। এর ফলে বিভেদ ও বৈষম্য ক্রমশঃ বেড়েই চলে। একদিকে ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা বিশ্বাস ও অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে অসচেতনতা এই বেড়ে চলার জন্য প্রধানত দায়ী।

''মানুষের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে, মানুষ যখন স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজে যখন শাসক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। মানুষ ভেবেছে একজন শাসক না থাকলে, একজন প্রভু বা মাষ্টার না থাকলে সমাজই যেখানে নিয়ম মেনে চলতে পারে না সেখানে এই যে বিশ্ব চরাচর ও দুনিয়া নিয়ম মেনে চলছে, নিশ্চয়ই এর পেছনেও একজন প্রভু বা মাষ্টার আছে। এভাবে নিজের চোখের দেখা সমাজ ও সমাজ শাসককে দেখছে। দুনিয়ার নিয়মকানুনের পরিচালনার জন্যও অবশ্য কোন সুপার মাষ্টার বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকতেই হবে। তিনি অবশ্যই আছেন—তবে আমাদের অজ্ঞান চোখে তাঁকে দেখা যায় না। সাধন করলে অবশ্যই তাঁকে দেখা সম্ভব হবে। এই ভাবেই মানুষ একদিন ভগবানকে খুঁজে পেয়েছে। দুনিয়ায় ভগবৎ চিন্তার এইটাই হচ্ছে মূল কারণ।''

(৯) ঈশ্বর বিশ্বাসে ধনী দরিদ্র রোগী অসহায়—মিথ্যে বিশ্বাসের বলে সাময়িক স্বস্তি পায়, শান্তি পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্ম মানুষকে আজ বাস্তবিক জাগতিক সমস্যা এবং জ্ঞানগত মননশীলতার ক্ষেত্র কোন কিছুই দিতে পারে না। জোর করে ''দিতে পারে'' বললে একজন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি যখন কোন ধর্মগ্রন্থের পাতায় চোখ বোলাবেন এবং দেখতে চাইবেন—''ধর্ম কী কী দিতে পারে''—তখন তাতে তিনি বর্তমান যুগের সমস্যাগুলির উল্লেখ বা সমাধান পাওয়া তো দূরের কথা, বিভিন্ন ব্যাপারে বহু উদ্ভট, আজে বাজে, এমনকি বীভৎস জিনিস দেখতে পাবেন। [শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, চন্দ্র, মনসা, কালী, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চরিত্রের অশ্লীল অংশগুলি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।৪।২৭, ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪।২ বিভিন্ন পুরাণ]

তার ফলে এই ধর্মগ্রন্থগুলিকে এবং তার রচয়িতাকে তিনি ভগবানই হোন, আর মানুষই হোন—সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখাই তাঁর পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়বে। কিন্তু ধর্ম প্রবর্তকদের এবং ধর্ম-গ্রন্থগুলিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে, যখন তিনি এইটা জেনে পড়বেন যে শাস্ত্রগুলিতে এগুলো লেখার সময় মানুষের সমাজ জীবন, সমস্যা, জ্ঞানবৃদ্ধি, মূল্যবোধ যে পর্যায়ে ছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছে। আজকের মানুষের সমস্যা, পুঁজিবাদের নির্মম শোষণ-নিপীড়ন, বেকারত্ব, অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, অশিক্ষা এসব সমস্যার কোন সমাধান কোনো ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাওয়া সম্ভবই নয়। ঠিক তেমনি, আজ মানুষের জ্ঞানের রাজ্যেও যা কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তারও উত্তর বা কোন সমাধান সূত্র কোন ধর্মগ্রন্থই দিতে পারবে না। আধুনিক যুগের অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, দর্শন থেকেই এদের সমাধান খুঁজতে হবে।

(১০) বিশ্বচরাচরের সবকিছুকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: (১) পদার্থ, (২) শক্তি। পদার্থকে আবার জড় পদার্থ ও চেতন পদার্থ বা জীব এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বচরাচরের সবকিছুই মোট ৩টি ভাগে বিভক্ত (১) জড় পদার্থ, (২) জীব এবং (৩) শক্তি। মহর্ষি কণাদ ও সাংখ্যকারও এই তিনের বেশি বিভাজন দেখাতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন

হল—দেবদেবী ঈশ্বর, ভগবান, গড, আল্লা—এই তিন ভাগের কোন ভাগের মধ্যে পড়েন? উত্তর একটি : এঁরা বিলকুল জড় পদার্থের ভাগেই পড়েন। অতএব এই জড়কে নিয়ে এত আড়ম্বর, এত উৎসব, আনন্দ, এত অপচয়—শ্রম, অনর্থ, চিন্তা, উদ্ভাবন। এ যেন লবণ প্রতিমার সমুদ্র স্নান।

(১১) ব্যক্তি সম্পত্তি, শ্রেণী বিভাজন ও দাস প্রথাকে অনিবার্য বিধির বিধান বলে সব ধর্মমতই মেনে নিয়েছে। প্রতিটি ধর্মে সম্পত্তিবানকে দান করতে এবং সম্পত্তি হীনকে নির্লোভ হতে উপদেশ দিয়েছে এবং ত্যাগের আদর্শকেই এক উচ্চ লক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরেছে। ধর্ম চিন্তার মধ্যে স্বর্গ নরক কল্পনা এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার রূপটি এমন ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যাতে মানুষ ইহ জগতে শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাকে অবশ্য কর্মফল বলে মেনে নেয়। ফলে ভাগ্য, নিয়তি, কপাল, অদৃষ্ট, পুনর্জন্ম, মরণোত্তর কর্মফল ইত্যাদি ধারণা গুলো সমস্ত ধর্মেরই অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

(১২) সমস্ত ধর্মেই ধর্মগ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাস ও আবেগের চর্চা হয়েছে। আজ তো একথা সকলেই জানেন—প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই—বেদ, পুরাণ, বাইবেল কোরাণ—তা যাই হোক—সংকলিত হয়েছে ধর্ম প্রবর্ত্তকদের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর অনুরাগী শিষ্যদের দ্বারা। এমন কি গীতা, যার রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে—গবেষকরা মনে করেন মহাভারতের স্মৃতিযুগীয় পরিবর্দ্ধনের সময় এতে সংযোজিত হয়েছিল। বাইবেলের তো উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও সংস্করণ হয়েছে। অথচ এগুলো কবে লেখা হয়েছে, কি ভাবে সংকলিত হয়েছে তা সাধারণ মানুষকে বলা হত না। এসবের রচনার সাথে অলৌকিক পরিবেশ জড়িয়ে রাখা হোত। অধিকাংশ অশিক্ষিত লোক তা পড়তেও পারত না, জানতও না এগুলোতে কী লেখা আছে। তাদের বলা হোত—এই গ্রন্থগুলি অপৌরুষেয়। মানুষের রচনা নয়। মানুষের হাতে লিখিত হলেও ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, সুতরাং অকাট্য ও অখণ্ডনীয় এবং অবশ্য পালনীয়।

[বিবেকাননন্দ বাণী ও রচনা—৭ম খণ্ড ১৩৯ পৃ. ৯ম খণ্ড ১৮২ ও ১৯৮ পৃষ্ঠা] আজও কয়জন হিন্দু পুজোর মন্ত্র, শ্রাদ্ধের মন্ত্র, বিবাহের মন্ত্র, চণ্ডী, গীতার শ্লোক শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারেন এবং অর্থ জানেন? কোরাণের আয়াত কয়জন মুসলিম করতে পারেন, কয়জনই তার অর্থ বোঝেন?

(১৩) ঈশ্বরকে একই সঙ্গে ন্যায়-পরায়ণ ও করুণাময় বলা যায় কি করে? বিচারক ন্যায়বান হলে সুবিচার হবে। করুণাময় হলে দোষীর শাস্তি মুকুব হয়ে যাবে। অতএব ভগবান একসঙ্গে করুণাময় আবার ন্যায়বান হবেন কি করে। কেউ কেউ বলেন—কর্মফলে মানুষ দুঃখী হয়, সুখীও হয়। তাহলে ঈশ্বরের চেয়ে কর্মফলের শক্তিই বেশী? ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলব কি করে? ''ঈশ্বর একই সঙ্গে করুণাময় ও সর্বশক্তিমান হতে পারেন না। হয় তিনি মানুবের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেন নি, অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান নন। নয়ত, তিনি দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারতেন, কিন্তু করতে চাননি অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ নন। [স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৩]।

(১৪) ''ভালো এবং খারাপ কাজগুলির স্রষ্টা একই ঈশ্বর তো আর হতে পারেন না। সুতরাং খারাপের জন্য আর একজন ঈশ্বর আছেন, যাকে ইহুদীরা শয়তান বা devil বলে। তাই বলছি, ধরে নাও দুজন ভগবান আছেন, তাদের থাকার এবং কাজকর্ম পাওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীটা যথেষ্ট বড়।'' [ভলটেয়ার রচনা ৩৩ পৃ.].

(১৫) আমাদের দেশে উনিশ শতকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-বিজ্ঞান চর্চায় যে সব নবজাগরণ শুরু হয়েছিল, তাতে ধর্মকে পাশ কাটিয়ে অথবা বিরোধিতা করেই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। রামমোহন রায় মূর্তি পূজা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সতীদাহ ও বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন ধর্ম সংস্কারকরূপে। বিদ্যাসাগর শিক্ষা বিস্তার তথা সমাজ সংস্কার আন্দোলন করতে গিয়ে সাংখ্য বেদান্তকে 'ভ্রান্তদর্শন' বলে চিহ্নিত করতে এবং ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। [বিদ্যাসাগরের চিঠি ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩]। এমন কি বিবেকানন্দও ধর্মশাস্ত্র পাঠের পরিবর্তে স্বাস্থ্য চর্চায় মন দিতে নির্দেশ দিলেন। [বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা—৫ খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা]। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে সরাসরি ধর্মের বিরোধিতা করলেন : ''সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম যুগের কুসংস্কার, মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু।'' [শরৎ সাহিত্য সমগ্র ১২৫০ পৃষ্ঠা] বিজ্ঞানের মঞ্চ থেকে প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষাদানের বিরোধিতা করলেন।—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রচনা সংকলন]। বিপ্লবী ভগৎ সিং ফাঁসির মঞ্চের সামনে নির্বিকার চিত্তে বললেন : 'আমি ঈশ্বর চিন্তায় বিশ্বাস করি না, আমি একজন নাস্তিক। [ভগৎ সিং রচনা—৮৬ পৃষ্ঠা] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের নানা স্থানে [বিসর্জন নাটকে ও কবিতায়, ছোট গল্পে ও অন্যান্য রচনায়] ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর কঠোর আঘাত হানলেন। বাহুল্য বোধে ধর্মমোহ কবিতার অংশ বিশেষ : [রচনা কাল ১৯২৬]

''ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে,
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
...ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।''

(১৬) পৃথিবীর ৭টি প্রধান ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে সমাজ সমীক্ষা ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষকরা দেখেছেন পৃথিবীর একটি মানুষও খাঁটি (নির্ভেজাল) অধ্যাত্মবাদী বা বিশ্বাসী নন। ৪টি প্রধান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ : ''নামেকং শরণং ব্রজ'' (গীতা ১৮।৬৬) ''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'' [বুদ্ধ বাণী—ত্রিপিটক] আউজো বিল্লাহে মিনশ্শৈত্বা নির্রজীম্। বিস্‌মিল্লা—হির্রহসা— নির্রহীম॥ (কোরাণশরিফ) "completely depended on, I will save you. (বাইবেল)। এই চারটি ধর্মশাস্ত্রের একমাত্র নির্দেশ : ''আমার উপরেই শুধু নির্ভর করো, আমি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবো।''

অথচ এই ৪টি ধর্মের সাধারণ অনুগামী থেকে এভারেষ্ট বিজয়ী অনুগামীটি পর্যন্ত রোগ হলে হাসপাতাল ও ডাক্তার বাবুর কাছে ছুটে যান। সুবিচারের জন্য খোদার কাছে বা প্রভুর কাছে না গিয়ে-পুলিশ-আদালতের দ্বারস্থ হন। 'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি', গানটি মুখে বলেন এবং 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই' চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর দেশের সামরিক ক্ষমতা ও পরমাণু অস্ত্রের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। সাধারণ মানুষ ঠাকুরের ইচ্ছায় গ্রহের কোপ এড়াতে তাবিজ কবচ মাদুলি, আংটিতে হাত ভরে নেন। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রী কালীঘাটে, তিরুপতিতে পুজো দেন, একই সঙ্গে অতি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তির উপরও পা দিয়ে হাঁটেন। সারা দেশ কেন সারা পৃথিবী জুড়ে আস্তিক বা অধ্যাত্মবাদীদের একসঙ্গে দুটো নৌকায় উড়ে যাওয়ার অজস্র নজির দেখতে পাবেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়—পৃথিবীতে একটি মানুষও খাঁটি আস্তিক হতে পারেন না, হওয়াটাও সম্ভব নয়। শুধু মুখেই আদি আস্তিক গাল ভরা বুলি বলা সম্ভব।

(১৭) তাহলেও 'জাতীয় উৎসব' কিভাবে পালন করব এবং ঈশ্বর বিশ্বাস বিহীন জীবনযাপন করা কি সম্ভব?'—এই প্রশ্নটি থেকেই যায়। হ্যাঁ, সম্ভব। [ক] সচেতন ব্যক্তিরা প্রথমে ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে তথ্যাদি আন্তরিক ভাবে জানুন, পরে বাড়ির অন্যদের প্রতিবেশীদের, বন্ধু ও আত্মীয়দের ভাল করে জানান। পাড়ায় পাড়ায় আলাপ ও আলোচনা চক্র, পাঠচক্র চালু করুন। [খ] জাতীয় উৎসব, সর্বজনীন উৎসবের নাম করে চাঁদার জুলুম, বিদ্যুতের যথেচ্ছ অপচয়, মাইকের দৌরাত্ম্য, শব্দ ও আলোর দিক থেকে মানুষের নানাবিধ মারাত্মক ক্ষতি, আতসবাজী ও মদমাতালের তাণ্ডবলীলা প্রভৃতি বিষয়গুলো সবাইকে বুঝিয়ে বলুন। নিজেদের শারীর শ্রম ও স্বেচ্ছাদত্ত অর্থে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য মেলা, শরীর-স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা, শরীর নিয়ে সংস্কার, জলাতঙ্ক ও সাপ কামড়ের সংস্কার ও চিকিৎসা, সমস্যা, আবিষ্কার, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, রক্তদান, মরণোত্তর দেহ দান, চক্ষুদান প্রভৃতি বাস্তব বিষয়কে অবলম্বন করে পোষ্টার, নাটক, গীতি-আলোখ্য, কথকতা, স্লাইড শো' V.D.O. প্রদর্শনী, শিক্ষণ শিবির বা কর্মশালা, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করুন। বসন্ত মেলা, ফসল মেলা, নৃত্য-মেলা, অঙ্কন মেলা, গ্রন্থ মেলা, শরৎ মেলা, রবীন্দ্র মেলা, পাস্তুর মেলা, জগদীশচন্দ্র মেলা, গ্যালিলিও মেলা, নিউটন মেলা, বিদ্যাসাগর মেলা—প্রভৃতি উন্নত চিন্তায় জ্ঞানের আলোক মালায় সজ্জিত উৎসব করা যেতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ আপামর জনগণকে এগুলির সাথে যুক্ত করতে হবে। এভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার একটা আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। প্রচার মাধ্যমগুলির শুভবুদ্ধি হলে কাজটা আরও দ্রুততর হবে। অবশেষে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও জনগণের চাপে এক পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। তখন দেশের মঠমন্দির গীর্জাগুলি গ্রন্থাগার, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত হবে। টিভি-র 'ভক্তিসাগর', রেডিও,র 'সংগীতাঞ্জলি'ও অন্যান্য অশ্লীল অনুষ্ঠানগুলির স্থান দখল করবে কল্যাণকারী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইভাবে পৃথিবীটাকে সুন্দর ও সুখী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কোভিডের সুযোগে বেসরকারি পুঁজির ঢালাও প্রবেশ

- সমস্ত ক্ষেত্রের দরজা বেসরকারি পুঁজির জন্য খোলা। কোনও ক্ষেত্রকে শুধু রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থার জন্য তুলে রাখার দিন শেষ।
- কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের তালিকা ঘোষণা শীঘ্রই। যার প্রত্যেকটিতে থাকবে ন্যূনতম ১টি এবং সর্বাধিক ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। বেসরকারিকরণ, একাধিক সংস্থা মেশানো ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যা কমানো হবে। টক্কর বেসরকারি সংস্থার সঙ্গেও।
- বাকি সব ক্ষেত্রে থাকবেই না রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। সময় ও সুযোগ বুঝে হবে বেসরকারিকরণ।
- অনেকের জিজ্ঞাসা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের পরিকল্পনাকে ত্রাণ প্রকল্পে ঠাঁই দেওয়া হল কেন? এমনও তো নয় যে, এখনই বেশ কিছু সংস্থা বেচে সেই টাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কাজে ঢালছে কেন্দ্র। যখন বহু বেসরকারি সংস্থার নাভিশ্বাস দশা, ছাঁটাই হচ্ছেন বহু কর্মী, তখন এমন ঢালাও বেসরকারিকরণ কেন?
- আইডিএসকে-র অধ্যাপক শুভনীল চৌধুরীর কথায়, ''করোনা-সঙ্কটে দিন আনা-দিন খাওয়া মানুষগুলির বিপুল ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই করল না সরকার! উল্টে বেসরকারিকরণের কথা বলা হল! লকডাউনের সময়ে কোনও বিতর্ক, আলোচনা ছাড়া এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ কী?''
- কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের কটাক্ষ, ''রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দেশকে মজবুত ও আত্মনির্ভর করেছে। এখন মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারতে'র নামে সেই সব সংস্থারই শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছে!''

বস্তারের আদিবাসী অধিবাস

অন্তরা ঘোষ

চারদিকে পাহাড় নদী ও জঙ্গলে পরিবেষ্ঠিত অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপ রাশি নিয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলা।

ইন্দ্রাবতী নদীর ছন্দময় গতি, পাহাড়ের গাম্ভীর্য, ঝরনার চপলতা, পাখিদের কলকাকলি, শঙ্খিনী ডঙ্কিনী নদীর মিলনের মাধুর্যতা আর সর্বোপরি আদিবাসী মানুষগুলোর সংস্কৃতি ও সারল্য বস্তার জেলাকে স্বতন্ত্র এক স্থান দিয়েছে। এখানকার দশেরা উৎসব নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে ভারত তথা বিশ্বের মানুষদের বিস্মিত করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এখানে আসেন দশেরা দেখতে।

আমিও সেই দশেরা উৎসব দেখতেই গতবছর পুজোতে গিয়েছিলাম জগদলপুর। জাগদলপুর বস্তার জেলার একটা ছোট্ট জেলা সদর শহর।

দশেরায় বস্তার

ন'দিন ধরে নানা প্রথা রীতিনীতি পালিত হবার পর বিজয়া দশমীর দিন দেখলাম দন্তেশ্বরী মন্দির চত্বরে ফুল দিয়ে সাজানো ৩৫ ফুট উঁচু রথ টানা আর অগণিত মানুষের ভিড়। আশেপাশের গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে আদিবাসী তাদের দেবী দেবতা নিয়ে দশেরাতে আসেন রথ টানতে। দেবী দেবতারা বেশিরভাগই লাঠির মধ্যে কাপড় ও ফুল দিয়ে সাজানো। আদিবাসী ও গ্রামের মানুষরা দেবী দেবতাদের কাঁধে করে নিয়ে আসছেন। কোথাও চলছে আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নাচ, কোথাও ড্রাম বাজানো ও তার সাথে নাচ। সে এক অন্য রকম পরিবেশ। দন্তেশ্বরী মন্দির আলোর মালা দিয়ে সাজানো। কাতারে কাতারে মানুষ রথ টানছে তার সাথে আকাশে বাতাসে মুহুর্মুহু আতশবাজির খেলা। সারাদেশে যখন দশেরার দিন রাবণ পোড়ানো হয় তখন বস্তার জেলায় দশেরা পালিত হয় মা দন্তেশ্বরীর পূজা ও সম্মানে।

আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে কেন এই দশেরা এত বিখ্যাত। তাহলে আসুন বস্তারের দশেরা নিয়েই দু চার কথা বলি।

ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় এমনিতে সারাবছরই অনেক পারম্পরিক প্রথা রীতিনীতি ও উৎসব পালিত হয়। কিন্তু এই সবের মধ্যে বস্তার জেলার দশেরার নাম সর্বাগ্রে। ৭৫ দিন ধরে পালিত হয় এই দশেরা। পৃথিবীর সবথেকে দীর্ঘতম দশেরা উৎসব। আগস্টে হরিয়ালি উৎসবের সময় শুরু হয় আর অক্টোবরে বিজয়া দশমীর দিন শেষ হয়। আপনি কি ভাবছেন বস্তারের দশেরাতে আমাদের দেশের অন্যান্য জায়গার মতো রাবন দহন করা হয়! একদমই ভুল ভাবছেন। যে দেবীকে কেন্দ্র করে এই ৭৫ দিনব্যাপী বস্তার দশেরা উৎসব পালিত হয় তিনি হলেন মা দন্তেশ্বরী দেবী।

বস্তারের দন্তেওয়াড়াতে শঙ্খিনী ও ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে মা দন্তেশ্বরী বিরাজমান। ইনি বস্তার রাজবংশের কুলদেবি। তন্ত্র চূড়ামণি অনুসারে ৫২টি শক্তিপিঠের একপিঠ হল এই দন্তেওয়াড়া। বলা হয়ে থাকে এখানে মা দন্তেশ্বরীর দন্ত বা দাঁত পড়েছিল।

দন্তেওয়াড়াতে মা দন্তেশ্বরীর অধিষ্ঠান ও বস্তার নামকরণের পিছনেও একটি বহু প্রচলিত কাহিনী আছে। কাকাতিয়া রাজা অনঙ্গদেব ওয়ারাংয়েল থেকে এখানে এসেছিলেন। রাজা দন্তেশ্বরী মাতার বরদান পেয়েছিলেন যে রাজা মাতাকে সঙ্গে করে যতদূর পদব্রজে যেতে পারবেন তত দূর অবধি রাজার সাম্রাজ্যের সীমানা হবে। কিন্তু শর্ত একটাই যে রাজার পিছন ফিরে তাকানো চলবে না। পিছন ফিরে তাকালে মা সেখানেই থেমে যাবেন। রাজাকে সেখানেই মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনঙ্গদেব দন্তেশরী মায়ের প্রতীক ছাতা ধরে পদব্রজে চলছেন। পিছন পিছন মায়ের পায়ের নুপূরের আওয়াজ আসছিল। শঙ্খিনী ও ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে দন্তেশ্বরী মায়ের পায়ের নুপূরের শব্দ রাজা আর শুনতে পেলেন না। রাজা ভাবলেন মা বুঝি আসছেন না। আসলে নদীর জলের বালিতে মায়ের পায়ের নুপূরের শব্দ চাপা পড়ে গেছিল। রাজা যেই মাত্র ফিরে তাকালেন অমনি মা ওখানেই থেমে গেলেন আর পিছন ফিরে নিজের বস্ত্র যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিলেন। যার জন্য এই অঞ্চলের নাম হল বস্তার অর্থাৎ বস্ত্রের ভেতর। রাজা শর্ত অনুযায়ী শঙ্খিনী ও ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে দন্তেওয়াড়াতে মন্দির বানিয়ে দন্তেশ্বরী মায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে মা দন্তেশ্বরী হলেন বস্তার রাজবংশের কুলদেবী।

মাতা দন্তেশ্বরীকে আবাহন ও সম্মানের উৎসবই হল বস্তার দশেরা। ৬০০ বছরের পুরনো এই দশেরা উৎসব আজও পরম্পরা রীতিনীতি মেনে পালিত হয়ে আসছে। হরিয়ালি অমাবস্যার দিন। পাটাযাত্রা প্রথার সাথে বস্তার দশেরা শুরু হয়। আশ্বিন শুক্লপক্ষের প্রথম থেকে ১৫ দিনে ১২ টিরও বেশি প্রথা পালিত হয়। আজও দশেরা উৎসবের প্রস্তুতির জন্য গ্রামে-গ্রামে নিয়ম মেনে নাজির,

পূজারী, কোতোয়াল, প্যাটেল, নায়েকদের দশেরা উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

জনশ্রুতি আছে বস্তারের চালুক্য বংশের রাজা হয়রাজ দেবের পুত্র পুরুষোত্তম একবার পুরীতে শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির পদব্রজে যাত্রা করেন। ওখানে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও বস্ত্র দান করেন। জগন্নাথদেব তার এক ভক্তকে স্বপ্নাদেশ করেন যে তার পরম ভক্ত পুরষোত্তম দেবকে রথপতি উপাধি দিতে ও ১২ চাকার রথ দান করতে। পুরুষোত্তমদেব রথপতি উপাধি পান ও রথে করে ফিরে আসেন বস্তারে। সেই থেকে দশেরার সময় রথ চালানোর প্রথা শুরু হয়। ১২ চাকার রথ চালানো অসুবিধা বলে দশেরার সময় দুটো রথ চালানো হয়। একটা চারচাকা ও আরেকটি আট চাকার।

বস্তারের আদিবাসী নৃত্য

যে প্রথা দিয়ে বস্তার দশেরা শুরু হচ্ছে সেটা হলো পাটাযাত্রা। হরিয়ালি অমাবস্যার দিন টুবলু খোটরা নামের গাছের কাঠ জগদলপুর রাজমহলের পাশে দন্তেশ্বরী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে এনে পুজো করা হয়। তারপর এই কাঠ দিয়ে জগদলপুরের কারিগররা রথ বানানো শুরু করেন। এই পাটাযাত্রা প্রথায় কালো ছাগল ও মাগুর মাছ বলি দিয়ে সেই রক্ত কাঠের গায়ে লাগিয়ে তারপর রথের চাকার মাঝে ছিদ্র করা হয়। এই প্রথা কে বলে নারকর্ণী।

বস্তার দশেরার পরবর্তী পর্ব হলো 'ডেরি গাদাই' এর প্রথা। কাঠের দু টুকরোর পুজো করে টুকরো দুটোকে ভূমিতে স্থাপনা করা হয়।

এর পরবর্তী প্রথার নাম 'কাছিন গদি'। এই প্রথা পালিত হয় কাছনগুড়ি নামক জায়গাতে। এই প্রথায় কাছিন দেবীকে সিংহাসন বা গদি দিয়ে আহ্বান করা হয়। এই দেবীর সিংহাসন তৈরি হয় বেলের কাঁটা দিয়ে ঝুলা বা দোলনা বানিয়ে। কাছিন দেবী বস্তারের মৃগান জাতির কুলদেবী। মৃগান জাতির এক নাবালিকা কুমারী কন্যার মধ্যে দেবী ভর করেন। আশ্বিন মাসের অমাবস্যার দিন রাজা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পত্রাগুরার কাছনগুড়িতে আসেন। দেবীর পরম ভক্ত সিরহা (একজন উন্মাদ প্রকৃতির ভক্ত) ওই নাবালিকা মেয়েটিকে বেল কাঁটার গদিতে বসান ও মেয়েটির মধ্যে আসীন কাছিন দেবীর কাছে দশেরা উৎসব আরম্ভ করার অনুমতি চান। মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে,

''যা দশেরা মানহা, খুশি রহ।''

কাছিন দেবীর অনুমতি পেলেই প্রবল উৎসাহে শুরু হয়ে যায় দশেরা উৎসবের প্রস্তুতি। আশ্বিন শুক্লপক্ষের প্রথম থেকে বস্তার দশেরার নবরাত্রির কার্যক্রম শুরু হয় নয় দিনব্যাপী। জগদলপুরের দন্তেশ্বরী মন্দিরে কলস স্থাপন, চণ্ডীপাঠ, হবণ এবং চন্ডী, হনুমান, বিষ্ণু, বগলামুখী সহ বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো চলতে থাকে।

বস্তার দশেরার পরবর্তী পর্ব হল জগদলপুর এর সিরহাসর ভবনে যোগী বসানোর রীতি বা কার্যক্রম। যোগী বসানোর জন্য এই ভবনের মধ্যভাগে একটা গর্ত করা হয় যেখানে একজন মানুষ কোনভাবে থাকতে পারে। এই গর্তের ভেতর হালবা জাতির এক ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ন' দিন যোগাসনে বসে থাকেন। যোগী শুধুমাত্র ফলাহার ও দুগ্ধাহারের উপর থাকেন। এই প্রথার শুরুতেও ছাগল ও মাগুর মাছ বলি দেওয়া হয়। এই যোগী বসানো রীতির পিছনে জনশ্রুতি আছে যে প্রাচীনকালে দশেরার আগে একজন যোগী দশেরা উৎসব যাতে নির্বিঘ্নে সমাপন হয় সেই কামনা নিয়ে যোগসাধনাতে বসেছিল। তখন থেকেই যোগী বসানোর প্রথা বা রীতি চালু হয়। যোগী বসানোর পরেরদিন থেকে চার চাকার রথ চালানো শুরু হয় সিরহাসর ভবন থেকে দন্তেশ্বরী মন্দির অবধি। রথকে ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। তাই একে ফুলরথও বলা হয়। প্রতিদিন আলাদা আলাদা জাতির লোক রথের বিশেষভাবে তৈরি দড়ি টানে।

বস্তারের দশেরাতে বিভিন্ন গ্রামের সমস্ত জাতির দেবদেবীদের জগদলপুরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আবার দশেরা সমাপ্ত হলে সকলকে সম্মান পূর্বক বিদায় জানানো হয়। সরকারের তরফ থেকে গান স্যালুট দিয়ে দশেরা উৎসব ও রথযাত্রা শুরু হয়।

দশেরা উৎসবের পরবর্তী প্রথা হল নিশাযাত্রা। জগদলপুরের এতোয়ারী বাজারে নিশাযাত্রার অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাজপরিবারের সদস্যরাও এই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। মহুয়া তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তান্ত্রিক বিধিবিধান অনুযায়ী পূজা সম্পন্ন হয়। এগারোটা ছাগল বলি দেওয়া হয় ও পরদিন সেই ছাগলের মাংস প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়। নিশাযাত্রার প্রথাকে ''কালাজাদু কি রশম''ও বলে। প্রাচীনকালে রাজা মহারাজারা অশুভ প্রেতাত্মা থেকে নিজেদের রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য এই পুজো করতেন ও পুজোতে ছাগল, মোষ, এমনকি নরবলিও দেওয়া হত। পরে অবশ্য মোষ বলি ও নরবলি প্রথা উঠে যায়।

নিশা যাত্রার পরদিন অর্থাৎ নবমীর দিন রাত্রে যোগীকে সম্মানপূর্বক ওঠানো হয় ও তার চরণে বহু কিছু জিনিস ভেট দেওয়া হয়।

নবমীর দিন রাত্রে দশেরার পরবর্তী প্রথা মাওলি পরভাও যেখানে মাউলি মাতার মূর্তি স্থাপন করা হয় জগদলপুরের দন্তেশ্বরী মন্দিরে। মাওলি মাতা হলেন দন্তেশ্বরী মায়ের বত্রিশ জন বোনের একজন। নতুন কাপড়ে জড়িয়ে ফুল ও চন্দনের প্রলেপ দিয়ে সজ্জিত হয়ে মাওলি মাতা দন্তেওয়াড়া থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা পূর্বক আমন্ত্রণ পেয়ে জগদলপুরে দশেরা উৎসবে শামিল হতে আসেন।

জগদালপুরে দন্তেশ্বরী মন্দিরে রাজগুরু ও রাজ পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মন্দিরে নিয়ে আসেন মা'কে। বস্তার দশেরার পরবর্তী প্রথা হচ্ছে 'ভিতর রাইনি' ও 'বাহার রাইনি' প্রথা।

বিজয়া দশমীর দিন সকালে 'ভিতর রাইনি'র পুজো করা হয়। সন্ধের সময় সিরহাসার চক থেকে আট চাকা ওয়ালা ফুলে সাজানো ৩৫ ফুট উঁচু বিশাল রথ দন্তেশ্বরী মন্দিরের দিকে আসে। হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ যখন এই বিশেষ রথের দড়ি টানে ''হাইসা মারো হাইসা''। সে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাড়ির ছাদ, দালান থেকে মেয়েরা পুষ্পবৃষ্টি করে। এই আকর্ষক ফুল রথের ভেতরে থাকে দন্তেশ্বরী মায়ের ছাতা বা ছত্রী। মা দন্তেশ্বরী এই দিব্য রথে চড়ে নগর ভ্রমণ করেন। বিজয় দশমীর রথের এই নগর পরিক্রমাকেই 'ভিতর রাইনি' বলে।

বিজয় দশমীর রাতে ফুলরথের নগর পরিক্রমা যখন সমাপ্ত হয় তখন প্রথা অনুসারে একটা বিশেষ জাতির লোক রথকে চুরি করে কুমড়াকোট নামে জগদলপুর থেকে দু কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা নিয়ে লুকিয়ে রাখে। কুমড়াকোট থেকে রথ ফিরে আসতে আসতে পরদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। এই প্রথা কে 'বাহার রাইনি' বলে।

বস্তার দশেরার অন্তিম পর্ব হল 'গঙ্গামুদা যাত্রা'। এই পর্বে মাওলি মাকে সম্মান পূর্বক বিদায় জানানো হয়। আশ্বিন মাসের ১৩ তম তিথিতে গঙ্গামুদ্রাস্থির মাওলি শিবিরে মাওলি মাতার বিদায় পর্বের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে 'পোহারি' বলা হয়। মাওলি মাতার বিদায় পর্বের পর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সমস্ত দেব-দেবীকে সম্মান পূর্বক বিদায় জানানো হয়। আর সর্বশেষে যে দেবীকে নিয়ে এত বড় দশেরা উৎসব হয় সেই বস্তার রাজবংশের কুলদেবী মা দন্তেশ্বরীর বিদায় অনুষ্ঠান সম্মানপূর্বক পালিত হয়। জিয়া ডেরা থেকে মা দন্তেশ্বরীর প্রতীক ছত্রীকে দোলায় বসিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক বিদায় জানিয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করা হয় ''হে মাতা দন্তেশ্বরী পরের বছর তুমি আবার এসো... তোমার আশীর্বাদের ছত্রছায়ায় আমরা যেন নির্বিঘ্নে আবার দশেরা উৎসব মানাতে পারি''। এরপর মা দন্তেশ্বরীর দোলায় বসানো ছত্রীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পূর্বক দন্তেওয়াড়া দন্তেশ্বরী মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু হয়।

বস্তার জেলার ঐতিহাসিক এই দশেরা উৎসব দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রায় ৬০০ বছরের পুরনো এই দশেরা উৎসবে অসংখ্য প্রথা রীতিনীতি তার সাথে সরল আদিবাসী মানুষগুলোর আবেগ অনুভূতি ও অগাধ বিশ্বাস জড়িয়ে আছে।

সাথে আছে রাজ পরিবারের সদস্যদের দশেরা উৎসবে প্রতিটি প্রথায় সামিল হওয়া ও মানুষের বিশ্বাস ও রাজভক্তিকে মর্যাদা দেওয়া। বর্তমানে রাজা কমলদেও ভঞ্জ আদিবাসীদের রীতিনীতি প্রথাকে সম্মান জানিয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দশেরার সময় রাজা একদিন ঘোড়ায় চড়ে রাজবেশে সজ্জিত হয়ে অগণিত জনসাধারণের মাঝে আসেন ও দশেরা উৎসব এর জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। ছত্তিশগড় সরকার এই উৎসবকে পৃষ্ঠপোষণা করে। এই ঐতিহাসিক দশেরা উৎসব ভারত তথা আন্তর্জাতিক স্তরে নিজস্ব স্বকীয়তায় অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান লাভ করেছে।

ছেলেবেলায় শিমুলতলায, মধুপুর আর দেওঘরে

পার্থময় চট্টোপাধ্যায়

জীবনের কিছু কিছু ঘটনা মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও মানুষ ভুলতে পারেনা, ভোলা যায়না কিছু কাছের মানুষদের যা কালের আবর্তে বিলীন হলেও মনের স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। আজ আবার একটা চারদিনের ঘটনা নিয়ে ঘুমন্ত অতীতের একটা ''সময়'' কে প্রাণ দেবার এই প্রচেষ্টাকে আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। জীবন কথার অর্থ আমার কাছে একটা সময়ের সিন্দুক। ৮০টা বছর। আর সেটা আমার কাছে ২৯২০০ টা দিন, কিছুই না। এর মধ্যে আবার ৯৭৩৩ টা দিন ঘুমিয়ে কেটে যায়। এর থেকে চারটে দিনকে গল্প হিসেবে তুলে ধরবো এখানে।

আজ থেকে বছর ৩৫ আগের একটি ভ্রমণ কাহিনী। চার বন্ধু ঠিক করলাম শিমুলতলায় ঠান্ডা উপভোগ করতে যাবো। মাসটা ছিল জানুয়ারি, ভালই ঠান্ডা। যাবার দিন তপন এসে হাজির, গেছিল আলিপুরদুয়ার, দাদার কাছে। আমাদের ট্রেন ছিল তুফান এক্সপ্রেস। স্টেশনে সাগর মেলার ফিরতি ভিড় ছিল। তপন আমাদের সাথে স্টেশনে এসে টিকিট কাটার নাম করে কোথায় চলে গেলো। অনেকক্ষণ না আসায় আমরা আমাদের নির্ধারিত কামরায় গিয়ে নিজেদের আসনে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের পাশে এক সাধু এসে বসলো। গেরুয়া বস্ত্র মাথায় গেরুয়া কাপড়ের ফেট্টি, হাতে একটা কমণ্ডুল আর ত্রিশূল। মাথার উপর বাংকে যখন ব্যাগটা রাখছিল তখন ওটা দেখে চিনতে পারলাম। দেখি তপন, আমরা ভেবেছিলাম সাগর মেলা ফেরত কোনো সাধু। অনেক গেরুয়াধারী এই কামরায় তখন উঠে বসেছে। তপনকে দেখে আমরা চিৎকার করে উঠলাম, ও সাথে সাথে আমাদের চুপ করে থাকতে বলে একটা সিগারেট ধরালো। দু একজন সাধু তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলো। মাঝে মাঝে জয় তারা বলে চিৎকার করছে তপন আর মনের আনন্দে সিগারেট খাচ্ছে। কানাইকে হঠাৎ বললো, ''বেটা সাধু বাবাকো কুছতো খিলাও''। কানাই ওকে সপাটে এক গাট্টা মারলো আর সেটা ট্রেনের দু একজন যাত্রী লক্ষ্য করলো। চা ওয়ালা এলো, আমরা চারজন চা নিলাম। তপন চাওয়ালাকে মাথায় ত্রিশূল ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করল, ''তেরা মন মে শান্তি আয়েগা।'' সে বেচারীর কি অশান্তি তা জানি না আমরা, হঠাৎ দেখলাম চা ওয়ালা তপনের পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করে তপন এর দিকে হাত জোড় করে আশীর্বাদ চাইলো। তপনও

ওর কপালে হাতের তিনটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে আনন্দ আশ্রম সিনেমার শ্যামল মিত্রের সেই গান" তিনটি মন্ত্র নিয়ে যাদের জীবন, সত্যম শিবম সুন্দরম" গানটি আওরে গেলো। চা ফ্রী, তার উপর চা ওয়ালা যাবার আগে তপনের কমনডুলে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে গেলো। তপন আবার ''জয় তারা" বলে একটা বিড়ি ধরালো। বিড়ি টানতে টানতে ও ওর কীর্তির কথা জানালো। পাড়ায় একটা মন্দির আছে, দুপুরে সন্ন্যাসীদের স্নানের পরে, মেলে দেওয়া গেরুয়া ধুতি আর চাদর ওখান থেকে জোগাড় করেছে, আর হাওড়া স্টেশনের বাথরুমে ড্রেস চেঞ্জ করবার সময় অন্য এক সাধুর বাথরুমের বাইরে রাখা ত্রিশূল আর কমনডুল গেঁড়িয়ে নিয়েছে। দুপুরে আমরা ডিম আর কষা পরোটা খাচ্ছি আর তপন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কানাই অবশ্য ওর জন্যে একটা ডিম আর তিনটে পরোটা এনেছিল। বেড়াল আর কতক্ষণ মাছের কাছে বসে থাকবে বলুন! আস্তে আস্তে লুকিয়ে, সাধু বাবা পরোটা দিয়ে ডিমের কষা চালাচ্ছে এমন সময় টি টি সাহেব এসে হাজির, ভাগ্যিস তপন ডিমে হাত দেয়নি।

শিমুলতলা

তপন টি টি সাহেবের দিকে আশীর্বাদ করবার স্টাইলে বললো ''জয় শম্ভু", টি টি সাহেব তপন কে বললো ''পরনাম মহারাজ"। উনি যেতেই তপন চাদরে ঢেকে রাখা ডিম আর পরোটা বার করে আবার খেতে লাগলো। সকাল থেকে তপনকে যে সাধুটা নজরবন্দি করে রাখছিল সেতো তপনের ডিম খাওয়া দেখে চোখ বড়ো করে অবাক ভাবে দেখছিল। তপন ওর আধ খাওয়া ডিমটাকে তিন আঙ্গুলের মাথায় নিয়ে সাধুবাবা ইশারায় খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলো। হঠাৎ সাধু বাবার চোখে আগুন ঝরে পড়লো আর দুই ঠোঁট দিয়ে ব্রউউউউ করে এক শব্দ, সাথে মাথা ঝাকানো শুরু করলো, তপন নির্বিকার হয়ে ডিমটাকে খতম করলো।

শিমুলতলায় পৌঁছলাম শেষ দুপুরে, আমরা পাঁচ জন পর্যটক আর কিছু লোকাল লোকজন স্টেশনে নামলাম। এখানে আমরা স্টেশনে উল্টো পারে একটু দূরে একটা বিশাল বাড়িতে ছিলাম। গড়িয়াহাট একডালিয়া থাকে অমিত দাদা এই বাড়িতে আমাদের বিনা পয়সায় থাকতে দিয়েছিলেন। শিব বাড়ির ঠিক পাশেই আমরা ছিলাম।

এই শিব বাড়িতেই তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি' চলচ্চিত্রের সব কলাকুশলিরা ছিল। আমরা প্রথমে ভুল করে এই বাড়িতে ঢুকে পড়ি, কেয়ারটেকার ছিল না তখন, আমরা বারান্দায় মালপত্র রেখে সবে একটু বসতে যাবো অমনি কেয়ারটেকার হাজির, আমরা পরিচয় দিতে উনিতো বুঝতেই চাইলো না যে আমাদের এখানে থাকার কথা আছে। আমরা যখন বোঝানো টাকে ঝগড়ার পর্যায়ে নিয়ে গেছি ঠিক তখনই পাশের বাড়ির এক কেয়ারটেকার এসে জানালো যে অমিত বাবুর বাড়ি এটা নয়, এই পাশের বাড়িটা।

বিশাল বাগান নিয়ে এই বাড়ি। একটা বড়ো ইঁদারা আছে, এটাই খাবার, স্নান, রান্নাবান্না সব কিছুরই জলের ব্যবস্থা। বিশাল একটা ঘরে পালঙ্কও বিছানো কিন্তু কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হ্যাজাকের আলো। বেশ ভালই অনুভূতি হলো। কেয়ারটেকারের নাম মহেশ দাদা, বয়স হবে ষাটের ঘরে। আমাদের উনি বললেন যে আজ রাত্রে বাইরে থেকে খাবার কিনে আনতে কারণ রান্না করবার মেয়েটি বাড়ি চলে গেছে। তপন ততক্ষণে ওর সন্ন্যাস বসন পরিহার করে আধুনিক পোশাকে ফিরে এসেছে। ও জানালো যে আজ রাত্রে দেশী মুরগি ও রান্না করবে আর রুটি আমরা কিনে আনবো। এবার মহেশ দাদা রুটি বানানোর দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিলো। আমরা স্টেশন বাজারের দিকে হাঁটা শুরু করলাম চারজন, আর তপন মহেশ দাদার সাথে রাত্রের রান্নার প্রস্তুতি করতে লাগলো। স্টেশনের আগে এক বিশাল মাঠ পেরিয়ে তারপর বাজার। এই বাজার চত্বরটাই শিমুলতলার প্রাণ কেন্দ্র। একটা দুর্গা মন্দির, তেলেভাজার দোকান গোটা চারেক, চায়ের দোকান তিনটে, দুটো মাটিতে বসে বেচা কেনার মিষ্টি দোকান, সাথে জিলিপিও ভাজতো। একটা মুরগির দোকান। এ ছাড়া চাল, ডাল আলু পেঁয়াজ কিছু সবজি, মুদি মশলা, বিছানা পত্তর, বাসন, স্টোভ এই সবের দোকান। সব মিলিয়ে গোটা ১৫ দোকান। তপন এর দেওয়া লিস্ট অনুযায়ী সব কিনে আমরা স্টেশনে চা ও তেলেভাজা খেয়ে অস্থায়ী ডেরার ফিরে এলাম। রাত্রে সেকি ঠান্ডা যা এখনও চিন্তা করলে ভয় হয়। বাজার থেকে কানাই আর দিলীপ ভাগ্যিস মহুয়া কিনে এনেছিল। রাত্রে মহেশ দাদার মোটা মোটা অথচ নরম বিহারী রুটি সাথে তপনের বাঙালি মুরগির কষা জমিয়ে খেলাম। রাত্রের ঠান্ডায় আর বেশি না জেগে লেপের তলায় ঢুকে গেলাম সবাই মিলে। পরের দিন সকালে উঠেই ছুটলাম বাজারে মাছের সন্ধানে। কতো রকম সবজি, মাছ, কচি পাঠা, পায়রা, আরো কত কি। তপনের নজর কিন্তু হাঁড়িয়ার হাড়িতে। আমরা চা খেলাম আর তপন ছোট চায়ের গ্লাসে দুই গেলাস হাড়িয়া খেয়ে একদম টগবগে ঘোড়া। জল খাবার খেয়ে সবাই সর্ষের তেল মর্দন করে ইঁদারার জল তুলে সেকি স্নানের চোট। খালি খিদে পায় তাই দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাদের দুপুরের খাবার খেতে হলো। সবাই এতটাই টানলাম যে বেচারি মহেশ দাদা আর বিজলী দিদির ভাত আর রইলো না। ওদের জন্য আবার ভাত চড়াতে হলো। এদিকে গরুর গাড়ি এসে হাজির। মহেশ দাদার উপদেশ মত খাবার এক ঘণ্টা পরে গরুর গাড়ি করে ওনার মাদলটাকে সমীর বগল দাবায় করে নিয়ে খড়ের ওপর চাদর বিছানো গরুর গাড়িতে পাঁচ জনে চড়ে বসলাম। পথ আমাদের নিয়ে চলল হলদি ঝর্না। রেল লাইন পেরিয়ে ৬/৭ কিমি দূরে পাহাড় ও অরণ্যের

মধ্যে মনোরম পরিবেশে হলদি ঝর্না। রেল স্টেশন থেকে ২ কিমি দূরে লীলবরণ পাহাড়ি ঝোরা। গরুর গাড়ির পুরো রাস্তায় সমীর মাদল বাজলো আর কানাই গোটা চার বার মান্না দের/"কোকিলা তোরে সুধাই রে" গানটা শুনালো।

লাট্টু পাহাড় আর রাজবাড়ী দেখা হলো না কারণ সূর্যদেব আমাদের ত্যাগ করে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় তপনের উদ্যোগে বেগুনি, আর পেঁয়াজি সাথে গোল মুড়ি আর মোষের দুধের আদা সাথে ছোট এলাচের চা। আজ দেশীও মুরগি রান্না করবে মহেশ দাদা। আমরা মহুয়ার জার নিয়ে বসে গেলাম তাসের আড্ডায়।

আহা, কি তার স্বাদ। আমি খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে একটা বাটিতে কিছুটা মাংস তুলে নিয়ে ঢেকে রাখলাম। তপন আর কানাই থামছেই না। সমীর দিলীপ আর আমি অনেক আগেই থেমে গেছি। যা হবার তাই হলো, মহেশ দাদার চারটে রুটি শুধু পরে রইলো। খাবার শেষ করে মহেশ দাদার প্রতি দুজনের করুণা ঝড়ে পরলো। তপন চারটে ডিম দিয়ে মহেশ দাদাকে অমলেট করে দেবার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। আমি ওই সব বন্ধ করে মহেশ দাদা কে মাংসের বাটিটা দিলাম এবার।

পরদিন সকালে আবার বাজার, সেখানে জিলিপি আর কচুরি খেয়ে মহেশ দাদা আর বিজলী দিদির জন্যে নিয়ে, কচি পাঠা নিয়ে ডেরায়। দুপুরে খেয়ে দেয়ে মহেশ দাদার সাথে সবাই মিলে চললাম লাট্টু পাহাড় অভিযানে। ১০০০ ফুট উঁচু লাট্টু পাহাড়। গাছ পালায় ছাওয়া লাট্টু পাহাড়। চূঁড়াতে আছে মন্দির। দেবতাদের থান। সূর্যাস্তও ভুলবার নয়। লাল আবির উড়িয়ে উনি অস্ত যান। সত্যাজিত রায়ের পা পড়েছিল এখানে।

মধুপুর

মহেশ দাদা ঠিক সন্ধ্যায় রাজবাড়ির সামনে আমাদের নিয়ে এলো। আমরা এর রূপে পাগল হয়ে রাজ বাড়ির আনাচে কানাচে রহস্য খুঁজতে লাগলাম। রাজবাড়ির রূপটা অপরূপ, এর সিঁড়ি গুলো এখনো রাজকীয় আভিজাত্য ও তার প্রতাপ বহন করে চলেছে। সেদিন চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় আমি দেখেছিলাম এক জীবন্ত কর্মব্যস্ত রাজবাড়ি। সেদিন নিজেকে ভেবেছিলাম শ্রেষ্ঠ যাযাবর, নিজেকে পেয়েছিলাম নগর বাউল হিসাবে। যা আজও ভবি নিজেকে। সেই রাত্রে খিচুড়ি আর ডিমের অমলেট। পরের দিন সবাই মিলে যাবো মধুপুর পাতরোল কালীবাড়ি, কারণ কানাই আর দিলীপ ওখানে বিয়ে হবার জন্যে মানত করবে ঠিক করেছিল।

এবার আসছি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটায়, যা আমাদের আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শিমুলতলা থেকে দূরে রেখেছিল। রাত তখন ঠিক একটা দেড় টা হবে, চিৎকার, কান্না কাটি শুনে আমরা জেগে উঠেছি সকলেই। মহেশ দাদা জানালো যে পাশের বাড়ি ডাকাত পড়েছে। জীবনে প্রথম ডাকাতির খপ্পরে পরলাম। নিজেরা না কিন্তু মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমাদের দরজাতেও শাবলের বাড়ি পরলো। কোনো ভাবে ভয়ে ভয়ে রাত কাটলো। সকালে উঠে সবাই তৈরি হলাম সেদিনের জঙ্গলরাজভূমি শিমুলতলাকে গুড বাই জানানোর জন্য। চা আর মুড়ি খেয়ে রওনা দিলাম জনঅরণ্য মধুপুরে।

মধুপুরের মধুযামিনী

বাঙালী চেঞ্জারদের আদি স্বর্গভূমি ছিল এই মধুপুর। এখন আর কেউ তেমন ভাবে আসেনা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ভূমিতে। এখনও প্রচুর বাঙালি পরিবার এখানে থাকে। সকলেই রেল ও চাকরি করবার সুবাদে এখানে পোস্টিং পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে এখানেই জমি জায়গা কিনে স্থায়ী বাসিন্দা বনে গেছেন। কলকাতার পরে আর একটি প্রবাসী নগর এই মধুপুর যেখানে আজও চায়ের দোকানে আড্ডা, সান্ধ্য ক্লাব, সকালে লুঙ্গি পরে বাজারের ব্যাগ দুলিয়ে বাজার করা এই সব আছে। এখানে এত সুন্দর গোলাপ ফোটে যে মধুপুর-কে আমস্টারডাম বলা যায় এখনও। আধুনিকতার ছোবল এখানেও পড়েছে। আধুনিক ঘর বাড়ি হচ্ছে চারিদিকে। এখন কি অবস্থা কে জানে। স্টেশনের সামনে একটা কুপ ছিল, ডালমিয়া কুপ। আশু ঘোষের 'সোনার বাংলা', 'শেঠ কুঠি', 'জাহাজ বাড়ি', আরো কত কি।

দেওঘরের পথে পাতরোল কালী মন্দির। ভিতরে রয়েছে কষ্টিপাথরের কালী মূর্তি।

বেশি লেখা কেউ পড়তে চায় না, তাই এখানে মধুপুরের মধু যামিনী কেন বলছি সেটা লিখে আজ ফিরে যাবো সেই কর্মব্যস্ত জীবনে। সেদিনটা ছিল পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিন। মধুপুরে আমরা উঠেছিলাম কানাইয়ের পিসির বাড়ি। আমরা বিকেলের দিকে যখন পিসির বাড়ির দুয়ারে পৌছলাম তখন বুঝলাম যে এই বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। পিসি তো আমাদের চার মূর্তিমান কে দেখে খুব খুশি। ভাইপোকে জড়িয়ে ধরে সবাইকে ডাকাডাকি জুড়ে দিল। মধুপুরে তখনও পাড়া পাড়া একটা পরিবেশ। আমাদের থাকার জায়গা স্থির হলো পিসির বাড়ির পাশের বাড়িতে। বিয়েটা ছিল পিসির মেয়ের, ছেলে মানে বর দুর্গাপুর থেকে বিয়ে করতে এসেছে। বিয়ে নিয়ে আমার চার বন্ধু মেতে গেলো, আমি একটু ঘুমিয়ে নিলাম। রাত্রে খাবার ডাক পড়লো, কোনো ভাবে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে খেতে বসলাম। ততক্ষণে আমার চার কলকাতার বন্ধু মধুপুরের কিশোরীদের সাথে বেশ মিশে গেছে। খাবার পরে শুনলাম আজ কেউ ঘুমাবে না, সবাই বাসর জাগবে। ভালো না লাগলেও বিনে

পয়সায় থাকা ও খাবার যেখানে পেয়েছি সেখানে সারারাত কীর্তন তো করতেই হবে। বাসর ঘরের এক কোণে জায়গা করে নিলাম। ধীরে ধীরে ঘুমিয়েও পড়লাম। হঠাৎ দিলীপের চিমটি তে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি কানাই মহিলা বেষ্টিত পরিবেশে গান ধরেছে আর ওর দৃষ্টি এক অষ্টাদশীর দিকে। এই কানাই ভদ্রলোকটি যখন তখন প্রেমে পরে যায়। ওর গানটাও ছিল জব্বর, মান্না দের গাওয়া ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা।

''জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই পাছে ভালোবেসে ফেল তাই দূরে দূরে রই''

পরিস্থিতি গম্ভীর। তপন কে দেখলাম, সন্ধ্যে থেকে যাকে প্রতি মুহূর্তে আড়চোখে, বাঁকাচোখে, পিটপিট চোখে, তলচোখে দেখছিল, এখন দেখলাম সোজা চোখেই তাকে দেখছে। মেয়েটা উঠে যেতে ওর খোঁপার ফুলটা মাটিতে পড়ে গেল আর তপন এদিক ওদিক তাকিয়ে সেটা পকেটে ঢোকালো। আমি ঘুমের ভান করে সব লক্ষ্য করছিলাম আর এই প্রেমিক বন্ধুদের নতুন ভাবে চিনছিলাম। এবার দিলীপ বেশ গর্বের সাথে বললো যে আসল গায়ক এখানে ঘুমাচ্ছে, একে এবার গাইতে হবে। কলেজ জীবনে আমিও মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী হয়ে ক্যান্টিন, কমনরুম বা গোলপার্কে রেলিং এ বসে বন্ধুদের মাতিয়ে রাখতাম। সবাই আমার দিকে ধেয়ে এলো আমি গম্ভীর গলায় বললাম বাদ্য যন্ত্র ছাড়া গাইতে পারবো না। সবাই হতাশ হয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখন তিথি, মানে পিসির মেয়ে আমাকে বললো, প্লীজ ভাইদা শোনাও না গো একটা গান। আমি আর কি বলবো আমার প্রিয় বন্ধুটার অনুরোধ আমি যে ফেলতে পারিনা, আর ওকে কোন দিনও কোনো আবদারে না করবো না সেটা ওকে ওর নার্সিং হোমের বেডের পাশে বসে ওর হাত টাকে নিজের হাতে নিয়ে যে আমি দিব্বি খেয়েছি। ওর একটা আবদার আমি সেইদিন রাখিনি আর তার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর তা এই পৃথিবীতে কেউ না শুধু এই আমরা দুজনই জানি। যাক তিথির অনুরোধের উপর আমিও শর্ত দিলাম যে গাইতে পাড়ি তবে যদি ছাদে সবাই মিলে যাই। তখন চাঁদের আলোয় মধুপুর স্নান করছিল। দূরের চার্চটার পেছনে চাঁদ টা ধীরে ধীরে লুকিয়ে যাচ্ছে, আমি তখন ধরলাম

''সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা
রঙ ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে
সব ভালো লাগছিল চন্দ্রিমায়
খুব কাছে তোমাকে পাওয়াতে''

গানের শেষে সবাই চুপ, হয়তো এতই বেসুরে গান আগে তারা শোনে নি, তাই সেদিন আমি তিথির চোখে চাঁদের রূপালী গুড়ো দেখেছিলাম, হয়তো খুশির চিকমিক! আমি সেই রাত টা ছাদের আলো নিভিয়ে চাঁদের আলোয় মধুপুরের মধু যামিনী দেখেছিলাম। এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন আমার বুকের বাতাসে ছাই হয়ে সারা ছাদে চিরনিদ্রায় গেছিলো। হঠাৎ, কানাইয়ের গলা, এই অন্ধকারে আমায় খেয়াল করেনি, ওর গাওয়া মান্না দের সেই গানের নায়িকা টির হাত বুকে নিয়ে কি যেন বলছে, আর মেয়েটা হিন্দিতে বলছে, ''কাভি নেহি, ইয়ে পাপ হায় জী, আউর মেরি পাপা বহুত মাশুর আদমি হায়, তুমকো উড়া দেঙ্গে।'' ও যখন হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে তখন কানাই বেশ জোরের সাথে ওকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, ''হোকনা চারি দিকে আগুন, তুমি আমি এসো না সেই আগুনকে সাক্ষী রেখে ঝড়ের বেগে দুটো প্রজাপতির মতো উড়ে যাই, অন্য কোনো দেশে, শুধুই ভালোবেসে''। আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে গিয়ে কানাইয়ের বপুতে এক পদাঘাত। আরো অনেক কথাই বলতাম, কিন্তু ভয় হলো বড়ো গল্প যদি আপনারা না পড়েন তাই আজ আসি। পরের দিন সকালে দেওঘর যাবো তাই এই বার উঠলাম।

ভালোবাসার দৈর্ঘ্যে দেওঘর

১২০০ টাকায় টাটা সুমো নিয়ে মধুপুর থেকে সকালেই বেড়িয়ে এলাম দেওঘরে। সৎসঙ্ঘের আশ্রমে উঠেছিলাম। আশ্রমের বাইরে একটা চায়ের দোকানে এককাপ পোড়া দুধের চায়ের অর্ডার দিয়ে পকেটে হাত দিলাম সিগারেট খুঁজতে, জ্যাকেট-এর পকেটে হাত পড়তেই একটা খাম হাতে লাগলো, মনে পড়ে গেলো যে গতকাল রাত্রে একটা বাচ্চা মেয়ে এই খামটা দিয়েছিল।

দেখলাম তিথির লেখা একটা ছোট্ট চিঠি, তাতে লেখা—''ভাইদা, তুমি যখন এই চিঠিটা পড়বে তখন আমি সমাজের চোখে অন্যের স্ত্রী হয়ে যাবো গো, আর তখন তোমায় কিছু লেখা হবে না, তাই বিয়ের পিঁড়িতে বসবার আগে তোমায় এই শেষ চিঠিটা লিখছি। তুমি ভালো থেকো, আর বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি পারো করে নিও, কারণ আমার যে এখনও লোভ হয় গো। আমি আমার ভাললাগাকে পেলাম না, আশীর্বাদ করো আমার এই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ভাললাগাটা যেন আমার ভালোবাসা হয়। বিয়ের পরে গুজরাট চলে যাবো পতি গৃহে। তিথি নামটা তোমারই দেওয়া, তাই তোমার জীবনে বছরের একটা তিথি অন্তত আমার জন্য রেখো। ভালো থেকো''। একটা দমকা হাওয়াতে চিঠিটা হাত থেকে উড়ে গিয়ে চায়ের দোকানের উনুনে গিয়ে পরলো। মনে মনে বললাম তিথির আর আর আমার সম্পর্কের অগ্নিসাক্ষী এটা।

মধুপুরে থেকে ৩৫ কিমি পেরিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দেওঘর পৌঁছালাম। দেবতাদের ঘর এই দেওঘর বা দেব ঘর। তাই এই ছোট্ট শহর জুড়ে বিরাজ করছে শুধু মন্দির আর মন্দির। করণীবাগে নওলাক্ষি মন্দির, কুণ্ডেশ্বরী মন্দির, বমপাস টাউনে নবদুর্গা মন্দির, উইলিয়ামস টাউনে রামকৃষ্ণ মিশন, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম সৎসঙ্গ নগর।

শীতকাল আসবে আর দেওঘর দেখব না, এমন বাঙালি পর্যটক খুব কম আছেন। জীবনে একবার হলেও দেওঘর দেখা হয়েছে। শীতকালে তীর্থ যাত্রী, পর্যটক সাথে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ দেওঘর কে আপন ঘরে পরিণত করে। ক্লক টাওয়ার হচ্ছে এর প্রাণ কেন্দ্র। এছাড়া আছে নন্দন পাহাড়। পাহাড়ে শিরে চিত্ত বিনোদনের পসরা নিয়ে গড়ে উঠেছে মনোরঞ্জন পার্ক। হিল টপ বাংলোতে থাকার ব্যবস্থাও মেলে। শহরের উপকণ্ঠে তপোবন। শহর থেকে ২০ কিমি দূরে ত্রিকূট পাহাড়।

বাবাধাম—ইতিহাস বলে, স্বয়ং বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ

করেছেন। আবার কেউ বলেন রাজা পুরনমল লক্ষী নারায়ণ বাবাধাম মন্দিরটি ১৫৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শিবলিঙ্গের নবম শিললিঙ্গের অন্যতম পীঠস্থান হলো এই বাবাধাম।

পুরো চত্বর জুড়ে আরো অনেক মন্দির। সরস্বতী, কালি, পার্বতী, রামসীতা, তারামা, গণেশ, মনসা, মহাকাল। বৈদ্যনাথধামের পার্বতী মন্দির ৫১ পীঠের অন্যতম সতীপীঠ। এখানে সতীর হৃদয় পড়েছিল।

ত্রিকূট পাহাড়—শহর থেকে ২২ দূরে এই পাহাড়। প্রায় ২৫০০ ফুট উঁচু এই পাহাড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামে তিনটি শৃঙ্গ রয়েছে। এই কারণে ত্রিকূট পাহাড় এর নাম। রোপওয়ে চড়ে পাহাড়ে চূড়ায় যেতে হয়। ময়ূরাক্ষী নদীর উৎসস্থল। উপর থেকে নিচে দৃশ্য অসাধারণ লাগে।

কিভাবে যাবেন—

দেওঘরের রেলস্টেশন জসিডি। দূরত্ব ৬ কিমি। হাওড়া থেকে জসিডি যাচ্ছে পূর্বা এক্সপ্রেস, উদয়ন আভা, তুফান এক্সপ্রেস। প্রচুর হোটেল এখানে পাবেন।

জীবনে অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি কিন্তু কিছু বেড়াবার মধ্যে অনেক পাওয়া থেকে যায়, এটা তেমনি এক মূল্যবান পাওয়া। কিন্তু স্থান কাল পরিবেশ কে মন থেকে দেখা হয় না, কিন্তু কোন সময় সেই ভালোলাগাটা গুটিগুটি মনের গভীরে ভালাবাসা হয়ে বসে যায়। পশ্চিমের এই ভ্রমণ এমনই এক স্মৃতি আজও আমার মন বহন করে চলেছে।

ভারতের অর্থনীতি প্রসঙ্গে

“ভারতের কথায় যদি আসি—আমাদের দেশে হরেক রকম বিভেদ চিরকালই ছিল, কিন্তু ১৯৪৭-এর পর থেকে ক্রমশ একটা বোধ তৈরি হচ্ছিল যে আমাদের সবাইকে মিলেমিশে এই দেশটাকে তৈরি করতে হবে। সেই বোধটাই আমাদের এই দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে রেখেছিল। সাম্প্রতিক অতীতে, ২০০৩ থেকে ২০১১ অবধি ভারতে একটা অভাবনীয় আর্থিক বৃদ্ধি হচ্ছিল—গোটা দুনিয়ায় আলোচনা হচ্ছিল তা নিয়ে। এই সময়টাতে দেশে সামাজিক বিশ্বাসও বেড়েছিল বিপুল ভাবে। গত তিন-চার বছরে সেই বিশ্বাস একেবারে মুর্খ থুবড়ে পড়েছে।”

“ঘুরে দাড়ানো যে অসম্ভব, তা মনে করি না। দিনকয়েক আগেই পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বড় লগ্নির কথা ঘোষণা করল সরকার। অর্থনীতিতে মন্দা এলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয়—এটা তো একেবারে *কেনসিয়ান প্রেসক্রিপশন*। সত্যিই যদি সরকার টাকাটা ঠিক ভাবে খরচ করে, তা হলে অবস্থা ফিরতে পারে। কিন্তু, কী ভাবে খরচ করতে হবে, সেটা রাজনীতির প্রশ্ন নয়, অর্থনীতির প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চাই। এই সরকারের নাগালে তেমন বিশেষজ্ঞের খুবই অভাব। পরিকাঠামো খাতে খরচ করলে তার লাভ পেতে পাঁচ-দশ বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু, বাজারে এই পরিমাণ টাকা ঢুকে গেলে মূল্যস্ফীতির হার চড়চড়িয়ে বাড়তে পারে। এখানেই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন—এমন কেউ, যিনি বুঝবেন, কোথায় কী ভাবে খরচ করলে মূল্যস্ফীতির ওপর রাশ রাখা যাবে। তেমন বিশেষজ্ঞ না থাকলে আগামী দু’বছরে বিপদ আরও বাড়বে, সেই আশঙ্কা থাকবে।”

—কৌশিক বসু, ভূতপূর্ব মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশে এখন সাতাশ অনুরোধের আসর। যার ফলে পূর্ণ লকডাউনের দিন ঠিক করতেও জেরবার রাজ্য সরকার। এই পটভূমিতেই স্রোতের বিপরীতে হাঁটার বার্তা উঠে এল নাগরিকদের একাংশের একটি চিঠিতে।

নিজেদের ‘অরাজনৈতিক মুসলিম নাগরিক’ বলে পরিচয় দিয়ে বেশ কয়েক জনের স্বাক্ষরিত একটি ই-মেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাতে দেশ তথা রাজ্যে করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের মধ্যে ইদের নমাজের ঢালাও অনুমতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। চিঠিটির বক্তব্য—মসজিদে নমাজের জমায়েতে মাস্ক পরে লোকে ঢুকলেও পারস্পরিক দূরত্ব রাখা কার্যত সম্ভব হয়নি। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত তৈরি হয় যা আরও অজস্র ধর্মীয় জমায়েতের জন্য যথেচ্ছাচারের বাঁধ খুলে দেয়।

সমাজকর্মী মুদার পাথেরিয়া, চিত্রশিল্পী ওয়াসিম কপুর, পুষ্টিবিশারদ হিনা নাফিস থেকে শুরু করে চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রমুখদের দাবি, এক দিকে রাজ্যে কয়েকটি দিন পূর্ণ লকডাউন জারি করা হচ্ছে, অন্য দিকে মাঝেমধ্যেই জমায়েতের অনুমতিতে রাজ্য নরম মনোভাব দেখাচ্ছে। তা এক ধরনের স্ববিরোধ। চিঠিতে লেখা হয়েছে, ‘ইদের নমাজ বাড়িতে বসে পড়লে ক্ষতি নেই।’

কবিতা

মুহূর্তরা

হেয়র্হে লুসি বোরহেস (আর্জেন্টিনার কবি, ১৮৯৯-১৯৮৬)

যদি আরেকবার ফিরে জীবনযাপনের সুযোগ পাই
তাহলে এইবার চেষ্টা করতাম
আরো বেশি ভুল করার,
আর মোটেই কোন ব্যাপারে নিখুঁত হতে চাইতাম না,
তার বদলে অনেক বেশি সহজ আর প্রসন্ন থাকতাম,
অনেক বেশি পরিপূর্ণ থাকতাম—এখনকার চেয়ে,
আসলে কোন জিনিসকেই বেশি গুরুত্ব দিতাম না
অনেক কম মাথা ঘামাতাম শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে,
অনেক বেশি ঝুঁকি নিতাম,
অনেক বেশি বেরিয়ে পড়তাম,
অনেক বেশি সূর্যাস্ত দেখতাম
অনেক বেশি পাহাড়ে চড়তাম,
নদীর বুকে অনেক সাঁতার কাটতাম
অনেক অচেনা জায়গায়, যেখান আগে কখনও যাইনি,
বেড়িয়ে আসতাম
অনেক বেশি আইসক্রিম খেতাম মটরশুঁটি না খেয়ে
অনেক বেশি সত্যিকার সমস্যায় জড়াতাম—কাল্পনিক সমস্যায়
জর্জরিত না হয়ে।
আমি ছিলাম সেই ধরনের মানুষ যারা সবসময়ে মাপা
জীবন যাপন করে,
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাবধানে ব্যয় করে,
তার মধ্যেও কিছু আনন্দ আমি নিশ্চয়ই পেয়েছি
কিন্তু যদি আমি আর একবার ফিরে বাঁচার সুযোগ পাই
তাহলে আমি চাইব শুধু সুন্দর মুহূর্তগুলোর মধ্যে বাঁচতে।
তুমি যদি নাই জানো—ঠিক এই এই জিনিস জীবনের ভিত্তি
তাহলে মুহূর্তটাকে ছেড়ো না!
আমি ছিলাম তাদের মতো যারা কোথাও যায় না
সঙ্গে থার্মোমিটার না নিয়ে,
গরমজলের বোতোল ব্যাগে না ভরে,
হাতে ছাতাটা নিয়ে।
যদি আর একবার বাঁচার সুযোগ পাই—নির্ভার হাল্কা পায়
ঘুরে বেড়াবো,
যদি আর একবার বাঁচার সুযোগ পাই—খালি পায় সব কাজ করবো
বসন্তের শুরু থেকে সেই হেমন্তের শেষ অবধি,
অনেক অনেক মেঠো পথে গরুরগাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াবো,
অনেক অনেক সূর্যাস্ত দেখবো আর কচিকাচাদের খেলায়
ঢুকে পড়বো,
যদি ফিরে বাঁচার সুযোগ পাই—
কিন্তু আমার বয়স এখন পঁচাশি
আর আমি শুনতে পাচ্ছি মৃত্যুর নিশ্চিত পদধ্বনি।

অনুবাদ : সৌম্যশঙ্কর মিত্র

অঘোষিত জরুরি অবস্থা?

অসমে চল্লিশ লক্ষ মানুষকে ডি-ভোটার করা হয়েছে। তাঁদের পক্ষে কবিতা লেখায় দশজন কবির বিরুদ্ধে এফআইআর।

কাজি নীলের দুটি মিঞা/মিয়া কবিতা
অনুবাদ : সুমনা চৌধুরি

সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না

যে দেশ আমার বাবাকে বিদেশি বানায়
যে দেশ আমার ভাইকে গুলি করে মারে
যে দেশে আমার বোন মরে গণধর্ষণে
যে দেশে আমার মা বুকে আগুন চেপে রাখে
সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না।

যে দেশে লুঙ্গি পরার অধিকার নাই
যে দেশে কান্না শুনার মানুষ নাই
যে দেশে সত্য বললে ভূত কিলায়
যে দেশ আমার আজীবন দাসত্ব চায়
সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না।

যে দেশে টুপি মানেই মৌলবাদী
যে দেশে মিঞা মানে নীচজাতি
যে দেশে 'চরুয়ারা' সব বাংলাদেশি
যে দেশ টাটা বিড়লা আম্বানির হাতে বিক্রি হয়ে যায়
সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না।

যে দেশে আমাদের লাশের পর লাশ কুপিয়ে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়
যে দেশে ৮৩ তে মানুষ মেরে শালার বেটারা জল্লাদের মতো
উল্লাস নৃত্য নাচে
সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না।

যে দেশে আমার ভিটা বাড়ি উচ্ছেদ করা হয়
যে দেশে আমার অস্তিত্বকে বাতিল করা হয়
যে দেশ আমাকে অন্ধকারে রাখার ষড়যন্ত্র চালায়
যে দেশ আমার থালাতে পান্তার বদলে পাথর ঢালতে চায়
সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না।

যে দেশে আমি গলা ছিঁড়ে চিৎকার করলেও কেউ শোনে না।
যে দেশে আমার খুনের জন্য কেউ দায়ি না

যে দেশে আমার ছেলের কফিন নিয়ে রাজনীতি চলে
যে দেশ আমার বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
যে দেশে আমি জানোয়ারের মতো বেঁচে থাকি
সেই দেশ আমার, আমি সেই দেশের না।

যদি আর কোনো ভাষা না থাকে দুনিয়ায়

যদি আর কোনো ভাষা না থাকে পৃথিবীতে
যদি হারিয়ে যায় সব অক্ষরমালা
যদি ভেসে যায় খাতা কলম, কবিতার উপমা

যদি কোনো সাংকেতিক ভাষায় আর না বলতে পারি
তোমাকে আমার এই নীরব দুঃখ

এই মরে যাওয়া মন যদি
আর খুঁজে না পায় গানের ঠিকানা
যদি না লিখতে পারি চিঠি এই আগুন জ্বলা বসন্তে

যদি বোবা হয়ে যাই, যদি আমাদের চোখ
আর না বলে কোনো কথা

যদি নদী থাকে নদীর মতন, ঢেউয়ের কোনো শব্দ নাই
যদি পাখি থাকে গাছের ডালে, ঠোঁটে কোনো বাঁশি নাই

যদি আমরা ছটফট করি সারা রাত
না বলা কথাগুলি উড়ে বেড়ায় শিমুল তুলার মতন
আর আমরা বুঝতে না পারি বুকফাটা মেঘের বিষাদ

যদি সব ভাষা হারিয়ে যায় পৃথিবী থেকে
যদি থেমে যায় এই কলম

ভালোবাসার কথা কি আমি বলব না, বলো?
আমি কি বলব না এই নীরব দুঃখের কথা

অন্য কোন আদিম ভাষায়?

[সৌজন্য : 'টাইম লাইন']

কোভিড-১৯ সৃষ্ট আর্থিক সঙ্কটে ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজ

- প্রধানমন্ত্রীর দাবি : প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ, জিডিপি-র ১০%
- অর্থমন্ত্রীর দাবি : মোট প্যাকেজের পরিমাণ ২০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৩ কোটি টাকা
- সরকার ঘর থেকে বাড়তি খরচ? আর্থিক বিশ্লেষকদের হিসেব : মাত্র ২ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫ কোটি টাকা, জিডিপি-র মাত্র ১.১%
- বাকি টাকা : রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নগদ জোগান, ব্যাঙ্কের ঋণ, আগের বাজেটে ধরে রাখা বরাদ্দ
- অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য : টাকা কোথা থেকে যাচ্ছে, তার থেকে কোথায় খরচ হচ্ছে, সেখানে নজর দেওয়া বেশি জরুরি

এপ্রিল থেকে জুন ২০২০ দেশের জি ডি পি সংকুচিত হয়ে গেছে ২৩.৯% আর্থিক মন্দা ও কোভিড অতিমারীর অভিঘাতে।

ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র (জুলাই ২০২০)

বিজেপি শাসিত রাজ্য এবং বিজেপি জোট সরকার	অবিজেপি শাসিত রাজ্য
(১) হিমাচল প্রদেশ, (২) উত্তরাখণ্ড, (৩) হরিয়ানা, (৪) উত্তরপ্রদেশ, (৫) বিহার, (৬) অসম, (৭) অরুণাচল, (৮) মেঘালয়, (৯) নাগাল্যান্ড, (১০) মণিপুর, (১১) মিজোরাম, (১২) ত্রিপুরা, (১৩) গুজরাট, (১৪) কর্ণাটক, (১৫) গোয়া, (১৬) মধ্যপ্রদেশ	(১) পাঞ্জাব, (২) দিল্লি, (৩) রাজস্থান, (৪) ছত্তিশগড়, (৫) মহারাষ্ট্র, (৬) কেরল, (৭) তামিলনাড়ু, (৮) অন্ধ্রপ্রদেশ, (৯) তেলেঙ্গানা, (১০) ওড়িশা, (১১) পশ্চিমবঙ্গ, (১২) সিকিম, (১৩) ঝাড়খণ্ড, (১৪) পুদুচেরি *কাশ্মীরে ও লাদাখে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি রয়েছে

সবাইকে পাশে চাই

সপ্তর্ষি বৈশ্য

আমফান ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ। গৃহহীণ বহু মানুষ। রয়েছে ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, গবাদী পশু মারা যাওয়ার সমস্যা, বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সমস্যা এবং আরও নানান স্তরের সমস্যা। ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতিও যেমন হয়েছে, তেমনই সামগ্রিক স্তরে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। যৌথভাবে বেশকিছু সংগঠন একত্রিত হয়ে সুন্দরবনের পাশে দাঁড়িয়েছে।

কাজ করতে হয়েছে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে, ভুলে গেলে চলবেনা লকডাউন চলছে এবং করোনার সংক্রমণও কমেনি।

ইতিমধ্যে কিছু চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন।

যৌথতার ডাকে যে যে সংগঠন সাড়া দিয়েছে :

১. সরবেড়িয়া শ্রমজীবী হাসপাতাল ও কৃষিচক্র : কৃশানুদা ও অরুণ দা
২. প্রিজম : অনিরুদ্ধদা
৩. লাইট হাউস : সঞ্জীবদা ও বাদলদা
৪. জৌগ্রাম সোপান : অনিমেষদা
৫. টিম বিড়হর : সপ্তর্ষি ও অর্কেন্দু
৬. কসবা হিলিং লাইফ : রাহুল ও গার্গী
৭. কোয়েস্ট ফর লাইফ : অনুপমদা ও ইন্দ্রজিৎ দা
৮. মানবিক : বিভাস
৯. নড়িদানা স্বপ্নসন্ধান : সৌরভ, প্রদীপ্ত ও নীলাদ্রী

১০. সাড়া : সঞ্জীব বিশ্বাস

টিম বিরহড় ও যৌথমঞ্চের তরফে সবাইকে অনুরোধ, জানিনা কতটা অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব, তবুও সুন্দরবনের মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে নিজের সাধ্যমতো এগিয়ে আসুন। অর্থবল, লোকবল দুইই দরকার। প্রাথমিক ভাবে খাবারের ও জলের সমস্যার যতটুকু সম্ভব সমাধানের চেষ্টা করা হবে, আগে তো খিদেটুকু মিটুক। সাথে দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিকল্পনাও নেওয়া হবে যেমন চাষের জমি পুনোরোদ্ধার, শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে।

সকল চলার মাঝে

কৃশানু মিত্র

নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার মাঝে সুন্দরবনের আনাচে-কানাচে চলেছে মেডিকেল ক্যাম্প। এই কাজকে সারা বছর বয়ে নিয়ে যেতে প্রত্যয়ী সুন্দরবনের শ্রমজীবী এবং চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন। এঁদের উপলব্ধি—যদি সারা বছর মানুষের প্রয়োজন এ সাড়া না দেওয়া যায় তাহলে এই কর্মপদ্ধতি সঠিক দিশা পাবেনা—তাই এখন নতুন ভাবে বুক বাঁধার শপথের পালা।

একটু কাজের বিবরণ দেওয়া যাক :

13.06.2020. Medical Camp Mohonpur Anchal Muchikhola. Dr. Shymal Chakraborty, Dr. Kamal Saha. Total Patient 257

14.06.2020. Medical Camp. Paschim Mohonpur. Dr, Kamal Saha, Dr. Bishan Dutta. Total Patient 240

16.06.2020. Medical. Camp. Baunia Sahebkhali. Dr. Shymal Chakraborty, Dr. Nandini Goswami. Total Patient 233

18.06.2020. Medical Camp. Paschim Mohonpur. Dr. Mrinal Kanti Roy. Total Patient 309

20.06.2020. Medical Camp. Kultali Purba Gurguriya. Dr. Kamal Saha, Dr. Bishan Dutta, Dr. Purnendu Dutta. Total Patient 200.

19.06.2020. Medical Camp. Kultali Dakshin Bele Durganagar. Dr. Kamal Saha, Dr. Bishan Dutta, Dr. Purnendu Dutta. Totoal Patient 321.

20.06.2020. Medical Camp. Kultali Chuprijhara. Dr. Kamal Saha, Dr. Bishan Dutta, Dr. Purnendu Dutta. Total Patient 301. Bikale Hayechhe.

21.06.2020. Medical Camp. Nazat Metiyakhali Dr. Sumanta Dawn, Dr. Mousumi Mandi Modak. Total Patient 192.

22.06.2020. Medical Camp. Minakha uchulda Gar. Dr. Shymal Chakraborty, Dr. Sumanta Dawn. Total Patient 246.

বিভিন্ন জায়গায় চলেছে যৌথ রান্নাঘর বর্তমানে প্রায় ১৭০০ মানুষ এই কিচেন থেকে উপকৃত।

দীর্ঘ আড়াই মাস যৌথ রান্নাঘর চলার পর মানুষজন নিজেদের অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন—আমরা এই সময়টুকুতে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি মেরামত, বাঁধের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। এখন আস্তে আস্তে যৌথ রান্নাঘর গুটিয়ে তুলতে হবে, আমরা অপেক্ষা করে আছি জনগণের নিদানের ভরসায়। বাউনিয়া, বাসলার মানুষ যখন চাইবেন আমরা যৌথ রান্নাঘর তুলে সম্পূর্ণ সারাবছর প্রাথমিক চিকিৎসা বজায় রাখার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বো। সেক্ষেত্রে হয়তো সুন্দরবনের যে অঞ্চলে অঞ্চলে কাজ হয়েছে সেই জায়গাগুলিই হবে আমাদের প্রাথমিক প্রাধান্যের অঞ্চল। ঢোলহাট নাকালী তে ৬৯ এবং ভাঙ্গনখালির জন্য তির্পল প্রয়োজন ছিল যা চেষ্টা গ্রুপ, বালি নির্ভিক ও বিভিন্ন ক্লাব এবং মন্থন সাময়িকীর উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে—

যোগাযোগ : সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেরিয়া, এস. এফ. হাট, সন্দেশখালি, উত্তর চব্বিশ পরগণা। পিন : ৭৪৩৩২৯। ফোন : ৮৫৪২৯০২৬৫৩। জুন ২০২০

চিকিৎসকদের যুক্ত মঞ্চের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চিকিৎসকদের যুক্ত মঞ্চ প্রথম থেকেই মেডিকেল কলেজের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও প্রশিক্ষণার্থীদের করোনার পাশাপাশি অন্য রোগ চিকিৎসা এবং পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণ পুনরায় শুরু করার দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা প্রশিক্ষণার্থীদের স্মারকলিপিও পৌঁছে দেয়। পরবর্তী কালে স্বাস্থ্য সচিবের সাথে আলোচনা করে একটা সমাধান সূত্র বের হয়। সেই সূত্র অনুসারে প্রশাসনের তরফে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জারী করা অবাঞ্ছিত ও হঠকারী ডিউটি রোস্টার প্রত্যাহার করা হয় ও এক্সপার্ট কমিটির সাথে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সহমতের ভিত্তিতে ননকোভিড ওয়ার্ড চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এই চিহ্নিত করণের প্রক্রিয়াতে বিশেষজ্ঞ কমিটি ও জুনিয়র ডাক্তাররা সহমত হন যে মেডিক্যাল কলেজের অন্যান্য বাড়িগুলি নানা কারণে কোভিড হাসপাতালের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ জুনিয়র ডাক্তারদের জনমুখী দাবীদাওয়া গুলি নিয়ে নানান টালবাহানা করতে থাকেন, ফলতঃ আন্দোলন চলতে থাকে।

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। ননকোভিড ও কোভিড দু ধরনের চিকিৎসা যাতে এক সাথে হতে পারে তার জন্য সরকারি সম্মতি পাওয়া যায় এবং ৯ই জুলাই থেকে এই মর্মে কাজ শুরু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকসহ সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীর যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়।

যুক্ত মঞ্চ মনে করে কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটির সময় আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে চার থেকে ছয় ঘণ্টা করা উচিত। স্বাস্থ্যকর্মীদের রোটেশনাল ডিউটি মেডিকেল কলেজে দেওয়ার জন্য যে অতিরিক্ত কর্মী লাগবে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আশা করা যায় সরকার এই বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নেবেন।

আজ মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারেরা যে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সাথে মানুষের চিকিৎসার দাবীর অগ্রাধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন, তার জন্য তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন। আমরা আশা করবো হাসপাতালে সব শ্রেণীর রোগী সম্মানের সাথে চিকিৎসা করাতে পারবেন ও এশিয়ার এই অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠানের নাম আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কোভিড যুদ্ধের এই মধ্যবর্তী সময়ে, যুক্ত মঞ্চ আরও যে সমস্ত গঠনমূলক প্রস্তাব এবং পরামর্শ প্রশাসনকে দিয়েছিল সেগুলো গুরুত্ব সহকারে প্রশাসন বিবেচনা করবে আশা করি।

চিকিৎসদের যুক্ত মঞ্চ
ডা. রেজাউল করিম, আহ্বায়ক
ডা. হীরালাল কোনার, হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন
ডা. মানস গুমটা, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস
ডা. কৌশিক রক্ষিত, ডক্টরস ফর ডেমোক্রেসি
ডা. পুণ্যব্রত গুণ, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
ডা. অর্জুন দাশগুপ্ত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম

Health Services Association, West Bengal
25, Dixon Lane, Kolkata - 700 014

পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য পরিষেবার কয়েকজন সিনিয়র চিকিৎসকদের সাম্প্রতিক বদলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য

হেলথ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বেশ কয়েকজন সিনিয়র চিকিৎসকদের সাম্প্রতিক অযৌক্তিক বদলির তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এদের মধ্যে অনেকেই জেলায় জেলায় কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমণ সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

একথা ঠিক যে, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় চিকিৎসকদের উন্নততর জনসেবার স্বার্থে বদলি করা যেতেই পারে; তবে অনেক সময়েই দেখা গেছে যে, এই বদলীগুলি বিতর্কিত, দমনমূলক, বৈষম্যমূলক, ও প্রতিহিংসা প্রসূত। বহুক্ষেত্রে তা একজন যোগ্য ও জনদরদি আধিকারিকের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে নিরব করার প্রচেষ্টা। গত কয়েক দশক ধরে স্বজনপোষণ ও প্রবঞ্চনার যে পরাম্পরা এই স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রবাহমান, আজকের ভয়ঙ্করতম মহামারীতেও তা অপরিবর্তিত রয়েছে। এমনকি প্রবীণ চিকিৎসককে সর্বশেষ নিয়োগের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় বদলি করা হয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। সরকারি চিকিৎসকদের বদলীর কোন উপযুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত নীতির অনুপস্থিতিতে, তা স্বজনপ্রীতি ও জবরদস্তির হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকজন সরকারি আশীর্বাদধন্য আধিকারিক কয়েক দশক ধরে পছন্দসই পোস্টিং উপভোগ করছেন আর পাশাপাশি কিছু সৎ, দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ প্রোগ্রাম অফিসারকে রাজ্য জুড়ে বারংবার বদলী করা হচ্ছে। ফলতঃ, বহু গুরুত্বপূর্ণ ও চালু জনসেবা প্রকল্প মাঝ পথে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং সেই যোগ্য অফিসাররা তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ছেন।

আমাদের আশংকা যে, অন্যান্য সংকট ও বিপর্যয়ের মতো, এই মহামারীর সুযোগ নিয়ে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ এবং সরকারী আধিকারিকদের একাংশ দ্বারা জনসাধারণের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। স্বভাবতই, তা সৎ, যোগ্য ও জনদরদি আধিকারিকের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে নিরব করে দিতে চায়।

এই মহামারী সংকট শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ করছি যে, সরকার প্রকৃত ও উপযুক্ত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এড়িয়ে চলছেন এবং মূলত চাটুকার ও অযোগ্য ব্যক্তিদের উপদেশের উপর নির্ভর করছেন। সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রমাণ ভিত্তিক কার্যক্রমের পরিবর্তে লোক দেখানো, তাৎক্ষণিক ও জনমোহিনী ক্রিয়াকলাপে আস্থা রাখছেন।

হেলথ সার্ভিসেস অ্যাশোসিয়েশন বারংবার সরকারের কাছে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশ করেছে। আমরা সঙ্কটের এই কঠিন সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে, সরকার জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করবেন এবং রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল্যবান এবং দক্ষ মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করবেন।

ডাঃ অর্ণব সেনগুপ্ত, হেলথ সার্ভিসেস অ্যাশোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে, ২৫ ডিক্সন লেন, কলিকাতা ৭০০০১৪

২০/০৮/২০২০

খবরাখবর

- পর্ব্বাতোরোহীরা ট্রেক করতে করতে বিশ্বের সর্বোচ্চ হ্রদ কাজিনসারাকে আবিষ্কার করেন নেপালের মানাং জেলায়। হিমালয়ের বরফজলপুষ্ট এই হ্রদের উচ্চতা ৫,২০০ মিটার। লম্বায় ১,৫০০ ও চওড়ায় ৬০০ মিটার। স্থানীয় নাম সিঙ্গর। এর পূর্বে মানসু, পশ্চিমে দামোদর, দক্ষিণে অন্নপূর্ণা ও লামজুং এবং উত্তরে পেরি পর্বতশৃঙ্গ।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত ১৮৫৭তে আজিমুল্লার লেখা 'হর হ্যায় ইসকে মালিক, হিন্দোস্তাঁ হমারা।'...
- পরিবহন কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বি.কে.ইউ.-র নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক মুজঃফরনগরে বিক্ষোভ দেখায়।
- অসমে এন.আর.সি.-র মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে ১৯ লক্ষ বাঙালীর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এরা মূলত গরীব কৃষক। এর মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু। ০৭ লক্ষের মত মুসলমান। আর রয়েছেন বেশ কিছু আদিবাসী। সাঁওতাল, হাজং, ডালু, গারো, বনাই, কোচ প্রভৃতি। এর বিরুদ্ধে বহু সংগঠন আন্দোলন করছে। 'অল কোচ রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' (এ.কে.আর.এস.ইউ.) -এর বিরুদ্ধে ২০ অক্টোবর '১৯ অসম বন্ধ করল।
- ২০১৯এ ফিফার বর্ষসেরা মহিলা ও পুরুষ পুরুষ ফুটবলার নির্বাচিত হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেগান র‍্যাপিনো ও আর্জেন্টিনার লিওনেল মেশি। র‍্যাপিনো অনুষ্ঠানে তার সাড়া জাগানো বক্তৃতায় রাহিম স্টারলিং, কালিদৌ কৌলিবাসে প্রমুখ কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারদের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে তুলে ধরেন। তুলে ধরেন ইরানের ফুটবল অনুরাগিনী পিতৃতন্ত্র ও মৌলবাদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে আত্মত্যাগ করা সাহার খোদায়ারির আত্মত্যাগকে।
- ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৪ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে খোদ রাজধানী দিল্লির কলেজ ছাত্রীদের ৬০% (৫৯%) অ্যানেমিয়া বা রক্তাল্পতায় আক্রান্ত।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের অধীনে পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সূচনা হল : পুরুলিয়া জেলায় পাতলোই, বেকো, বরাভূম, বন্ধু, ডাংড়া, মৌতাজোড়, বুড়িডুমুর, কাঁসাই ও বন্ধ্যাজোড় সেচ প্রকল্প, ঝাড়গ্রাম জেলায় টারকি, চাঁপা ও শ্যামতরঙ্গী সেচ প্রকল্প এবং বাঁকুড়া জেলায় নন্দারঙ্গা ও মহাদেব সিনান সেচ প্রকল্প।
- মোদিজী যখন তার ৬৭তম জন্মদিনে সেজেগুজে প্রচার মাধ্যমের সামনে সর্দার সরোবর বাঁধের পার্শ্বস্থ পার্কে প্রজাপতি ওড়াচ্ছিলেন তখন সর্দার সরোবর বাঁধের জলাধার সম্পূর্ণ ভর্তি হবার পর (১৩৮.৯৮ মিটার) স্লুইস গেট আটকে দেওয়ার পর মধ্যপ্রদেশের ধর ও বারওয়ানি জেলার ৬০টি গ্রাম ডুবে গেল। উৎপাটিত হলেন দুই হাজারেরও বেশী পরিবার। ২০১৭এ যখন জলের স্তর ১৩৫ মিটার উঠেছিল তখনও ছিকলদার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এর বিরুদ্ধে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মেধা পাটেকর নয়দিন অনশন করেন। সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ রায়ে ঘোষিত পরিবার পিছু ৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ কেউ পাননি।
- জালিয়ানায়ালাবাগের পরিস্থিতির বোধহয় পরিবর্তন হয়নি। জালিয়ানায়ালাবাগের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অমৃতসর যাওয়ার পথে কলকাতা, বহরমপুর ও পাঞ্জাবের মানবাধিকার কর্মী ডাঃ সুরেশ বাইন, রাহুল চক্রবর্তী ও লাজপত রাইকে ভাতিন্ডা থেকে চোখ বেঁধে অপহরণ করে অজানা জায়গায় আটক করে রাখে সন্ত্রাসদমন শাখার পুলিশ।
- স্বাস্থ্যদপ্তর ১.২ লক্ষ শিশুর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যাদের মায়েরা শিক্ষিত (এক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণি বা তার উর্ধ্বে) তারা বেশী পুষ্টিকর খাদ্য পায় এবং তার ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বেশী।
- পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কারাকোরামের পর চীন তিব্বতের কেরাং থেকে কাঠমাণ্ডু অবধি নেপালের সাথে যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের জন্য সব ঋতুর ও চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করতে চলেছে।
- ২০১৯-র বুকার পুরস্কার বিজেতা দুজন। কানাডার মার্গারেট আটউড এবং ব্রিটেনের বার্নাদিন এভারিস্তো।
- নেওড়া ভ্যালি অভয়ারণ্যে ট্রাপ ক্যামেরায় আগেই পাওয়া গেছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লেপার্ড, লেপার্ড ক্যাট ও জাংগল ক্যাট। এবার পাওয়া গেল ক্লাউডেড লেপার্ড, মার্বেল ক্যাট, গোল্ডেন ক্যাট, শেরো, স্পটেড লিনসাং, গোরাল, এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার।
- নেপালের নির্মল পুরজা ছ মাস ছ দিনে হিমালয়ের ১৪টি আট হাজারি শৃঙ্গ জয় করে রেকর্ড করলেন।
- দেশজোড়া কৃষক আন্দোলন, বিরোধীদের প্রতিবাদ এবং অন্দরে 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে'র চাপে মোদি সরকার ১৫ দেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি 'আর সি ই পি (রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ)'তে সই করা থেকে আপাতত পেছিয়ে এল।
- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো জানাচ্ছে ২০১৫তে ১১, ৩৭৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছিলেন। প্রতি মাসে গড়ে ৯৪৮ জন, প্রতি দিন গড়ে ৩১ জন। সবচাইতে বেশী মহারাষ্ট্রে ৩,৬৬১ জন। পশ্চিমবঙ্গ কোন তথ্য দেয়নি।
- নভেম্বর '১৯ এর শেষ সপ্তাহান্তে 'রাজস্থান অসংগঠিত মজদুর ইউনিয়ন (আর.এ.এম.ইউ.)'-র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল পালি জেলার রাইপুর গ্রামে। সেখানে শ্রমের সঠিক মর্যাদা ও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রতিনিধি পাঠান গুজরাটের খেদুত মজদুর চেত্না সংগঠন, উত্তরপ্রদেশের সাংতিন কিষাণ মজদুর সংগঠন, বিহারের জনজাগরণ শক্তি সংগঠন, মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডোয়ানা আদিবাসী সংগঠন প্রভৃতি।
- কর্পোরেট ও শাসকদলের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া সংবাদ জগতের

নীরবতার মধ্যে সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ডুবে যাওয়া নর্মদা পাড়ের গ্রামবাসী কৃষক, মৎস্যজীবী, জনজাতিরা পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবীতে মেধা পাটেকর এবং 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে'র নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

- ২০১৯-এ বাংলায় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক চিন্ময় গুহ। অসমিয়া ভাষায় পেলেন জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত। ইংরেজীতে শশী থারুর, নাগরিকত্ব বিলের প্রতিবাদে রাজ্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ফিরিয়ে দিলেন উর্দু সাংবাদিক ও লেখিকা শিরিন দলভি।
- বিশ্বের মধ্যে কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হলেন ফিনল্যাণ্ডের ৩৪ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন। এর আগে ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী।
- বিরল জাতের মন্টেগু হেরিয়ার শিকারি বাজপাখির দেখা মিলল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির বনপাটনা এলাকায়। ২০১৮-র পর ২০২০-র সূচনায় আবার রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলল কালিমপং-র লাভার কাছে নেওড়ার জঙ্গলে।
- হিন্দুত্ববাদীদের চক্রান্ত উপেক্ষা করে লাখে লাখে দলিত মানুষ উপস্থিত হয়ে ভীমা কোরেগাঁওয়ের শহীদস্তম্ভে হওয়া ২০২০-র ১ জানুয়ারির অনুষ্ঠান সফল করলেন।
- NPR, NRC, CAA-র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ১০০টির বেশী সংগঠন ২০২০-র জানুয়ারির প্রথম দিনে মুম্বাইতে মিলিত হয়ে 'উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া' সংগঠন তৈরী করল। এর নেতৃত্বে রইলেন মেধা পাটেকর, হর্ষ মন্দর, যোগেন্দ্র যাদব, কবিতা কৃষ্ণন, তিস্তা শেতলভাদ প্রমুখ।
- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো জানাচ্ছে ২০১৮তে ১০,৩৪৯ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। তারা আরও জানাচ্ছে দেশে এখন প্রতিদিন ৯১টি ধর্ষণ, ৮০টি খুন আর ২৮৯টি অপহরণ সংঘটিত হচ্ছে।
- ২০২০-র শুরুতে বক্সার ব্যাঘ্র প্রকল্পের পাখিশুমারিতে ২১৫ প্রজাতির পাখির খোঁজ মিলল। যার মধ্যে ইউরেসিয়ান রাইনেক, আপল্যাণ্ড বাজার্ড, হিউমস শর্ট টোড লার্ক, ব্ল্যাকথ্রোটেড থ্রাশ, ক্যামেরাস রিড ওয়ার্বলার, টিকলস্ লিফ ওয়ার্বলার এই ছয়টি বিরল প্রজাতির।
- ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির বিরুদ্ধে পদত্যাগ করে গণ আন্দোলনে যোগ দিলেন তরুণ আই.এ.এস. অফিসার কান্নন গোপীনাথ। উত্তরপ্রদেশে বদলি সহ পুলিশ দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বরখাস্ত হলেন গৌতমবুদ্ধ নগরের এস.এস.পি. ভৈরব কৃষ্ণ।
- রাজস্থানের জয়পুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কর্তৃক কৃষকদের জমি দখলের প্রতিবাদে কৃষকরা 'নিন্দার বাঁচাও যুব কিষাণ সঙ্ঘর্ষ সমিতি'র নেতৃত্বে ভূমি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করলেন।
- ২০১৯এ বিশ্বজুড়ে ৫৬ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে।
- কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে প্রসূতি মৃত্যুর হার প্রতি লাখ শিশু জন্মে ৮৭, যা আগে ছিল ১০৯ জন। কিন্তু একটু কিছু ঝুঁকি দেখলেই অন্য হাসপাতালগুলি থেকে জেলা ও মেডিকেল কলেজগুলি রেফার করে দেওয়ার ফলে ঐ কেন্দ্রগুলিতে ও পথে প্রসূতি মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।
- অরুণাচলে নামধাপার পাক্কি টাইগার রিজার্ভের মধ্যে থেকে কেন্দ্র সরকারের ইস্ট ওয়েস্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর নির্মাণের সিদ্ধান্ত ইস্ট কামেং জেলায় পরিবেশ কর্মিদের উদ্বিগ্ন রেখেছে।
- একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জুন '২০-র সমীক্ষায় দেখা গেছে করোনা অতিমারীর মধ্যে ভারতে ৬২% পরিবারের শিশুদের পড়াশোনায় ছেদ পড়েছে।
- উত্তরাখণ্ডের কাঠগোদাম স্টেশন থেকে ১৬ মাইল উৎরাই পেরিয়ে নৈনিতালের কাছাকাছি ছোট পাহাড়ি জনপদ রামগড়। ১৯১২তে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্নোভিউ পয়েন্ট' নামে একটি বাগান সহ বাংলো কেনেন। ১৯১৪তে রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, কন্যা মীরা দেবী এবং কবি আমলা অতুলপ্রসাদ সেনকে নিয়ে সেখানে একমাস ছিলেন। 'গীতিমাল্য'র কিছু গান, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা এবং 'হৈমন্তী' গল্পটি লেখেন এখানে। হিমালয়ের কোলে এই রামগড়েই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হতে চলেছে।
- করোনা প্রতিরোধে মহারাষ্ট্রের ধারাভি মডেল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মান্যতা পেল। মুম্বাইয়ের আড়াই বর্গ কি.মি.-র সাড়ে ছয় লক্ষ শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের এই ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিতে মাত্র ৪৫০টি গণ শৌচাগার। গড়ে ১০ বর্গফুট ঘরে ১০ জন করে থাকেন। ১২ মার্চ প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। তারপর থেকে বৃহন্মুবই পুরসভা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মিলিত চেষ্টায় এবং টেস্ট-ট্রেস-আইসোলেট-ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ায় ও নিয়মিত জীবানুনাশ করে এই হটস্পটে করোনা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য এসেছে। জুলাই '২০ অবধি সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৬৬, সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন ১৯৫২ জন। সুস্থতার হার ৮২%।
- ২০১৮-'১৯ সালে ভারতের ১৪১টি বনাঞ্চলের এক লক্ষ একুশ হাজার বর্গ কি.মি.তে ২৬,৮৩৮টি লুকোনো ক্যামেরার সাহায্যে যে বাঘ শুমারি হয় তার ছবি বিশ্লেষণ করে ২৯৬৭টি বাঘের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে যা সারা বিশ্বের বাঘের সংখ্যার ৭৫%। এর মধ্যে কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে বিরল প্রাকৃতিকভাবে বর্ণসংকর সোনালি বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বেশি বাঘ মধ্যপ্রদেশ (৫২৬) ও কর্ণাটকে (৫২৪)। সুন্দরবনে ৮৮, উত্তরবঙ্গ বাঘ শূন্য। বাঘ কমেছে ছত্তিশগড়ে। দেখা মেলেনি নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরামে। চোরাশিকার ৭৩, সন্দেহজনক মৃত্যু ৮৭।
- কাশ্মীরের জাফরান জি. আই. ট্যাগ অর্জন করল। জাফরান অত্যন্ত দামী মশলা। কাশ্মীরের একধরনের উদ্ভিদের বেগুনি ফুল শুকিয়ে জাফরান সুতো তৈরি হয়। পোলাও, বিরিয়ানি প্রভৃতি মহার্ঘ খাদ্যে জাফরান দিলে একটি সোনালী হলুদ রং

হয় এবং সুন্দর গন্ধ আসে। এছাড়া খাদ্য, কাপড় সংরক্ষণ ও রঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। ইরান, গ্রীস, স্পেন প্রভৃতি দেশেও জাফরান উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়।

- করোনা উদ্ভুত সঙ্কটে বিপদে পড়া গরিবদের দেখার ডাক দিলেন জাঁ দ্রেজের নেতৃত্বাধীন 'খাদ্যের অধিকার অভিযান'। তারা প্রস্তাব দিয়েছেন : (১) সহায়ক সরকারি প্রকল্পগুলিকে আরও ভালো করে চালানো। (২) বিধবা ও প্রবীণদের অগ্রিম তিনমাসের সামাজিক সুরক্ষা পেনশন দান। (৩) এই বিপন্ন মানুষদের ঝুলে থাকা আবেদনগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা। (৪) স্কুল-পড়ুয়া, গর্ভবতী ও প্রসূতিদের রেশন ও রান্না করা খাবার (ভাত, ডাল, ডিমসেদ্ধ) পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা। (৫) পিডিএস গণবন্টন ব্যবস্থায় রেশনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা। (৬) দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা। (৭) এনরেগায় মজুরি ১৭১ টাকা থেকে বাড়িয়ে অন্তত কৃষকদের ন্যূনতম মজুরি ২৭৫ টাকার সমান করা। (৮) সমস্ত শ্রমিক-কর্মীকে সাপ্তাহিক আয় সহায়তা ভাতা দেওয়া।
- ক্রয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর অভিযোগে 'অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা'র নেতৃত্বে সমবায় এবং বেসরকারি দুগ্ধশালাগুলির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাল মহারাষ্ট্রের ২০টা জেলার দুধচাষীরা।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সংগ্রহ করুন

একত্রে ৫০০ টাকা

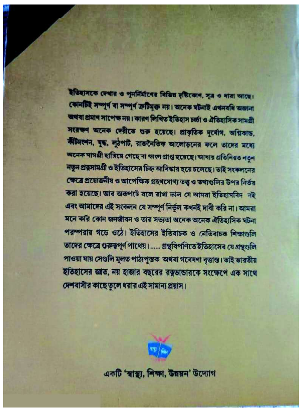
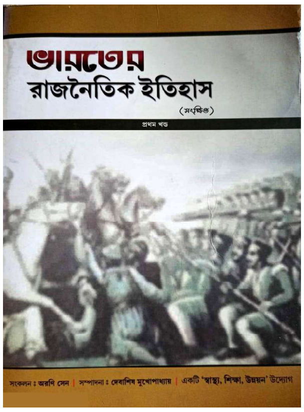

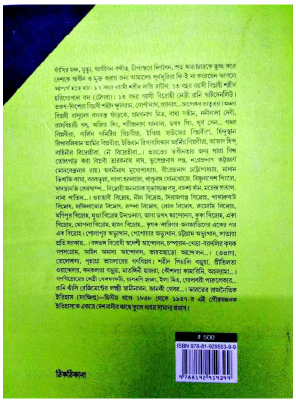
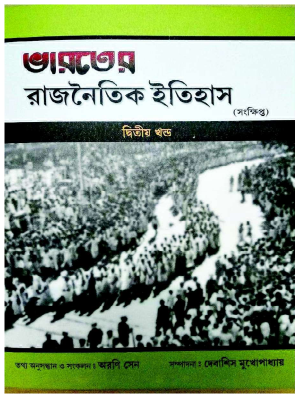

যোগাযোগ : প্রতাপ মিত্র (৯৮৩০০৫৮৫৪৭), সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭)

প্রাপ্তিস্থান :

● ঠিকঠিকানা, কতকথা, পাতিরাম, বুক মার্ক, একুশে, পিপলস্ বুক সোসাইটি, বইচিত্র, ধ্যানবিন্দু, খোয়াবনামা, পাভলভ ইনস্টিটিউট, মনীষা; কলেজস্ট্রিট ● এস.কে.বুকস্; উল্টোডাঙ্গা ● বইওয়ালা; যাদবপুর ● প্রগ্রেসিভ বুক স্টল; রাসবিহারী ● কোলে বুক স্টল; বি.বা.দি. বাগ ● ঘুম নেই; সুরসুনা ● পশ্চিমবঙ্গ গণসাংস্কৃতিক পরিষদ; ক্রীক রো ● ফামা; বেলেঘাটা ● নাগরিক মঞ্চ; আনন্দপুর, কলকাতা ● দেবাঞ্জলি; মাথাভাঙ্গা ● গণবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা; কোচবিহার ● সুমন গোস্বামী; আলিপুরদুয়ার কোর্ট ● লার্নি পয়েন্ট, ওরিয়েন্টাল বুক স্টল; জলপাইগুড়ি ● দি বুকস্, হাকিমপাড়া; শিলিগুড়ি ● ধানসিড়ি, মোহনবাটি; রায়গঞ্জ ● অন্নপূর্ণা, বুকল্যাণ্ডস; বালুরঘাট ● রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়; গঙ্গারামপুর ● রূপান্তরের পথে; মালদা ● বিশ্বাস বুক স্টল; বহরমপুর ● কোরাস নাট্য গোষ্ঠী; কান্দী ● পত্রিকালয়, ম্যাগাজিন কর্ণার; সিউড়ি ● সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন ● শ্যাম বুক স্টল; আসানসোল ● জয়া বুক স্টল, বি জোন; দুর্গাপুর ● খোয়াই, সাহিত্য পরিষদ, অপুর স্টল; বর্ধমান ● প্রয়াস মল্লভূম, লোকপুর; বাঁকুড়া ● হংসরাজ; বিষ্ণুপুর ● দি বুক হাউস; কৃষ্ণনগর ● কপি সেন্টার; রাণাঘাট ● বিশুদার বুক স্টল; চাকদা স্টেশন ● বিজ্ঞান দরবার; কাঁচড়াপাড়া ● সনৎ রায় চৌধুরী, ফুলপুকুর; চুঁচুড়া ● রেলওয়ে স্টেশন বুক স্টল, শ্রীরামপুর, বারাসাত, খড়দহ, সোনারপুর, উলুবেড়িয়া ● সরস্বতী বুক স্টল; নৈহাটি ● বাণীবিতান, ডায়মণ্ডহারবার ● যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা; ক্যানিং ● শ্রমজীবী হাসপাতাল; বেলুড়, সরবেরিয়া, শ্রীরামপুর, কোপাই, উখরা ও ব্যারাকপুর ● ভালোপাহাড়, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া ● শ্যামল ভট্টাচার্য্য, অখাউড়া; আগরতলা ● রোশনি; জামসেদপুর ● লিটল ম্যাগাজিন মেলা ● লিটল ম্যাগাজিন হাট, রাণু ছায়া মঞ্চ, আকাদেমি চত্বর, প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবার।

কার্টুনের দুনিয়ায়

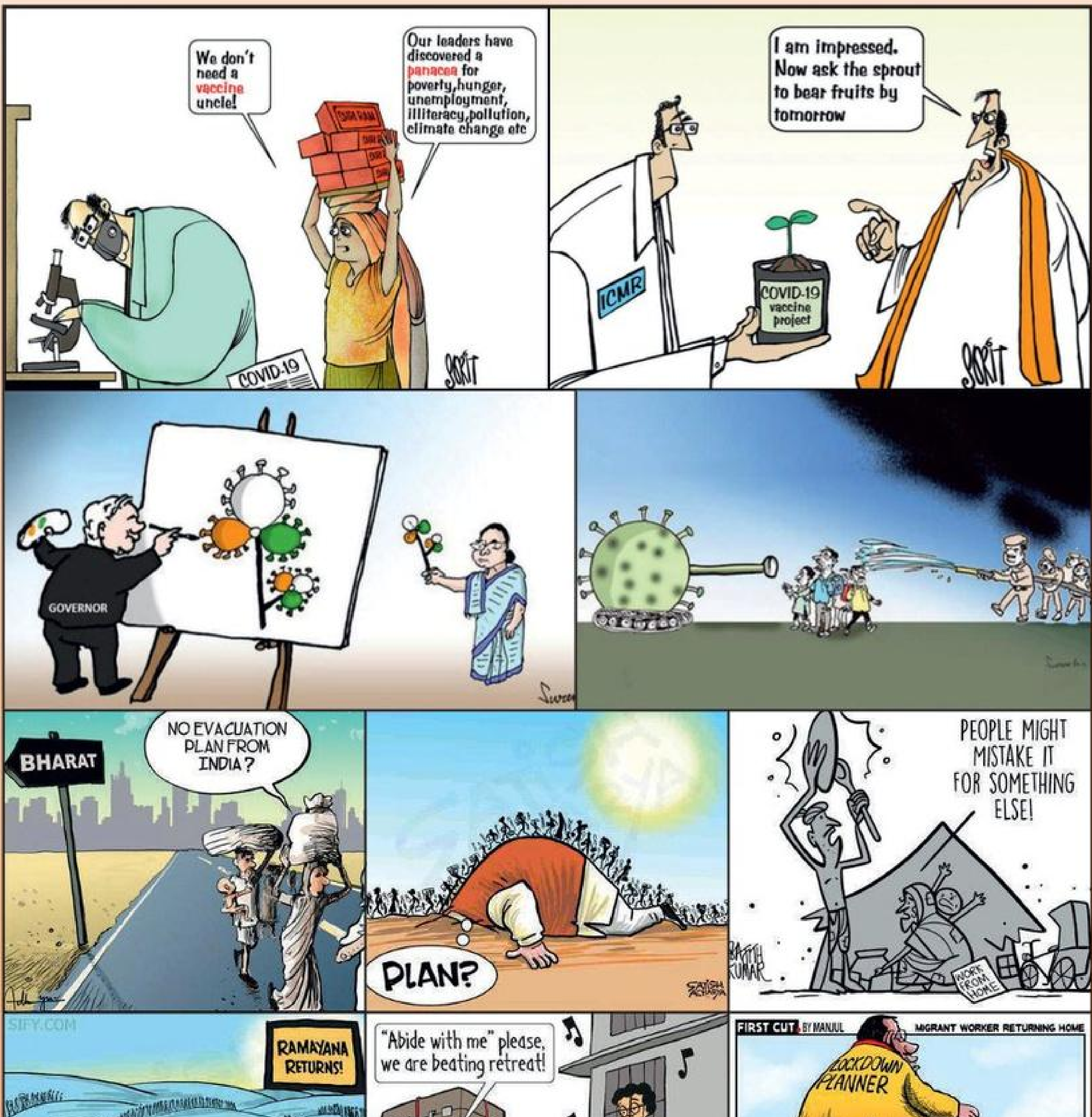
We don't need a vaccine uncle!
Our leaders have discovered a panacea for poverty,hunger, unemployment, illiteracy,pollution, climate change etc
COVID-19
I am impressed. Now ask the sprout to bear fruits by tomorrow
ICMR
COVID-19 vaccine project
GOVERNOR
BHARAT
NO EVACUATION PLAN FROM INDIA?
PLAN?
PEOPLE MIGHT MISTAKE IT FOR SOMETHING ELSE!
WORK FROM HOME
SIFY.COM
RAMAYANA RETURNS!
HOW LONG DO WE NEED TO WALK TO REACH RAM RAJYA, BABA?
"Abide with me" please, we are beating retreat!
FIRST CUT BY MANJUL
MIGRANT WORKER RETURNING HOME
LOCKDOWN PLANNER
POLICE

"To keep the body in good health is a duty ... otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear."

— *Gautam Buddha*

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."

— *Socrates*

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood more, so that we may fear less."

— *Marie Curie*

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে অরণি সেন কর্তৃক ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন ২৫২৬৫০৫০ থেকে মুদ্রিত।

e-mail : ssunnayan@gmail.com || Website : www.ssu2011.com

₹৬০